কিশোর-বিচিত্রা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

নৃমুণ্ড শিকারী

মড়ার মৃত্যু

মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী
চারু খান

মুদ্রক
চিত্তজিৎ দে
আরোরা প্রিণ্টার্স
৫৭ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা-১২

নৃমুণ্ড-শিকারী

এতো কথা মনে হচ্ছে কেন, জানো? সম্প্রতি কলকাতায় আর তার আশেপাশে এমন কাণ্ড নিত্যই ঘটছে যা কেবল অশুভ বা ভীষণ নয়, বীভৎসও বটে।

এ অঞ্চলে নৃমুণ্ড-শিকারীর আবির্ভাব হয়েছে।

প্রথম ঘটনা ঘটে জগন্নাথ ঘাটের কাছে। একজন মাড়োয়ারি শেষ-রাতে গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে ছিলো। সকালবেলায় তার মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গেলো পথের ওপরে।

পরদিন সকালে টালার কাছে খালের ধারে আবিষ্কৃত হলো এক পাহারাওয়ালার মৃতদেহ, তারও মুণ্ড পাওয়া গেলোনা।

তৃতীয় ঘটনা ঘটে খিদিরপুর ডকের কাছে। রাতের গুমোটে এক কুলি খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো, কে বা কারা এসে বেচারার মুণ্ড কেটে নিয়ে যায়।

এমনি ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো উপরি-উপরি পনেরো বার। কখনো কাশীপুরে, কখনো খিদিরপুরে, কখনো ব্যারাকপুরে, কখনো কালীঘাটে, কখনো হাওড়া-শিবপুর-শালিখায় এবং কখনো কলকাতার প্রান্তবর্তী জায়গায় পাওয়া যেতে লাগলো মুণ্ড-কাটা দেহের পর দেহ।

আতঙ্কে নগরবাসীরা স্তম্ভিত। পুলিশের দলবল পাগলের মতো শহরময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো— কিন্তু বৃথা! নরবলি বন্ধ হলো না।

রাত ন-টার পর শহরের পথে আর জনপ্রাণীকে দেখা যায় না। থিয়েটার-বায়স্কোপ-এর রাত্রের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেলো। একদিন সকালে চাঁদপাল ঘাটের কাছে এক মাতাল ইংরেজ নাবিকের স্কন্ধকাটা মৃতদেহ পাবার পর থেকে চৌরঙ্গিতেও মহা বিভীষিকার সঞ্চার হলো।

কেল্লা থেকে গোরা ফৌজ আনিয়ে পথে পথে পাহারা বসানো হলো। তখন নরবলি হয় শহরের বাইরে অন্য কোনো জায়গায়। ফৌজ আর কতোদূর পাহারা দেবে?

এমন চুপি চুপি খুনীরা কাজ সেরে চম্পট দেয় যে, কাক-পক্ষীও

টের পায় না। এতোগুলো খুন হলো, কিন্তু খুনীদের দেখা তো দূরের কথা। টুঁ-শব্দও কারোর কানে ওঠেনি। খুনীরা যেন ইন্দ্রজাল জানে, তারা যেন মৃত্যুর মতো নিঃশব্দ ও অদৃশ্য।

কাগজওয়ালারা পুলিশের অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলো। টাউন-হলে মস্তবড়ো আন্দোলন-সভা বসিয়ে নগরবাসীরা প্রশ্ন তুললো— আমরা ট্যাক্স দিয়ে পুলিশ পুষছি কেন? আমাদের মাথাগুলো ঢুকলো হাঁড়িকাঠে, আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে, বলে? মুশকিলে পড়ে গভর্ণমেণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করলেন, যে এই নৃশংস হত্যাকারীদের সন্ধান দিতে পারবে, তাকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

কিন্তু পুরস্কার ঘোষণা করা এক, আর হত্যাকারীকে ধরা এক। হত্যার সংখ্যার সঙ্গে পুরস্কারের টাকার সংখ্যাই কেবল বাড়তে লাগলো।

পাথুরেঘাটার মেয়ো হাসপাতালের কাছে এক দিন একসঙ্গে দুটো লোকের মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গেলো। পুলিশ-তদন্তে প্রকাশ পেলো, তারা দু'জনেই দু'টি গুণ্ডা, তাদেরও ব্যবসা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাহাজানি, খুনখারাপি। খুব সম্ভব, পুরস্কারের লোভেই রাত্রে খুনী ধরতে পথে বেরিয়েছিলো।

ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রধান নগর কলকাতার বুকের ওপর যে এমন অসম্ভব সব ঘটনা ঘটতে পারে, এটা কেউ দুঃস্বপ্নেও মনে আনতে পারে নি। বিলাতের পার্লামেণ্টেও এইসব ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। ভারত-গভর্ণমেণ্ট থেকে কলকাতা পুলিশের ওপরে এলো জোর হুমকি।

কিন্তু বেচারা পুলিশ করবে কি? হত্যাকারীরা এমন সুচতুর ও সাবধানী যে, ঘটনাস্থলের কোথাও সামান্য একটা সূত্র রেখে যায় না। আর এইসব অদ্ভুত হত্যার উদ্দেশ্যই বা কি? কোথাও নিহত ব্যক্তিদের ট্যাঁক্ বা পকেট থেকে একটা পয়সাও চুরি যায় নি। এ খুনীর দল জাত মানে না, উচ্চ-নীচ, বৃদ্ধ-জোয়ান, গরিব-ধনী, সাহেব বা বাঙালি বা মাড়োয়ারি বা মুসলমান কিছুই বিচার করে না— যেন তেন প্রকারে সে

কেবল কাটা মুণ্ড হস্তগত করতে চায়। মানুষের মাথা তো পাঁঠার মুড়ি নয়, এতো মুণ্ড নিয়ে খুনীরা করে কি? আর একটা রহস্যও লক্ষ্য করবার মতো। যারা মারা পড়েছে, সবাই পুরুষ। খুনীরা নারীহত্যা করেনি।

ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে গরমাগরম ধমক খেয়ে ইন্‌স্পেক্টর সুন্দরবাবু আর কোনো উপায় না দেখে শখের গোয়েন্দা জয়ন্তের কাছে ধর্না দিয়ে পড়লেন।

চৌকির কোণে বসে পা নাচাতে নাচাতে জয়ন্ত বাজাচ্ছে বাঁশের বাঁশি, আর তার সঙ্গে তবলার সঙ্গত করছে মাণিক।

সুন্দরবাবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'হুম্! আমার চাকরি যায়-যায়, আর তোমরা করছো আনন্দ! মজায় আছো!'

জয়ন্ত বাঁশি থামিয়ে বললো, 'আনন্দ তো করছি না সুন্দরবাবু, চিন্তা করছি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'চিন্তা করছি বললেই হলো. স্বচক্ষে দেখছি প্যাঁ প্যাঁ করে বাঁশি বাজাচ্ছো, স্বকর্নে শুনছি বাঁশির পোঁ পোঁ আওয়াজ—ওর নাম তোমার চিন্তা করা?'

— 'আমি যে বাঁশি বাজাতে বাজাতেই চিন্তা করি, সুন্দরবাবু!'

— 'চিন্তা করো, না ছাই করো. বাঁশি বাজিয়ে চিন্তা! যতোসব অনাসৃষ্টি। দুশ্চিন্তায় পড়েছি বটে আমি, তোমার আবার কিসের চিন্তা হে?'

জয়ন্ত হেসে বললো, 'গভর্ণমেণ্টের দশ হাজার টাকার পুরস্কার পনেরো হাজারে উঠেছে। এর পরেও একটু চিন্তা করবো না?'

— 'হুম্! তাহলে এই ভূতুড়ে খুন-খারাপিগুলো গিয়ে তোমারও টনক নাড়িয়েছে?'

— 'টনক না নড়লে উপায় কি? নইলে আপনাকে সাহায্য করবো কেমন করে? আপনি যে সাত ঘাটের জল খেয়ে আমার কাছেই সাহায্য চাইতে আসবেন. এটা তো জানা কথা! কাজেই আগে থাকতেই কাজ সেরে রাখছি।'

সুন্দরবাবু মুখ ভার করে বললেন, 'আমাকে সাহায্য করবে না কচুপোড়া করবে। এবারে সে-গুড়ে বালি। এ সব খুনের কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

— 'মানে না পাওয়া যাক, দুটো সূত্র আমি খুঁজে পেয়েছি।'

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির ওপরে দুই হাত রেখে মস্ত এক লাফ মেরে সবিস্ময়ে বললেন, 'দুটো সূত্র খুঁজে পেয়েছো! কোথায়?'

— 'সেই গুণ্ডা দু'জনের লাশ আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে এসেছি। আমার মতে, খুনীদের দলে এমন একজন লোক আছে, গায়ের জোরে সে পৃথিবীর সবচেয়ে বলবান্ লোককেও টিপে মেরে ফেলতে পারে। আর একজন লোক আছে যে খুব শৌখিন। সে যদি বাঙালিই হয় তবে তার নাম ইন্দুভূষণ বসু বা বাঁড়ুজ্যে হলেও অবাক হবো না। সে উচ্চ শ্রেণীর দামি এসেন্স ব্যবহার করে, দোক্তা দিয়ে পান খায়।'

দুই চোখ বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বললেন, 'তা হলে তুমি খুনীদের চেনো?'

— 'না, অনুমানে বলছি। গুণ্ডাদের দেহ দুটো দেখেছেন? হত্যাকারীর আলিঙ্গনে বা হাতের চাপে তাদের দেহের হাড়গুলো নানাস্থানে ভেঙে গেছে— তারা কোনো আশ্চর্য শত্রুর কবলে পড়েছিলো। তার পাল্লায় পড়লে আমিও বাঁচতাম না, অথচ আমার শক্তির নমুনা আপনার অজানা নেই। মৃতদেহ দুটো গঙ্গার ধারের রাস্তার ওপর পড়েছিলো। আমি রাস্তা ছেড়ে গঙ্গার গর্ভে নেমে এই রুমালখানা দৈবগতিকে কুড়িয়ে পেয়েছি। দেখছেন, রুমালখানা রক্তমাখা? হত্যাকারী হাতের রক্ত মুছে রুমালখানা গঙ্গাজলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। কিন্তু রুমাল যে জলে না পড়ে ডাঙায় গিয়ে পড়লো, অন্ধকারে অতোটা তার নজরে আসে নি। রুমালের এককোণে তিনটে ইংরেজি হরফ তোলা রয়েছে— I. B. B.। ওতে আন্দাজ করতে পারি, রুমালের মালিকের নাম— যদি সে বাঙালি হয়, ইন্দুভূষণ বসু বা বাঁড়ুজ্যে বা

অন্য কিছু। রুমালে রীতিমতো দামি এসেন্স আর দোক্তার গন্ধ পাওয়া গেছে— দোক্তা দেওয়া পান খেয়ে সে মুখ মুছেছিলো।'

সুন্দরবাবু সানন্দে বলে উঠলেন, 'রুমালের আর এককোণে ধোপার মার্কাও রয়েছে। জয় ভগবান, হুম্।'

জয়ন্ত বললো, 'সেইজন্যেই তো রুমালখানা আপনার হাতে দিলাম। খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোন্ থানার এলাকায় কোন্ ধোপা ঐ মার্কা, কার জামা-কাপড়ে ব্যবহার করে।'

সুন্দরবাবু বেজায় ফুর্তির সঙ্গে বললেন, 'আঃ, বাঁচলাম। এতোদিনে একটা সূত্রের মতো সূত্র পাওয়া গেলো! বিলিতি পার্লামেন্টের এক সভ্য নাকি বলেছেন, কলকাতা পুলিশে অনেক অকেজো লোকের ভিড় হয়েছে! লজ্জায় আমাদের মুখ দেখাবার যো নেই।'

মাণিক এতোক্ষণ পরে বললো, 'বিলিতি পুলিশের বাহাদুরিই আমরা দেখি, কিন্তু তারাও 'জ্যাক্-দি-রিপারের কি করতে পেরেছিলো?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জ্যাক্-দি-রিপার কে?'

— 'একজন অজানা হত্যাকারী। নারীদের হত্যা করে অকারণেই সে তাদের দেহ ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে ফেলে রেখে যেতো। সেইজন্যে তাকে Ripper অর্থাৎ ছেদনকারী উপাধি দেওয়া হয়েছিলো। লণ্ডন শহরে বিলিতি পুলিশের বুকের ওপর বসে রাত্রের পর রাত্রে সে নারীর পর নারী হত্যা করেছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। পুলিশ তাকে পোল্যাণ্ড থেকে আগত এক ইহুদি বলে সন্দেহ করে, তার চেহারারও বর্ণনা পায়, এমন কি বিলিতি পুলিশের বড়োকর্তার সামনে সে নিজে সশরীরে এসে দেখাও দেয়। তবু তাকে বন্দী করা সম্ভব হয়নি। সুন্দরবাবু, এসব উপন্যাসের বাজে কথা নয়, একেবারে সত্যি কথা।'

জয়ন্ত বললো, 'মাণিক, জ্যাক্-দি-রিপারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তুমি উপকার করলে। জ্যাক্-দি-রিপারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এখানকার এই সব হত্যাকাণ্ডের এক বিষয়ে যথেষ্ট মিল আছে। জ্যাকের মতো

এ হত্যাকারীও অকারণেই নরহত্যা করছে। এ টাকাকড়ি নেয় না, খালি মুণ্ড কেটে নিয়ে পালায়। এমন মুণ্ডচুরি অর্থহীন। বিলিতি পুলিশের মতে, জ্যাক্ ছিলো বাতিকগ্রস্ত উন্মত্ত। এও তাই না কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'পাগলে কখনো এমন চালাকের মতো পুলিশ আর সারা শহরের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাঁসিল করতে পারে?'

— 'বাতিকগ্রস্ত পাগলদের আপনি চেনেন না সুন্দরবাবু। কেবল বিশেষ বাতিক ছাড়া তাদের মধ্যে উন্মাদ-রোগের আর কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'দাঁড়াও না, আগে ধোপাকে খুঁজে বের করি, তারপর তার বাতিক ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।'

জয়ন্ত বললো, 'ধোপা সম্বন্ধে অতো বেশি নিশ্চিন্ত হবেন না, সুন্দরবাবু! কারণ হত্যাকারী যদি কলকাতার লোক না হয়, তবে? ধোপার খবর তাহলে পাবেন কেমন করে? তারচেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে ধরবার জন্যে আর এক চেষ্টা করা যেতে পারে।'

— 'কি চেষ্টা? যা বলো, আমি রাজি আছি।'

— 'রাজি আছেন? তাহলে ছদ্মবেশ পরে দু'-এক রাত বাগবাজারের খাল যেখানে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, সেইখানে বসে থাকতে পারেন?'

— 'কেন?'

— 'দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল হচ্ছে গঙ্গা বা খালের কাছকাছি জায়গায়। আমার বিশ্বাস, হত্যাকারীরা শেষ রাতে নৌকোয় চড়ে রোঁদে বেরোয়। তারপর মনের মতো শিকারের সন্ধান পেলেই নরবলি দিয়ে আবার নৌকোয় চড়ে পালায়। আপনি থাকলে বাইরে প্রকাশ্যভাবে আজ আমরা দলবল নিয়ে কাছেই লুকিয়ে থাকবো। আপনার মাথার লোভে হত্যাকারীরা যদি যগিয়ে আসে—'

সুন্দরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ, এ প্রস্তাবে আমার বিলক্ষণ আপত্তি আছে। আমার মুণ্ডুটা যদি হঠাৎ খোয়া যায়, তাহলে খালি ধড়টা নিয়ে আমি কি করবো? হুম্। এ হচ্ছে মারাত্মক প্রস্তাব!'

জয়ন্ত বললো, 'আপনার ভয় পাবার কোনো কারণই নেই। আমরা বন্দুক নিয়ে আপনার মূল্যবান টাক-মাথার ওপরে কড়া পাহারা দেবো।'

অনেকবার না-না করে সুন্দরবাবু, শেষটা রাজি হলেন।

—'বেশ, তাই হবে। আমি পোর্ট-পুলিশের লোককেও একখানা মোটর বোট নিয়ে কাছাকাছি কোথাও হাজির থাকতে বলবো।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললো, 'সর্বনাশ, ও কথা মনেও আনবেন না। হত্যাকারীরা কি এতোই বোকা যে, পোর্ট-পুলিশের বোট চিনতে পারবে না? তারা নিশ্চয়ই অন্ধ নয়! বেশি লোকেরও দরকার নেই, আমি আর মাণিকই আপনার মাথা বাঁচাবার পক্ষেই যথেষ্ট। বেশি লোক থাকলেই গোলমাল হবে।'

রাত সাড়ে তিনটের সময়ে সুন্দরবাবু প্রাণটি হাতে করে গুটি গুটি খাল ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এসে হাজির হলেন।

তাঁর মাথায় জটাজুট, মুখে লম্বা গোঁফ-দাড়ি, পরণে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম।

খালের মুখে রেলওয়ে ব্রিজ, তার কোলেই গঙ্গার ধারে একটুখানি বাঁধানো জায়গা। সেইখানে বসে পড়ে সুন্দরবাবু চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন, জয়ন্ত ও মাণিক কোথায় লুকিয়ে আছে।

বোঝা গেলো না। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। এতোটা পথ হেঁটে আসবার সময়েও সুন্দরবাবুর সঙ্গে অন্যলোক তো দূরের কথা, একটা পাহারাওয়ালারও দেখা হয়নি। সারা শহর যেন ভয়ে দম বন্ধ করে বোবা হয়ে আছে।

কলকাতা শহর যে গোরস্থানের মতো এতো নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে, এ-কথা ধারণা করা যায় না। আগে আগে শেষ-রাতে যারা প্রাতঃস্নান করতে আসতো, আজকাল তারাও দরজায় খিল লাগিয়ে ঘরের ভেতরে বসে থাকে।
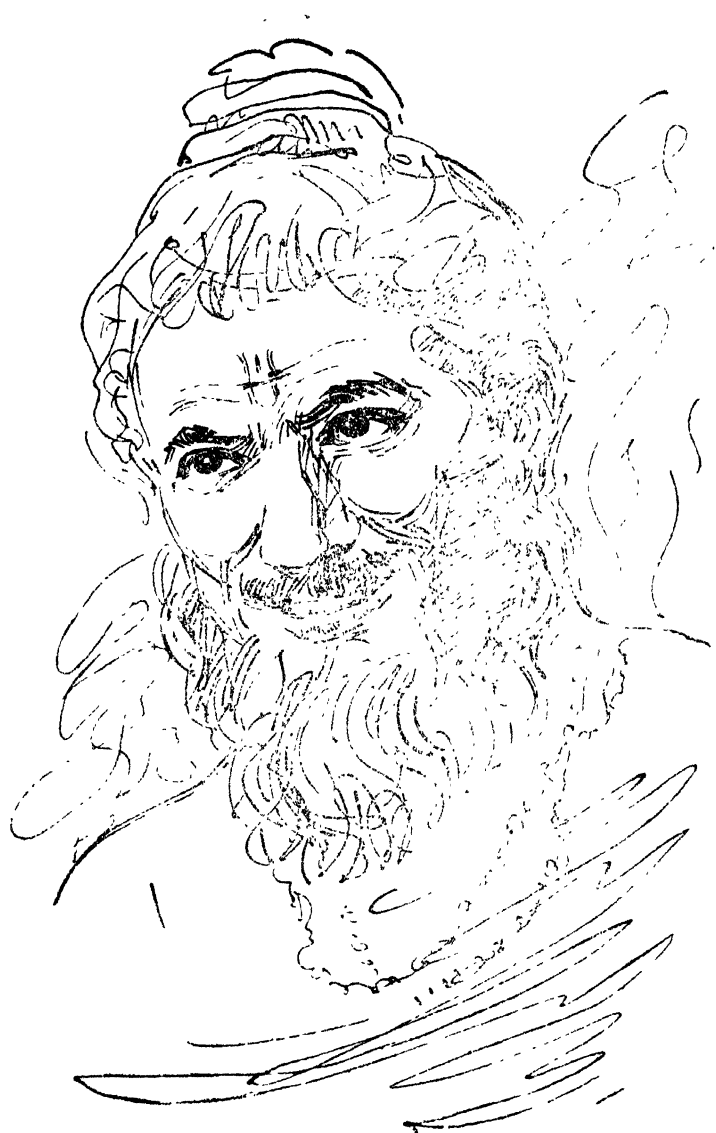
নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে করলেন সুন্দরবাবু। জয়ন্ত আর মাণিক যদি কাছাকাছি না থাকে? যদি তারা ঠিক সময় আসতে না পারে? তাহলেই তো খাঁড়ার এক কোপে তাঁর মুণ্ড উড়ে যাবে।

আকাশে চাঁদ নেই, শেষ রাতে গ্যাসের আলোগুলোও নিভে গেলো। গঙ্গার বুকে দূরে মাঝে মাঝে নৌকোর দাঁড় ফেলার শব্দ হয়, আর সুন্দরবাবু চমকে চমকে ওঠেন আর ভাবেন—ঐ রে, এলো বুঝি রে!

সুন্দরবাবু ঘেমে নেয়ে উঠলেন। জপ করবার ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে তিনি বসে রইলেন এবং মনে মনে সত্য সত্যই দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে সকাল হয়ে এলো। সুন্দরবাবু হাঁপ ছেড়ে 'হুম্' বলে উঠে দাঁড়ালেন। হত্যাকারীরা এলো না বলে তাঁর মনে এক তিলও দুঃখ হলো না।

কিন্তু না-ছোড়বান্দা জয়ন্তের তাড়নায় তাঁকে পর দিনও সন্ন্যাসীর এই বিপজ্জনক অবস্থায় অভিনয় করতে হলো।

সে রাতেও চাঁদের ছুটি। গ্যাসের আলো নিভে গেলো। সুন্দরবাবুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্, ঘর্মাক্ত কলেবর।

চোখ কপালে তুলে তিনি প্রার্থনা করলেন, 'ও-মা দুর্গে, দুর্গতিনাশিনী। কাল-রাত পুইয়ে দাও মা, এর পর চাকরি গেলেও আর আমি এ মুখো হচ্ছি না। ও-মা, কখন ভোর হবে মা, কখন কাক-চড়াই ডাকবে, কখন ধাঙড়েরা রাস্তা ঝাঁট দিতে বেরোবে!'

কাছেই কোথাও তিন-চারটে কুকুর যেন কি দেখে আতঙ্কে কেঁউ-কেঁউ করে কেঁদে উঠলো। সুন্দরবাবুর সন্দিগ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টি অন্ধকারের চারিদিকে ডুবে ডুবে যাকে দেখা যায় না সেই ভয়ঙ্করকেই খুঁজে খুঁজে ফিরতে লাগলো।

হঠাৎ তাঁর গায়ে কাঁটা দিলো— গঙ্গার একটানা কুলু কুলু শব্দের সঙ্গে আর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন! খালের জলে নৌকো চলার শব্দ। সুন্দরবাবুর মনে হলো সে যেন মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি!

শব্দ থামলো। সব চুপচাপ। তারপর লোহার সাঁকোর রেলিঙের ওপর থেকে যেন বিষম ভারি কি একটা লাফিয়ে পড়লো।

সুন্দরবাবু কাঁপতে কাঁপতে মাথাটি একটু ফিরিয়ে ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তাকালেন। অন্ধকার ভেদ করে বৃহৎ আর ছায়ার মতো কি একটা মূর্তি গুড়ি মেরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ছুটো প্রদীপ্ত চক্ষু, হিংস্র পশুর দৃষ্টি! ওগুলো কি চক্‌চকিয়ে উঠছে? দাঁত! মানুষের মতোই বটে, কিন্তু তাকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। মানুষের আকার।

অমানুষিক মূর্তি আরো কাছে এলো। সুন্দরবাবুর নাকে ঢুকলো একটা বোঁট্‌কা ছুর্গন্ধ!

এখনো জয়ন্ত আর মাণিকের সাড়া নেই! তাঁর মুণ্ড কচাং করে কাটা না গেলে কি তাদের হুঁস হবে না? তারা যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে, ···নাঃ আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না— চাচা আপন বাঁচা! মূর্তিটাকে আর এগোতে দেওয়া উচিত নয়। সুন্দরবাবু রিভলভার বার করে খট্ করে ঘোড়া টিপে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জয়ন্ত! মাণিক! আমাকে বাঁচাও।'

রিভলভারের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই মহা আক্রোশে ও যন্ত্রণায় কে যেন বিকট এক গর্জন করে উঠলো। সুন্দরবাবুর সন্দেহ হলো, সে গর্জন মানুষের নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোমাঞ্চকর উপহার

বাগবাজারের খাল যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে সেখানে যে রেলপথের সাঁকো আছে, কলকাতায় সেটি একটি দ্রষ্টব্য ব্যাপার। ও সাঁকোটি হচ্ছে দোতলা। সেটি এমন কায়দায় তৈরি যে, তলা দিয়ে যখন বড়ো বড়ো নৌকো আনাগোনা করতে চায়, তখন সাঁকোর সমস্ত একতলার অংশটি রেললাইন সুদ্ধ শূন্যে অনেকটা ওপরে উঠে যায়।

এই সাঁকোর কাছে একখানা খালি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো। তারই ভেতরে লুকিয়ে ছিলো জয়ন্ত আর মাণিক। সেইখান থেকেই তারা সুন্দরবাবুর ব্যাকুল চিৎকার শুনতে পেলো।

তখন একেবারে শেষ রাত; কিম্বা সে সময়টাকে উষার আসন্ন জন্মমুহূর্তও বলা যায়। যদিও তখনো আলো ফোটেনি কিন্তু রাত-আঁধারি পাতলা হয়ে আসছে ক্রমশঃ।

জয়ন্ত ও মানিক চোখের নিমেষে গাড়ির বাইরে লাফিয়ে পড়লো। আর তার পরেই তাদের মনে হলো, সাঁকোর পাশের লোহার মই বেয়ে একটা প্রকাণ্ড মূর্তি প্রতি পদক্ষেপে মহাশব্দ সৃষ্টি করে খুব তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে যাচ্ছে। অতো বৃহৎ মূর্তির অতোখানি তৎপরতা বিস্ময়কর বলেই মনে হয়।

ওদিক থেকে সুন্দরবাবু রিভলভারে আলো তিন-চার বার অগ্নিবৃষ্টি করলেন।

জয়ন্ত ও মানিক যখন সাঁকোর কাছে এসে পড়লো, সুন্দরবাবু হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জয়ন্ত ভাই! আমাতে আর আমি নেই। মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি।'

কিন্তু তারা কেউ তাঁর কাঁদুনি শোনবার জন্যে ফিরে তাকিয়ে দাঁড়ালো না, তীব্র বেগে ছুটে এসেই লোহার মই বেয়ে সাঁকোর দোতলায় উঠতে লাগলো।

সুন্দরবাবু আবার একলা। ভয়ে তাঁর চোখের সামনে ফুটলো হাজার-হাজার সর্ষে ফুল এবং তাঁর কানে ঢুকলো আর একটা আওয়াজ। একখানা নৌকো জলে ছপাং ছপাং শব্দ তুলে খালের এপার ছেড়ে ওপারে চলে যাচ্ছে।

গঙ্গার ধারে সারি সারি নৌকো বাঁধা ছিলো। তার ভেতরে যে সব মাঝি-মাল্লা ঘুমোচ্ছিলো, সুন্দরবাবুর বিকট চিৎকারে ও রিভলভারের শব্দে তাদের ঘুম গেলো ভেঙে— তারাও বাইরে বেরিয়ে এসে মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে তুললো। তাদের গোলমাল শুনে সুন্দরবাবু কতকটা ধাতস্থ হলেন— অন্ধকারের ভয়াবহ নির্জনতা ও বুক-চাপা স্তব্ধতার কবল থেকে নিস্তার পেয়ে তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

সেই হাতির মতো ভারি অদ্ভুত জীবটা সাঁকোর দোতলায় উঠে ধুমধড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছিলো, এখন সে সব গেছে থেমে থুমে। জয়ন্ত ও মাণিকেরও সাড়া-শব্দ নেই। ব্যাপার কি? তাদের দেহের সঙ্গে মুণ্ডের সম্পর্ক এখনো বজায় আছে তো?— মনে এই দুর্ভাবনার উদয় হতেই সুন্দরবাবুর কান্না পেলো। কিন্তু তবু তাঁর এমন ভরসা হলো না যে, সাঁকোর ওপরে উঠে ব্যাপারটা কী, উঁকি মেরে দেখে আসেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই পূর্ব-আকাশে যখন উষার প্রথম আলোর ঝর্না খুলে গেলো, গাছে গাছে পাখিরা যখন প্রভাত-সূর্যের উদ্দেশে বন্দনাগীত রচনা করতে লাগলো, তখন দেখা গেলো— জয়ন্ত ও মাণিক সাঁকোর রেলপথের ওপর দিয়ে আবার ফিরে আসছে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! তোমরা উঠলে সাঁকোর দোতলায়, আবার নেমে পড়লে কখন হে?'

জয়ন্ত বললো, 'অনেকক্ষণ। সেই মূর্তিটাকে ধরবার জন্যে আমরা সাঁকোর ওদিককার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়েছিলাম।'

— 'তারপর ?'

— 'তারপর আবার কি, আপনি অসময়ে রিভলভার ছুঁড়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা তাকে ধরবো কেমন করে ?'

—'হুম্ ! অসময়েই রিভলভার ছুড়েছি বটে ! স্বচক্ষে দেখলাম, পাঁচ-ছ' হাত তফাতে একটা কিম্ভুতকিমাকার রাক্ষস ! তার চোখ দুটো করছে দপ্-দপ্ আর দাঁতগুলো করছে চক্-চক্ ! আর তার গায়ে কী বোঁট্কা গন্ধ রে বাবা ! রিভলভার ছুঁড়তে আর এক সেকেণ্ড দেরি করলে তোমরা কি আমার মাথাটা আর কাঁধের ওপরে খুঁজে পেতে ?'

— 'রিভলভার ছুঁড়ে তাকে যদি বধ করতে পারতেন, তা হলেও একটা কথা ছিলো !'

—'কি করবো ভাই, টিপ্ যে ঠিক হলো না, আমার হাত যে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছিলো ! আমি তো তবু রিভলভার ছুঁড়ে তাকে ভয় দেখিয়েছি, কিন্তু তাকে দেখলে নিশ্চয়ই তোমাদের দাঁত কপাটি লেগে যেতো !···কিন্তু সে পালালো কোন্ দিকে ?'

— 'খালের ওপারে গুদামের পর গুদাম, তারই অলিগলির ভেতরে বোধহয় সে লুকিয়ে আছে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেলো না, কিছুই দেখা গেলোনা, কিন্তু আমরা আরো তিন-চারজন লোকের জুতো পরা পায়ের শব্দ পেয়েছি। যেন তারাও দৌড়ে পালাচ্ছিলো !'

— 'হুম্ ! গলা-কাটারা নিশ্চয়ই দল বেঁধে এসেছিলো, সেই কিম্ভুতকিমাকারের আবির্ভাবের আগে আর পরে খালের মুখে আমি নৌকোর শব্দ শুনেছি। নৌকোয় চড়ে তারা এসেছিলো, আবার পালিয়ে গিয়েছে।'

জয়ন্ত বললো, 'সে কথা আমরাও জানি। আমরা যখন সাঁকোর দোতলায়, নৌকোখানা তখন খালের ওপারে গিয়ে লাগলো। তারপরেই শুনলাম দুড়্দাড় করে পায়ের শব্দ। কিন্তু নিচে নেমে নৌকোর মধ্যে জন-প্রাণীদের দেখতে পেলাম না।'

মাণিক বললো, 'কিন্তু নৌকোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে এই রাম-দা

খানা। তাড়াতাড়িতে তারা ভুলে গেছে।' সে একখানা বড়ো চক্‌চকে রাম-দা তুলে দেখালো।

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'বাপ্-রে. ঐ রাম-দাটা এনেছিলো তাহলে আমার গলাতেই বসাতে?'

মাণিক বললো, 'রাম-দার বাঁটের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওখানে একটি 'S' হরপ ক্ষোদা আছে।'

সুন্দরবাবু সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে দেখে বললেন, 'তাই তো হে, তাই তো!……কিন্তু জয়ন্ত. সেই রুমালের কোণে ছিলো I. B. B. এই তিনটে অক্ষর!'

জয়ন্ত বললো. 'হয়তো এটা হচ্ছে দলের আর কোনো লোকের নামের আদ্যাক্ষর।'

— 'সে নৌকোখানা আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার।'

— 'নৌকোখানা একজন পাহারাওয়ালার জিম্মায় রেখে এসেছি। কিন্তু সেখানা পরীক্ষা করে নতুন কিছু জানা যাবে বলে মনে হয় না। তার গায়ের নম্বর পর্যন্ত তুলে ফেলা হয়েছে। হয় সেখানা চোরাই নৌকো, নয় রাতের অন্ধকার ছাড়া তাকে চালানো হয় না। কিন্তু সুন্দরবাবু, যদিও আজকে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো তবু আমরা অন্ধকার হাতড়ে গোটা কতক দরকারি সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছি। প্রথমতঃ দলের একজনের নামের আদ্যাক্ষর হচ্ছে 'I', আর একজনের 'S'; দ্বিতীয়তঃ আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে, ওদের দলে একজন অদ্ভুত চেহারার অতিকায় লোক আছে, আর সে-ই সর্বপ্রথমে চুপি চুপি এসে আক্রমণ করে; তৃতীয়তঃ তারা মানুষের মুণ্ড কেটে নেয় রাম-দার কোপ মেরে, কারণ এর বাঁটের ধারে শুকনো রক্তের দাগ লেগে রয়েছে; চতুর্থতঃ এরা বলি দেবার মানুষ খুঁজে বেড়ায় শেষ রাতে গঙ্গার ধারে ধারে নৌকোয় চড়ে। উপরন্তু, ধোপার একটা মার্কাও পাওয়া গেছে। এতোগুলো সূত্র এতো সহজে পাওয়া ভাগ্যের কথা, ওর একটা না একটা নিশ্চয়ই আমাদের কাজে লেগে যাবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমার কথা যদি সত্যি হয়, ঐ হতচ্ছাড়া গলা-কাটার দল নৌকোয় চড়েই আনাগোনা করে থাকে, তাহলে এ মামলা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে মরি কেন? এসবের তদন্ত করুক পোর্ট-পুলিশ, আমাদের পক্ষে মানে মানে সরে দাঁড়ানোই ভালো।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললো, 'তা আর হয় না সুন্দরবাবু! মামলাটা হাতে যখন নিয়েছি, আমাদের কৌতূহল যখন জেগে উঠেছে, তখন আপনি সরে পড়লেও আমরা আর ছাড়বোনা। পোর্ট-পুলিশের সঙ্গেই কাজ করবো।'

সুন্দরবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, 'ঐ তো তোমাদের রোগ— এক-গুঁয়েমির জন্যই তোমরা একদিন পটল তুলবে! বেশ! আমিও তোমাদের সঙ্গেই থাকবো না হয়, কিন্তু তোমাদের কাছে এই মিনতি, আমাকে আর কখনো সন্ন্যাসী সাজতে বলোনা! ছিপ্ ধরে মৎস্য-শিকার করবে তোমরা আর আমার মাথাটা হবে তোমাদের শখের টোপ— এ মারাত্মক ব্যবস্থাটা তেমন যুৎসই বলে মনে হচ্ছে না।'

মাণিক বললো, 'সুন্দরবাবু, এতোদিন আমি ভাবতাম যে, আপনি নিজের দেহের মধ্যে টাক-পড়া দুঃখিত মাথাটার চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। কিন্তু আজ দেখছি আপনি মাথার জন্যেও মাথা ঘামান।'

সুন্দরবাবু মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'মাণিকের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে হাড় যেন জ্বলে যায়! চলো জয়ন্ত, এখন বাসার দিকে ফেরা যাক্।'

তখন সুন্দরবাবু, জয়ন্ত ও মাণিকের চারিদিকে কৌতূহলী ও উত্তেজিত জনতার সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তারা সবাই বিশেষ আগ্রহে ঠেলাঠেলি করে সব কথা শোনবার চেষ্টা করছিলো। আকাশে তখন সূর্য দেখা দিয়েছে। অন্ধকারের সব রহস্য চোখের সুমুখ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। দু'-তিনজন পাহারাওয়ালাও এতোক্ষণ পরে নিরাপদ গুপ্তস্থান থেকে অকুতোভয়ে আত্মপ্রকাশ করে বুক ফুলিয়ে লাঠি হাতে ভিড় তাড়াতে তাড়াতে নিজেদের জীবন্ত অস্তিত্বের প্রমাণ না দিয়ে পারলো না।

সুন্দরবাবু তাদের দেখেই খাপ্পা হয়ে বললেন, 'ওরে ডাল রুটি চোট্টা হনুমান পাঁড়ে আর জাম্বুবান চোবের বাচ্চারা। এতোক্ষণ কোন্ গর্তে ঢুকে

হিল্লী-দিল্লী ফতে করছিলে, যাদু? গরিব-নিরীহদের গলাধাক্কা দিয়ে এখন তো খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছো। কিন্তু একটু আগে আমি যখন স্কন্ধ-কাটা হবার ভয়ে চেঁচিয়ে পাড়া ফাটাচ্ছিলাম, তখন তোমরা কানে তুলো গুঁজে কোথায় ছিলে, বাপধন? রোসো, সব রাস্কেলের নামে রিপোর্ট করছি।'

সকলে গঙ্গার ধার ছেড়ে খালের পাশ দিয়ে বাড়িমুখো হলো।

জয়ন্ত কড়া-নাড়ামাত্র বেয়ারা এসে ভেতর থেকে দরজাগুলো খুলে দিলো। তারপর বললো, 'একটা হিন্দুস্থানী লোক এসে আপনাকে খুঁজছিলো।'

জয়ন্ত একটু আশ্চর্য হয়ে বললো, 'এতো সকালে কে সে?'

— 'জানি না হুজুর। একটা কাঠের বাক্স হাতে দিয়ে বললো, তার বাবু নাকি সেটা হুজুরকে ভেট দিয়েছেন। বলেই সে তাড়াতাড়ি চলে গেলো। বাক্সটা আমি বৈঠকখানার টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছি।'

জয়ন্ত আরো বেশি বিস্মিত হয়ে বললো, 'তুনিয়ায় মাণিক ছাড়া এমন বন্ধু কে আছেন, কাক-চিল ডাকতে না ডাকতেই আমাকে ভেট পাঠাবার জন্যে যিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? চলো তো, বৈঠকখানায় ঢুকে আগে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাক।'

সকলে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখলো, মাঝখানের বড়ো টেবিলটার ওপরে বসানো রয়েছে একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স। তার চারদিকেই পেরেক আঁটা। একদিকের পেরেকগুলো খুলতে খুলতে জয়ন্ত বললো, 'উপহারের কিঞ্চিত নূতনত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। বাক্সটা বেশ ভারি।'

একটু পরেই ডালাটা খুলে গেলো। বাক্সের ভেতর দিকে দৃষ্টিপাত করে জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'চমৎকার উপহার। সুন্দরবাবু, এরকম উপহার পেলে আপনি বোধ হয় খুবই খুশি হতেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'উপহার লাভের ভাগ্য আমার নেই। আমার বরাত চিরদিনই খারাপ। দেখি, তুমি কি পেলে?' কিন্তু এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ভেতরে একবার মাত্র উঁকি মেরেই তিনি যেন বিষম ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এসে বিকট স্বরে বলে উঠলেন, 'হুম্, হুম্, হুম্, হুম্!'

মাণিকও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ভেতরে তাকিয়ে সভয়ে দেখলো, তার চোখের পানে আকৃষ্ট চোখে চেয়ে আছে একটা রক্তহীন রোমাঞ্চকর কাটামুণ্ড। সে মুণ্ড ভারতীয়ের নয়, ইংরেজের।

জয়ন্ত কঠোর রবে অট্টহাস্য করে বলে উঠলো, 'হে অজানা বন্ধু, তোমাকে ধন্যবাদ! এ উপহারের কথা জীবনে আমি ভুলবো না।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কেল্লা মার দিয়া

এ কী ভয়ানক ভেট্!

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে আরো পিছিয়ে পড়ে একখানা চেয়ারের ওপরে তাঁর প্রায়-অবশ বিপুল দেহখানি স্থাপন করলেন। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ফ্যান্ খুলে দাও, ফ্যান্ খুলে দাও। হুম্! আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।'

মাণিক বিজলি-পাখা চালিয়ে দিলো, জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাক্সের ভেতরটা আরো ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলো।

নৃমুণ্ড-শিকারীরা যে একজন ইংরেজ খালাসিকেও বলি দিয়েছে, খবরের কাগজে সে কথাটাও প্রকাশ পেয়েছে যথা সময়ে। জয়ন্ত বুঝলো, এ হচ্ছে সেই খালাসিটারই কাটামুণ্ড। কোনো ধারালো অস্ত্রের এককোপে বেচারার মুণ্ডটাকে দেহ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

জয়ন্ত খাণিকক্ষণ দেখে হঠাৎ কাটামুণ্ডের মাথার সোনালি চুলের ভেতর একবার হাত বুলিয়ে নিলো।

তারপর একটু বিস্মিত স্বরে বললো, 'দেখছি, মুণ্ডুটাকে 'স্পিরিটে' ডুবিয়ে রাখা হয়েছিলো। চুলগুলো এখনো ভিজে রয়েছে, বাক্সের ভেতর থেকেও 'স্পিরিটের গন্ধ বেরোচ্ছে।'

মাণিক বললো, 'তার মানে?'

— 'মুণ্ডুটাকে বোধ হয় জিইয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছিলো।'

ভুরু চোখ পাকিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'ও বাবা, সে কি? বরফ টরফ দিয়ে লোকে মাছ-মাংসই টাট্কা রাখে জানি, খাবে বলে। স্পিরিটের মধ্যে ফেলে এরা কাঁচা মড়ার মাথা টাট্কা রাখতে চেয়েছে কেন? এরা মানুষের মুড়ো খায় নাকি?'

মাণিক বললো, 'হতে পারে। আর সেইজন্যেই হয়তো আপনার মুড়োর ওপরে ওদের লোভ পড়েছিলো।'

সুন্দরবাবু রেগে টং হয়ে বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও, মাণিক?'

— 'আমি বলতে চাই, আপনার মুড়োটাও পেলে ওরা হয়তো পচতে দিতো না, স্পিরিটে ভিজিয়ে টাট্কা রাখতো। তারপর কোনো শুভদিনে হয়তো সুন্দরবাবুর মুড়ো দিয়ে সুন্দর ডাল রেঁধে ফেলতো। তবে দুঃখের কথা এই যে, সে মুড়োর ডাল খাবার জন্যে কেউ আমাদের নিমন্ত্রণ করতো না।'

সুন্দরবাবু এতো ক্রুদ্ধ হলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দ পর্যন্ত বেরোলো না।

জয়ন্ত বললো, 'মাণিক, ঠাট্টা-ঠুট্টি রেখে এখন কাজের কথা শোনো।…এই কাটা-মুণ্ডটা আমাদের কাছে কেন পাঠানো হয়েছে?'

মাণিক বললো, 'নিশ্চয়ই আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে। খুনীরা আমাদের চেনে আর ভয় করে, তাই তারা বলতে চায়, আমরা যদি ওদের পথ থেকে সরে না দাঁড়াই, তাহলে আমাদেরও ঐ দশা হবে।

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললো, 'বোধ হয় তোমার আন্দাজ ভুল নয়। কিন্তু এখন কতকগুলো কথা ভেবে দেখো। আমরা যে এই মামলা হাতে নেবো, কালকের আগে আমরাই তা জানতাম না। সুতরাং এটা বোঝা শক্ত নয় যে, খুনীরা আমাদের খোঁজ পেয়েছে পরে। কিন্তু পরে— কখন? কাল রাতে আমরা যে তাদের ধরবার জন্যে কোনো ফাঁদ পেতেছি, সে কথা নিশ্চয়ই তারা জানতো না, কারণ জানলে তারা ফাঁদে পা দিতো না। সেটা জোর করেই বলা যায়। আর কাল রাতের

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারেও তারা আমাদের চিনতে পারে নি। তাহলে তারা কখন আমাদের আবিষ্কার করেছে?'

মাণিক একটু ভেবে বললো, 'খুব সম্ভব আজ সকালে। — বেশ, তোমার এই অনুমান ধরেই অগ্রসর হওয়া যাক। ভোর হবার পর আমরা গঙ্গার ধারে অপেক্ষা করেছিলাম আধ ঘণ্টার বেশি নয়। তারপর সেখান থেকে বাসায় ফিরতে আমাদের সময় লেগেছে বড়ো জোর পনেরো মিনিট।'

সুন্দরবাবু অধীর স্বরে বললেন, 'তোমাদের জ্বালায় আর পারি না, জয়ন্ত! এই কি আধঘণ্টা আর পনেরো মিনিটের হিসেব রাখবার সময়?'

জয়ন্ত বললো, 'সুন্দরবাবু, আপনি এখন আমাদের কথায় কান পাতবেন না— তার বদলে চা, টোষ্ট্‌ আর এগ-পোচ নিয়ে ব্যস্ত থাকুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঐ কাটা-মুণ্ডুর সামনে এসে আমি খাবার খাবো? হুম্‌, থুঃ, থুঃ।'

— 'তাহলে চুপ করে বসে থাকুন, কারণ এখন খুনীদের আড্ডা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।'

সুন্দরবাবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, 'ছাই করছো।'

সে টিপ্পনি কানে না তুলে জয়ন্ত বললো, 'শোনো মাণিক, দেখা যাচ্ছে, সকাল হবার পর আমরা বাড়ির বাইরে ছিলাম মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাত্র। তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কেউ আমাদের দেখেই ছুটে বাসায় গিয়ে, 'স্পিরিটে' চোবানো মড়ার মাথা তুলে নিয়ে, 'প্যাকিং' বাক্সে পুরে, তাড়াতাড়ি আমাদের ফেরবার আগেই এখানে রেখে পালিয়ে গিয়েছে।'

মাণিক উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলো, 'সাবাস্‌ জয়ন্ত, সাবাস্‌! তুমি তো বলতে চাও, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে যে লোক এতোগুলো কাজ করেছে, সে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি থেকে দূরে বাস করে না?'

— 'ঠিক তাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার আড্ডা গঙ্গা কি খালের

ধার থেকে খুব কাছেই। দেখছো মাণিক, আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র কতোটা ছোট্ট হয়ে পড়লো? সুন্দরবাবু, আপনি কি বলেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, কিছুই না। তোমার বুদ্ধির দৌড় দেখে হতভম্ব হয়েছি! এতো সহজে এতো বড়ো আবিষ্কার। আশ্চর্য!'

জয়ন্ত রূপোর নস্যদানি বার করে নস্য নিতে নিতে বললো, 'এখন কথা হচ্ছে, খাল আর গঙ্গার আশে পাশে বড়ো কম রাস্তা আর বাড়ি নেই। কোন্ রাস্তায় আর কোন্ বাড়িতে গেলে আমরা খুনীদের আড্ডা খুঁজে বার করতে পারবো?'

সুন্দরবাবু আবার হতাশ হয়ে পড়ে বললেন, 'হুম্, ওটা কিন্তু খুঁজে বার করা অসম্ভব।'

জয়ন্ত 'প্যাকিং' বাক্সের দিকে অল্পক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলো। তারপর চুল ধরে মুণ্ডুটাকে টেনে তুলে বললো, 'প্যাক করার সময়ে মুণ্ডুটার চারপাশে দেখছি কতকগুলো খবরের কাগজ পুরে দেওয়া হয়েছে। মাণিক, কাগজগুলো বের করে ফেলো তো!'

মাণিক কাগজগুলো টেনে নিয়ে বললো, 'তিনদিনের তিনখানা ষ্টেট্স্‌ম্যান।'

জয়ন্ত মুণ্ডুটাকে আবার বাক্সের ভেতরে রেখে বললো, 'হুঁ। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, খুনীদের দলের কেউ নিয়মিতভাবে 'ষ্টেট্স্‌ম্যান' পড়ে। তাহলে আমরা কোনও মূর্খ, সাধারণ অপরাধীর পাল্লায় পড়িনি— তার পেটে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ইংরেজি বিদ্যা আছে! হয়তো সে 'ষ্টেট্স্‌ম্যানের' বাঁধা গ্রাহক।'— বলতে বলতে সে দ্রুতপদে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, 'জয়ন্ত অমন ছুটে পাগলের মতো হঠাৎ কোথায় গেলো হে?'

মাণিক বললো, 'বোধ হয় আপনার জন্যে চা আর খাবার আনতে।'

সুন্দরবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'যে হাতে সে ঐ কাটা-মুণ্ডু ছুঁয়েছে, সেই হাতে আমার খাবার আনবে? আমি কখ্খনো খাবো না।'

— 'খাবেন না কি, খেতেই হবে!'

— 'খেতেই হবে? ইস্, জোর নাকি? ওর ছোঁয়া খাবার যদি খাই, তাহলে আমি তো অনায়াসেই মড়ার মাংসও খেতে পারি! হুম্, জয়ন্তকে মানা করে দাও, আমার এখনি গা বমি-বমি করছে। হুম্, ওয়াক্— ওয়াক্!'

মাণিক বহু কষ্টে সুন্দরবাবুকে শান্ত করে বললো, 'ভয় নেই সুন্দরবাবু, আজ আর আপনাকে খেতে অনুরোধ করবো না— আপনার গা বমি-বমি থামিয়ে ফেলুন।'

— 'তা যেন থামালাম, কিন্তু আজ আমি এখুনি বিদায় হতে চাই।'

— 'না না না, আর একটু বসুন— জয়ন্ত আগে ফিরে আসুক।'

মিনিট পনেরো পরে ঘন ঘন নস্য নিতে নিতে জয়ন্ত ফিরে এসে বললো, 'আমি 'ষ্টেটস্‌ম্যান' অফিসের এক বিশেষ বন্ধুকে ফোন করতে গিয়েছিলাম।'

— 'কেন?'

— 'আমি জানি, এ অঞ্চলের খুব কম বাঙালিই 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান'-এর বাঁধা গ্রাহক। সুতরাং গঙ্গা আর খালের সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি রাস্তাগুলোর মধ্যে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের' কোন্ কোন্ নিয়মিত গ্রাহক আছেন, ফোনে সেই খবরটাই জানবার চেষ্টা করছিলাম।'

— 'কি জানতে পারলে?'

— 'জনকয়েক গ্রাহকের নাম আর ঠিকানা জানতে পেরেছি।'

— 'তারপর?'

— 'একজনের কিছু সন্ধান নিতে হবে। তাঁর নাম সত্যচরণ চৌধুরী, তিনি ১৫ নং বিষ্ণুবাবু লেনে থাকেন। বিষ্ণুবাবু লেন থেকে গঙ্গার ধারে যেতে বা আমার বাড়িতে আসতে মিনিট কয়েকের বেশি লাগে না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু এই তুচ্ছ কারণে কারুর ওপরে সন্দেহ করা ঠিক নয়।'

— 'সুন্দরবাবু, আপনি কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন যে, রাম-দার

ওপরে S হরফ কোদা আছে? কে বলতে পারে, ওটা সত্যচরণ চৌধুরীর নামের আদ্যাক্ষর নয়?'

সুন্দরবাবু লাফ মেরে বলে উঠলেন, 'ঠিক, ঠিক! হুম্!'

জয়ন্ত বললো, 'সেই রক্তাক্ত রুমালের কোণে ছিলো I. B. B. এই তিনটে অক্ষর। সুন্দরবাবু, আপনি এখন S-কে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে থানায় গিয়ে খবর নিন, রুমালে ধোপার মার্কার কোনো কিনারা হলো কিন।'

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় জয়ন্তের ফোন টুং-টাং করে বেজে উঠলো।

মাণিকের তবলার সঙ্গতের সঙ্গে জয়ন্ত তখন তার নিয়মিত বাঁশির সাধনায় নিযুক্ত ছিলো। তাড়াতাড়ি বাঁশি ফেলে ফোন ধরলো।

— 'হ্যালো!'

— 'হুম্!'

— 'কি ব্যাপার, সুন্দরবাবু?'

— 'বিষম ব্যাপার! ধোপার খোঁজ পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলেরই ধোপা! তার সঙ্গে গিয়ে যার রুমাল তাকে গ্রেপ্তার করেছি। তার নাম ইন্দুভূষণ ব্যানার্জি। মার্চেন্ট অফিসে কেরাণীগিরি করে।'

— 'তাঁর বাড়ির ঠিকানা কি?'

—'১৫-এ, বিষ্ণুবাবুর লেন। তোমার সত্যচরণ চৌধুরীর বাড়ির গায়েই তার বাড়ি।'

—'কিন্তু আপনি কি সত্য চৌধুরীর বাড়িতেও কোন খোঁজ নিয়েছেন?'

— 'না, বলোতো এক্ষুণি নিই।'

— 'আপনাকে সে-সব কিছুই করতে হবে না। খোঁজ যা নেবার, আমিই নিয়েছি। আপনি বরং ইন্দুভূষণকে নিয়ে আমার এখানে আসুন।'

— 'হুম্, এখনি যাচ্ছি। জয়ন্ত, আমার প্রাণটা ভারি খুশি হয়ে উঠেছে— কেল্লা মার দিয়া।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীবন্ত ও সবাক বস্তা

ফোনের রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে জয়ন্ত যেন আপনমনেই বললো, '১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে থাকে সত্যচরণ চৌধুরী, আর ১৫-এ নম্বরে থাকে ইন্দুভূষণ ব্যানার্জি। আশ্চর্য!'— সে ফোনে এইমাত্র যা শুনলো, মাণিকের কাছে সব খুলে বললো।

মাণিক উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'বলো কি জয়ন্ত, বলো কি! রাম-দার ওপরে ক্ষোদা ছিলো **S** অক্ষর আর রুমালে ছিলো **I. B. B.** এই তিন অক্ষর। তুই ঘটনাস্থলে থেকে আমরা এই দু'টি সূত্র পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও এ সূত্র দু'টির কোনোই দাম ছিলো না। কলকাতায় কতো হাজার লোকের নামে সঙ্গে ঐ **S** আর **I.B.B.** অক্ষরগুলি মিলে যায়, কে তার হিসেব রাখে? দৈবক্রমে কতো সহজে আসল লোকদের ঠিকানা আবিষ্কার করে ফেললাম। জয়ন্ত, ভাগ্যদেবী আমাদের সহায়, নইলে এটা সম্ভবপর হতো না।

জয়ন্ত বললো, 'গোয়েন্দারা যতো বুদ্ধিমানই হোক, ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহ তাদের পক্ষে অত্যন্ত দরকার। আবার, অপরাধীদের ওপর চালাকিও তাদের অনেক কাজে আসে; ধরো, এই মুণ্ড-শিকারীদের কথা। কাটা-মুণ্ড ভেট পাঠিয়ে ওরা যদি আমাদের মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা না করতো, তাহলে বিষ্ণুবাবুর লেনের সত্যচরণ চৌধুরীর ওপরে আমাদের কোনো সন্দেহই হতো না। ওরা তিন-তিনটে মারাত্মক ভুল করেছে।

প্রথম, রক্তাক্ত রুমালখানা ঘটনাস্থলের কাছে ফেলে গেছে। দ্বিতীয়, রাম-দাখানাও নৌকো থেকে তুলে নিয়ে যায় নি। তৃতীয়, উপরি-উপরি তিন দিনের 'ষ্টেটস্‌ম্যান' প্যাকিং বাক্সে রেখে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তাদের দলের কেউ ঐ কাগজখানার নিয়মিত পাঠক। হ্যাঁ, ওদের চার নম্বরের ভুলের কথাও বলি। ওরা আজ সকালেই অতো শীগ্‌গির আমাদের ভয় না দেখালেই ভালো করতো। ঘণ্টাকয়েক অপেক্ষা করার পর মুণ্ডটা পাঠালে আমরা তো কিছুতেই ধরতে পারতাম না যে, খুনীরা আমাদের বাড়ির এতো কাছে থাকে।

মাণিক বললো, 'তুমি তো আজ বিকেলে বাইরে বেরিয়েছিলে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে, কিছুই তো বললে না?'

— 'গিয়েছিলাম বিষ্ণুবাবুর লেনে সত্য চৌধুরীর খবর নিতে। কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। বিষ্ণুবাবুর লেনের ১৫ নম্বর বাড়ির সামনেই এক মুদিখানা আছে। মুদির সঙ্গে ভাব করে জানলাম, সত্য চৌধুরী হচ্ছে নাকি বিহার অঞ্চলের এক জমিদার। কলকাতার ও-বাড়িখানা সে গেলো বছরে কিনেছে। মাঝে মাঝে ওখানে থাকে, মাঝে মাঝে দেশে যায়। বয়স হবে চল্লিশ। ভীষণ শক্তি, এ বছরে এমন ঘটা করে কালিপূজো করেছে যে, তেমন ঘটা এখানকার কেউ কখনো দেখেনি। দারুণ লম্বা-চওড়া আর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চেহারা— তাকে দেখলে শৌখীন জমিদার বলে মনে হয় না— মনে হয়, সেকালকার কাপালিক বলে। গলায় বড়ো বড়ো রুদ্রাক্ষের মালা। প্রতি অমাবস্যায় রক্তবস্ত্র পরে কালীপূজোয় বসে। পাড়ার কারোর সঙ্গে মেলামেশা করে না তবে তার লোকের অভাব নেই। অনেক চাকর, দারোয়ান আর কর্মচারি সেখানে বাস করে।

মাণিক বললো, '১৫-এ নম্বরের বাড়ি থেকে সুন্দরবাবু যে ইন্দ্র বাঁড়ুজ্যেকে ধরেছেন, সেও নিশ্চয়ই তাহলে ঐ সত্য চৌধুরীরই চ্যালা?'

— 'তাই তো হওয়া উচিত। নইলে ইন্দুর নাম লেখা রক্তাক্ত রুমাল ঘটনাস্থলে পাওয়া যেতো না। সত্য চৌধুরীর বাড়ির পাশেই আছে হাত তিনেক চওড়া সরু গলি। তার পরই ছোটো ছোটো তিনখানা বাড়ি।

তাদের নম্বর হচ্ছে ১৫-এ, ১৫-বি, ১৫-সি। সে বাড়িগুলো দেখলে মনে হয়, একখানা বাড়িকেই যেন তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর বেশি আর কিছু আমি লক্ষ্য করিনি।...ব্যস্, আর কোনো কথা নয়। ঐ শোনো, সুন্দরবাবুর 'হুম্' বলে হুহুঙ্কার।...(উচ্চকণ্ঠে) আসুন সুন্দরবাবু, আসামীকে নিয়ে ওপরে আসুন!

সিঁড়িতে দুমদাম পায়ের শব্দ। তারপর প্রথমেই আবির্ভূত হলেন বিজয়ী বীরের মতো স্ফীত বক্ষে, দীপ্ত চক্ষে, গর্বিত ভঙ্গিতে সুন্দরবাবু! তারপর দু'জন পাহারাওয়ালার মাঝখানে দেখা গেলো হাতকড়ি পরা ও কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় আসামীকে।

সুন্দরবাবু সদম্ভে বললেন, 'হুম্'! এই নাও ভায়া তোমার মুণ্ড-শিকারী ইন্দ্র বাঁড়ুজ্যেকে। দেখছো তো, কতো চট্‌পট্ কাজ হাঁসিল করে ফেললাম? হেঁ-হেঁ বাবা, তোমাদের মতো শখের গোয়েন্দার সঙ্গে এইখানেই আমাদের তফাৎ।

কিন্তু জয়ন্ত ও মাণিক তখন সুন্দরবাবুর মুখ-সাবাসি শুনছিলো না। তারা নিষ্পলক নেত্রে বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো আসামী ইন্দ্র বাঁড়ুজ্যের দিকে।

এই কি এতোগুলো হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়কের মূর্তি? তার অতিশয় রোগা লিক্‌লিকে দেহখানা সামনের দিকে বেঁকে পড়েছে কুমড়োর ফালির মতো— একটা ঠেলা মারলেই সে দেহ যেন মাটিতে পড়ে ঠুন্‌কো কাঁচের পেয়ালার মতো ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। মুখখানা ভয়ে মড়ার মতো শাদা, চোখ দুটো তাড়া খাওয়া খরগোসের মতো বিস্ফারিত এবং হাত-পাগুলো কাঁপছে থর থর করে।

জয়ন্ত ও মাণিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে ইন্দু ধপাস করে মাটির ওপরে বসে পড়লো এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কলকাতার বুকের ওপরে বেপরোয়ার মতো যারা এমন ভয়াবহ খুনের পর খুন করতে পারে, তাদের কেউ কখনো এমন কাপুরুষ হয়!

সুন্দরবাবু হুম্‌কি দিয়ে বলে উঠলেন, 'থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে! আর

মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। যখন আমার মুণ্ডুটা কচ্ করে কেটে ফেলতে এসেছিলে তখন নিজের প্রাণের মায়া হয়নি চাঁদ?'

জয়ন্ত দু'পা এগিয়ে গিয়ে নরম স্বরে বললো, 'তোমার নাম কি?'

অশ্রুকাতর কণ্ঠে আসামী বললো, 'শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, শ্রীইন্দুভূষণ, না ছাই! বিশ্রী ইন্দুভূষণ।'

জয়ন্ত জিগ্যেস করলো, 'তুমি কি করো?'

— 'টমসন-মরিসনের অফিসে চাকরি করি।'

— 'কতো টাকা মাইনে পাও?'

— 'ষাট টাকা।'

— '১৫-এ বিষ্ণুবাবুর লেনে তোমার সঙ্গে আর কে কে থাকে?'

— 'আমার স্ত্রী, এক ছেলে আর এক মেয়ে। ওখানে আমাদের অনেক কালের বাস। আমরা তিন ভাই পাশাপাশি তিনখানা বাড়িতে থাকি, আগে ও বাড়িগুলো এক ছিলো, এখন ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।'

— 'সত্য চৌধুরীর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?'

— 'খুব অল্প। তিনি জমিদার মানুষ, আমাদের মতন গরিব লোককে কেয়ারই করেন না। আমাদের বাড়িগুলো তিনি কিনে নিতে চান; আমরা রাজি নই। এই সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একবার আমার কথাবার্তা হয়েছিলো।'

— 'আচ্ছা ইন্দু, তুমি জানো তো, কিছুদিন আগে গঙ্গার ধারে ডবল খুন হয়েছিলো আর সেইখানেই তোমার একখানা রক্তমাখা রুমাল কুড়িয়ে পাওয়া গেছে?'

ইন্দু আবার কাঁদতে লাগলো।

— 'কাঁদছো কেন? ও রুমাল কি তোমার নয়?'

— 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ও রুমাল আমারই। কিন্তু ওখানে ও রুমাল কেমন করে গেলো, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি করে বলে উঠলেন, 'কিছুই বুঝতে পারছেন না! দু'দিন পরে যখন ফাঁসি কাঠে দোল খাবে, তখন ঠিক বুঝতে পারবে।'

ইন্দু এবার হাঁউ-মাউ করে কেঁদে উঠে বললো, ,ইনস্পেক্টরবাবু, আমি নির্দোষ— আমার কথা বিশ্বাস করুন।'

জয়ন্ত মিষ্টি স্বরে বললো, 'ইন্দু, কেঁদো না। যা জিগ্যেস করি, ঠিক ঠিক জবাব দাও। তুমি নির্দোষ হলে তোমার কোনো ভয় নেই।'

চোখের জল মুছতে মুছতে ইন্দু বললো, 'কি জিগ্যেস করবেন, করুন। আমি মিথ্যা বলবো না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ইস, উনি মিথ্যা বলবেন না— ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।'

মাণিক টিপ্পনি কাটলো, 'সুন্দরবাবু, আপনার উপমায় ভুল হলো। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির একবার মিথ্যা কথা বলেছিলেন।'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'হুম্! বলেছিলেন— বেশ করেছিলেন।'

— 'তাহলে ইন্দুও আজ একবার মিথ্যা বলতে পারে।'

— 'ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ইন্দুর তুলনা হয় না। যুধিষ্ঠির কোনো দিন মুণ্ডু শিকার করেন নি— হুম্!'

জয়ন্ত বললো, 'ইন্দু, ভালো করে মনে করে দেখো। কোনোদিন তোমার রুমাল হারিয়েছে?'

ইন্দু খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবলো। তারপর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, মশাই মনে পড়েছে।'

— 'কি?'

— 'হপ্তাখানেক আগে আমার ঘর থেকে একখানা রুমাল আশ্চর্য উপায়ে অদৃশ্য হয়েছিলো।'

— 'আশ্চর্য উপায়ে?'

— 'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেদিন আমার ময়লা জামা কাপড় ছাড়বার কথা। আমার স্ত্রী ফর্সা জামা কাপড় আলনায় ঝুলিয়ে রাখলেন আর একখানা রুমাল পাট করে রাখলেন টেবিলের ওপরে। অফিস যাবার সময়ে খেয়ে দেয়ে উপরে উঠে আমি কিন্তু রুমালখানা আর খুঁজে পেলাম না। স্ত্রী বললেন, "বোধহয় জোর হাওয়ায় কোনোগতিকে সেখানা উড়ে গেছে।" অগত্যা সেই কথাই আমাকে মানতে হলো।'

— 'যে টেবিলের ওপর রুমালটা রেখেছিলো, তার সামনে — অর্থাৎ খুব কাছেই একটা জানলা ছিলো তো?'

— 'কি আশ্চর্য, ঠিক বলেছেন! টেবিলের গায়েই জানলা আছে।'

— 'জানলার বাইরে কি আছে?'

— 'একটা খুব সরু গলি।'

—'তারপর?'

— 'সত্যবাবুর বাড়ির বারান্দা।'

— 'সেই বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে আমি কি তোমার জানলার ভেতর দিয়ে টেবিলের ওপরে হাত দিতে পারি?'

ইন্দু বিস্মিত স্বরে বললো, 'তা পারেন। কিন্তু আপনার কথার অর্থ কি?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে পকেট থেকে নস্যদানি বার করলো।

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি কি আমার মামলাটা ফাঁসিয়ে দেবার চেষ্টায় আছো? তুমি কি বলতে চাও, পাশের বাড়ি থেকে অন্য কেউ রুমালখানা চুরি করেছে? কেন? ভারি তো দামি জিনিস! আমি ইন্দুর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'

ইন্দু কাতর স্বরে বললো, 'আমি সত্যি কথাই বলছি ইনস্পেক্টরবাবু। আমার স্ত্রীকে জিগ্যেস করে দেখতে পারেন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই জিগ্যেস করবো। তোমার ঘর, টেবিল আর জানলাও দেখবো!... এই সেপাই! বদ্‌মাইসটাকে ধরে নিয়ে চল্! আমি এখনি ওদের বাড়িতে যাবো। আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা? দেখাচ্ছি মজাটা!'

জয়ন্ত বললো, 'চলুন সুন্দরবাবু, আমরাও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি সত্য চৌধুরীর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।'

সুন্দরবাবু মুখ ভার করে বললেন, 'তুমি যা খুশি করতে পারো, কিন্তু দয়া করে আমাকে আর সাহায্য করতে এসো না। হুম্, তুমি সাহায্য না করলেও আমার চলবে।'

সুন্দরবাবু আসামী প্রভৃতিকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

মাণিক বললো, 'জয়ন্ত, তুমি কি মনে করো যে, ইন্দুর রুমাল সত্য চৌধুরী বা অন্য কেউ চুরি করেছে ?'

— 'হতে পারে।'

— 'কিন্তু কেন ?'

— 'পুলিশকে বিপথে চালনা করবার জন্যে।··· কিন্তু ও কথা এখন থাক। এসো, আগে একটু চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নি, তারপর সত্য চৌধুরীর বাড়ির দিকে যাত্রা করবো।'

চা পান করে মিনিট পনেরো পরে জয়ন্ত ও মাণিক যখন বাড়ি থেকে বেরোলো, রাত তখন দশটা হবে।

একে তো এ অঞ্চলের পথ-ঘাটগুলো এ সময়ে নির্জন হয়ে পড়ে, তার ওপর আগেই বলা হয়েছে, নৃমুণ্ড-শিকারীদের উৎপাতে গঙ্গার আশেপাশের রাস্তায় রাত্রে আজকাল লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় বেরিয়ে জয়ন্ত ও মাণিক জনপ্রাণীকে দেখতে পেলো না। নিঝুম-স্তব্ধতার মধ্যে পথের ওপরে শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলো কেবল তাদের দু'জনের পায়ের জুতোগুলো।

এদিক থেকে বিষ্ণুবাবুর গলিতে ঢোকবার আগেই মাঝে পড়ে ছোটো-খাটো একটা মাঠ। তারই ধার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাদের কানে জাগলো অদ্ভুত একটা শব্দ! কে যেন 'হুঁ-হুঁ-হু-হুঁ-হুঁ' রবে আর্তনাদ বা গর্জন করছে।

জয়ন্ত ও মাণিক সচমকে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগলো। আকাশে ক্ষীণ চাঁদের রেখা মাত্র, গ্যাসের আলোও স্পষ্ট নয়।

মাণিক ভ্রূ-সঙ্কুচিত করে দেখে বললো, 'মাঠের ওপরে বস্তার মতো ওগুলো কি পড়ে রয়েছে ?'

জয়ন্ত বললো, 'খালি পড়ে রয়েছে নয়, বস্তাগুলো ছট্‌ফট্ করছে।'

তারা এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলো।

অমনি একটা বস্তা আরো জোরে বলে উঠলো, 'হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ।'

বড়ো বড়ো তিনটে চটের থলে, মুখগুলো বাঁধা।

থলেগুলোর বাঁধন কাটতেই বেরিয়ে পড়লো সুন্দরবাবু ও দুই পাহারাওলার মূর্তি! প্রত্যেকেরই হাত-পা-মুখ বাঁধা।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুর মুখ ও হাত-পা মুক্ত করে দিয়ে বললো, 'কি ভয়ানক। এ কি কাণ্ড!'

সুন্দরবাবু করুণ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ঐ তেমাথার মোড়ে আসতেই গলির ভেতর থেকে কারা বেরিয়ে এসে আমাদের হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেললো, তারপর থলের ভেতরে পুরে আমাদের মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে রেখে সরে পড়লো।'

— 'তাদের দেখতে পান নি?'

— 'কি করে দেখবো ভাই? দেখো না, ওখানকার গ্যাস বাতি দুটো নিবিয়ে রেখেছে! ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার।'

— 'ইন্দু? ইন্দু কোথায় গেলো?'

— 'হুম্‌, লম্বা দিয়েছে। পাপী কখনো সত্যি কথা কয়? তুমি সেই শয়তানের কথায় ভুললে বলেই তো আমার এই দুর্দশা! নইলে আজ রাত্রে আমি কি আর এ-মুখো হতাম? তারই দলবল এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে! হায়-হায়, হাতে পেয়েও হারালাম!'

জয়ন্ত অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, মানুষ চেনা কি এতোই শক্ত? তার চোখেও ইন্দু ধুলো দিলো!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহা-ভয়ঙ্কর

মাণিক বিস্মিত কণ্ঠে বললো, 'সেই তালপাতার সেপাই ইন্দু! বাঁখারির মতো লিক্‌লিকে হাত-পা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, ছিঁচকে চোরের চেয়েও ভীতু— সে খালি নৃমুণ্ড-শিকারীই নয়। সুন্দরবাবুর মতো জাঁদরেল পুলিশ অফিসারকেও কুপোকাৎ করে লম্বাও দিতে পারে! অবাক কাণ্ড!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভুল মাণিক, ভুল। সেই পাজি-ছুঁচোটা মোটেই ভীতু নয়, আমাদের সামনে ভয়ের অভিনয় করছিলো! তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েই তো আমার এই দুর্দশা।'

মাণিক বললো, 'তবু চরম দুর্দশার হাত থেকে আপনি আজও বেঁচে গেছেন।'

— 'তার মানে?'

— 'আপনাদের বস্তায় না পুরে, তারা যে আপনাদের মুণ্ডুগুলো কচাকচ্ কেটে নিয়ে বাড়ি চলে যায় নি, এইটুকুই রক্ষা!'

মুণ্ডু কাটার কথা মনে করিয়ে দিতেই সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হুম্। চলো, বাসার দিকে ফেরা যাক্।'

জয়ন্ত বললো, 'না, আমি এখন ১৫-এ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে যাবো।'

— 'কেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আসামী আজ আর কখনো নিজের বাড়িতে ফেরে? এতোক্ষণে সে হয়তো কলকাতা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।'

— 'তবু আমি যাবো। এসো মাণিক!'

— 'আমি বাবা আজ আর ও-মুখো হচ্ছি না। হুম, এই রাতের

অন্ধকারে আবার কোনো নতুন বিপদ ঘটতে পারে। আমি কাল সকালে তদন্তে বেরোবো।'

জয়ন্ত ও মাণিক আর দাঁড়ালো না, হন্ হন্ করে বিষ্ণুবাবুর গলির দিকে এগোতে লাগলো।

জয়ন্ত যেতে যেতে বললো, 'মাণিক, খুব সাবধান। এ গলিটা সাপের মতো ক্রমাগত পাক খেয়ে এঁকে বেঁকে গেছে, প্রতি মোড়েই অতর্কিতে আমাদের ওপরে আক্রমণ হতে পারে। রিভলভার তৈরি রাখো।'

এক জায়গায় পেছনে যেন দ্রুত পদশব্দ শোনা গেলো, কিন্তু কারুকে দেখা গেলো না। আর এক জায়গায় রোয়াকের ওপর কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একটা লোক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলো; খানিকটা এগিয়ে যাবার পর জয়ন্ত হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখলো, সে লোকটা উঠে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে!

জয়ন্ত অট্টহাস্য করে বললো, 'ঘুমিয়ে পড়ো ভায়া, আবার ঘুমিয়ে পড়ো। নইলে, বলো আমরাই তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে আসি।' লোকটা রোয়াক থেকে নেমে পড়েই চোঁ-চা দৌড় মারলো। পথে আর কোনো ঘটনা ঘটলো না। তারা বিষ্ণুবাবুর লেনে ১৫-এ নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেলো, ভেতর থেকে মেয়ে-গলায় কাতর কান্না।

জয়ন্ত বললো, 'নিশ্চয়ই ইন্দু বাঁড়ুজ্যের বৌ। স্বামীর জন্য কাঁদছেন।'

মাণিক বললো, 'বোঝা যাচ্ছে, ইন্দু তাহলে বাড়িতে ফেরেনি আর তার পালানোর খবর এখনো এখানে এসে পৌঁছোয়নি।'

জয়ন্ত ফিরে দেখলো, তার পূর্বপরিচিত মুদি তখন ঝাঁপ তুলে সে রাতের মতো দোকান বন্ধ করবার চেষ্টায় আছে। সে মুদির কাছে গিয়ে বললো, 'কি হে বাপু, ঐ বাড়ির ইন্দুর কোনো খবর রাখো!'

— 'ইন্দুবাবু? হ্যাঁ, তিনি তো আমার খদ্দের। আহা, অমন নিরীহ ভদ্রলোক আর দেখিনি। কিন্তু কেন জানিনা, আজ পুলিশ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে।'

— 'এখনো ছাড়েনি?'

— 'পুলিশ কি সহজে ছাড়ে বাবু ? জানেন না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ! শুনছেন না, তাঁর ইস্ত্রী তাই কাঁদছেন !'

— 'সত্য চৌধুরী এখন বাড়িতে আছেন কি ?'

— 'জমিদারবাবু ? না, হঠাৎ কি জরুরি তার পেয়ে আজ সন্ধ্যের গাড়িতেই তিনি দেশে চলে গেছেন। বাড়িতে আছে খালি এক বুড়ো দারোয়ান। যাই মশাই, রাত হলো। নমস্কার।'

মুদি চলে গেলো। জয়ন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে সত্য চৌধুরীর বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো।

বাড়িখানা বেশ বড়োসড়ো। তেতলা। কিন্তু তার সমস্ত জানলা বন্ধ। দারোয়ান তখন বোধহয় ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কারণ বাড়ির কোথাও একটা আলোর চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

মাণিক বললো, 'সত্য চৌধুরী লোকজন নিয়ে হঠাৎ সরে পড়লো কেন ? সে কি আন্দাজে বুঝে নিয়েছে, আমরা তার ওপরে সন্দেহ করেছি ?'

কিন্তু জয়ন্ত সে কথার জবাব না দিয়ে বললো, 'দেখো মাণিক, সত্য

চৌধুরীর বাড়ির পাশের ঐ হাত তিনেক চওড়া অন্ধকার কানা-গলিটা। গলির এ পাশেই ইন্দুর বাড়ি।'

মাণিক বললো, 'ও গলিতে দেখবার কি আছে?'

— 'কিছুই নেই— অন্ধকার ছাড়া। আমরা এইবারে ঐ গলির ভেতরে ঢুকবো।'

— 'কি আশ্চর্য, কেন হে?'

— 'সঙ্গে এলেই দেখতে পাবে।'

জয়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে গলির মধ্যে ঢুকে মাণিক টর্চের আলো জ্বেলে দেখে, সে পথে আবর্জনার অভাব একটুও নেই। মরা পচা ইঁদুরের আশপাশ দিয়ে জ্যান্ত ইঁদুররা আনাগোনা করছে।

সত্য চৌধুরীর বাড়ির নিচের তলার দেয়াল ঘেঁষে খানিকটা অগ্রসর হয়ে জয়ন্ত হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'মাণিক, আজ আমরা সত্য চৌধুরীর বাড়ির ভেতরে বেড়াতে যাবো।'

— 'কি করে?'

— 'গায়ের জোরে। এই দেখো, এখানকার একটা জানলা খোলা আছে। তুমি জানো তো, এরকম লোহার রেলিং আমার কাছে মোমের মতো নরম!' বলতে বলতে সে দুই হাতে একটা রেলিং চেপে ধরে টানাটানি করতেই সেটা বিশ্রী ভাবে দুমড়ে খুলে বেরিয়ে এলো। তারপর আরেকটা রেলিঙেরও হলো সেই অবস্থা।

মাণিক এর আগেই জয়ন্তের আসুরিক শক্তির আরো অনেক প্রমাণ পেয়েছে, সুতরাং কিছুমাত্র অবাক হলো না। সে খালি বললো, 'চোরের মতো এ বাড়িতে ঢুকে তুমি কি করতে চাও?'

— 'দেখতে চাই, নতুন কোনো সূত্র মেলে কিনা। সত্য চৌধুরী তার দলবল নিয়ে কোথায় গেছে জানিনা, বাড়িতে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে মাত্র একজন বুড়ো দারোয়ান। লুকিয়ে খানা-তল্লাসীর এমন সুযোগ আর মিলবে না।' বলতে বলতে জয়ন্ত জানলা দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। মাণিকও করলো তার অনুসরণ।

টর্চের আলো ফেলে দেখা গেলো, সেটা হচ্ছে খুব সম্ভব দারোয়ানের রান্নাঘর। গোটা চারেক উনুন ও এখানে সেখানে খানকয়েক পেতলের বাসন ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের দরজা খোলাই ছিলো। ঘর থেকে

বেরিয়ে দু'জনে গিয়ে পড়লো দালানে। তারপরেই উঠোন। এবং তারই এক কোণে খাটিয়ার ওপরে লম্বা হয়ে পড়ে আছে দারোয়ানের ঘুমন্ত মূর্তি।

বাড়ির ভেতরে কোথাও আলো নেই, অন্য কোনো শব্দও নেই।

দু'জনে পা টিপে টিপে এগিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি খুঁজে পেলো। কাঠের বাহারি সিঁড়ি। তার আশেপাশের দেওয়ালে কতোগুলো ছোটো-বড়ো বাঁধানো ফটো টাঙানো। টর্চের সাহায্যে ফটোগুলো দেখতে দেখতে জয়ন্ত চুপি চুপি বললো, 'মাণিক, ভালো করে এই ছবিখানা দেখো।'

ব্যাঘ্র চর্মের আসনের ওপরে বসে আছে বিরাটবক্ষ, বিপুলবপু, এক সুদীর্ঘ পুরুষ— পরণে মাত্র একটি কপ্‌নি। মাথায় লম্বা চুল, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় মস্ত মস্ত রুদ্রাক্ষের মালা। ফটোতেও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, তার গায়ের রং মোষের মতো কালো। স্কন্ধের, বুকের ও পেটের দুই পাশের ডুমো ডুমো স্ফীত মাংসপেশীগুলো দেখলেও ধরা যায়, দেহের বল বিক্রমে সে সিংহের মতো। মুখের প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়া যুলে ফেঁপে গালপাট্টার মতো হয়ে দুই কানের কাছে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু কী কুৎসিত তার চোখ দুটো। অতোবড়ো মুখে অতো ছোটো অথচ অদ্ভুত চোখ আর দেখা যায় না, দেখলেই মনে পড়ে হিপোপটেমাসের চোখকে। সেই ক্ষুদে চোখের তীব্র দৃষ্টি যেন দুই ক্ষুরধার বিদ্যুৎ ছুরিকার মতো কেটে বসে হৃদপিণ্ডের মধ্যে। তার মুখে আর এক দ্রষ্টব্য হচ্ছে, বাঘের দাঁতের মতন নিষ্ঠুর ও হিংস্র একটা মাত্র দাঁত— ওষ্ঠাধর ভেদ করে যা প্রায় চিবুকের দিকে এগিয়ে এসেছে। এ রকম আশ্চর্য দাঁতও মানুষের মুখে দেখা যায় না।

মাণিক শিউরে উঠে বললো, 'জয়, এটা ফটো না হলে বলতাম, এ ছবি হচ্ছে চিত্রকরের আঁকা মনগড়া ছবি! মাথাতেও এ লোকটা বোধহয় তোমার মতো অস্বাভাবিক লম্বা।'

জয়ন্ত ছবির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'মনের ক্যামেরায় এ মূর্তি আমি তুলে রাখলাম – জীবনে আর ভুলবো না।'

— 'কিন্তু কে ঐ ভয়ানক লোকটা? যোগী সাধকের বেশে ছবি তুলিয়েছে বটে, কিন্তু এ ব্যক্তি কি করে সাধনা করে?'

—'মুদির মুখে যার বর্ণনা শুনেছি, এ বোধহয় সেই মহাপুরুষ— অর্থাৎ সত্যচরণ চৌধুরী!'

শুনেই মাণিক আগ্রহ ভরে ওপরে আরো ঝুঁকে পড়লো, কিন্তু জয়ন্ত হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

দোতলার দালানে উঠে তারা প্রথম যে ঘরখানা পেলো, তার দরজায় তালা বন্ধ। পাশের ঘরখানা খোলা বটে, কিন্তু সে ঘরে খান দুয়েক খাট ও খান দুয়েক চেয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। তার পাশের ঘরখানা হল-ঘরের মতো বড়ো, এবং সে ঘরে অনেক আসবাবপত্রও রয়েছে।

কোথাও মার্বেলের বড়ো গোল টেবিল, কোথাও সাধারণ লেখাপড়া করার টেবিল, কোথাও সোফা, কৌচ, ইজিচেয়ার, কোথাও বড়ো বড়ো আলমারি। এই সাজানো-গোছানো ঘরখানি দেখলেই বোঝা যায়, এখানে যে থাকে সে খুব গোছালো লোক।

একটা টেবিলের তলায় রয়েছে এক থাক খবরের কাগজ। জয়ন্ত প্রথমেই সেইখানে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখে বললো, 'এগুলো দেখছি পুরোনো 'ষ্টেট্স্ম্যান'— ফেলে না দিয়ে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখা হয়েছে।' হঠাৎ দুই চোখ তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সেইখানে বসে পড়ে সে একখানা করে কাগজ তুলে তারিখ দেখতে দেখতে যেন আপন মনেই আবার বললো, 'হুঁ, গেলো দেড় মাসের সব কাগজই এখানে রয়েছে, কেবল এপ্রিল মাসের ২৩, ২৪ আর ২৫ তারিখের কাগজ নেই! কিন্তু ঠিক ঐ তিন তিনখানা কাগজ আজ সকালেই আমি উপহার পেয়েছি কাটা মুণ্ডুর সঙ্গে।'

মাণিক চমকে উঠে বললো, 'জয়, জয়! তুমি কি বলছো!'

জয়ন্ত হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে রূপোর নস্যদানী বার করে একটিপ নস্য নিয়ে বললো, 'মাণিক, আমাদের এখানে আসা সার্থক হলো। সাধারণ পুলিশ-ডিটেকটিভের মস্ত কি দোষ, জানো? তারা কেবল বড়ো বড়ো প্রমাণ খুঁজতেই ব্যস্ত, ছোটো ছোটো প্রমাণ তাদের চোখেই পড়ে না।

সুন্দরবাবু এখানে এলে ঐ খবরের কাগজগুলোর দিকে ফিরেও তাকাতেন না, অথচ ওর মধ্যে আজ আবিষ্কার করা গেলো কতো-বড়ো দরকারি সূত্র! এই বাড়িতে যারা থাকে, আজ সকালে তারা এই ঘরে বসেই একটা কাটা-মুণ্ডুকে তিনখানা খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে, প্যাকিং বাক্সে পুরে আমাদের কাছে রাক্ষুসে ভেট পাঠিয়েছে। এই প্রমাণ হয়তো আদালতে গ্রাহ্য হবে না, কিন্তু এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, আমরা এখন নৃমুণ্ড-শিকারীদের বাড়িতেই অযাচিত অতিথিরূপে প্রবেশ করেছি! কি বলো মাণিক? আমার এ অনুমান কি তোমার মনে লাগছে?'

মাণিক অভিভূত কণ্ঠে বললো, 'জয়ন্ত! তোমার প্রতিভাকে আমি নমস্কার করি! মাত্র একদিনের চেষ্টায় তুমি আজ যতোগুলো আবিষ্কার করলে, তা শার্লক্ হোম্‌সেরও গর্বের বিষয়।'

জয়ন্ত বললো, 'দুর্গম অরণ্যে পথহারা ক্ষুধার্ত পথিক দেখতে পেলো দূরে একটা কুণ্ডলী পাকানো ধেঁায়ার রেখা আকাশে উড়ে যাচ্ছে। দেখেই তার খুব আনন্দ হলো, কারণ দূরে কোথাও হয়তো আগুন জ্বেলে রান্না হচ্ছে তারই প্রমাণ ঐ ধেঁায়ার রেখা! কিন্তু ক্ষুধার্ত পথিকের সে আনন্দ স্বল্প-জীবী হয়, যদি না সে পথ খুঁজে আগুনের কাছে যেতে পারে। সমস্ত প্রমাণেরই ঐরকম মূল্য। আমাদের হাতে অনেকগুলো প্রমাণ ছিলো— যেমন, রুমাল, রাম-দা, 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের' তিনটি কপি, কাটা-মুণ্ডু প্রভৃতি। কিন্তু এসব প্রমাণই ঐ ধেঁায়ার মতো ব্যর্থ হবে, যদি না এদের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করতে পারি। গোয়েন্দার কাজ কেবল প্রমাণ আবিষ্কার করা নয়, সেসব প্রমাণ হাতে-নাতে কাজে লাগাতে না পারলে তার কর্তব্য পালন করা হয় না। কিন্তু আমি—' বলতে বলতে সে হঠাৎ থেমে পড়লো।

জয়ন্তের কথা শুনতে শুনতে মাণিক তার টর্চের আলোটা বুলিয়ে ঘরের চারিদিক ভালো করে দেখে নিচ্ছিলো। এখন টর্চের আলোক রেখার মধ্যে এসে পড়েছে মস্ত বড়ো একটা কাঁচের জার তার ভেতরে

টল্ টল্ করছে শাদা জলের মতো কোনো পদার্থ। জয়ন্ত একলাফে সেইখানে গিয়ে পড়ে বললো, 'মাণিক, আলোটা ভালো করে ধরো তো!'

কাঁচের জারটা লম্বায় দেড় হাত ও চওড়ায় এক হাত। এবং খালি একটা জারই নয়, চারটে তাকে আরো চারটে একই রকম জার সাজানো রয়েছে। সব জারেরই মধ্যে রয়েছে শাদা জলের মতো কি!

একটা জারের কাঁচের ঢাকনা খুলে আঘ্রাণ নিয়ে জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললো, 'হুঁ। জারের ভেতরে রয়েছে স্পিরিট! আমরা যে কাটা-মুণ্ডুটা বখশিস্ পেয়েছি তাও যে স্পিরিটে ভেজানো ছিলো সে প্রমাণও পাওয়া গেছে। এই জারগুলোর যে কোনোটার মধ্যেই সেই কাটা মুণ্ডুটার ঠাঁই হতে পারে।'

আচম্বিতে একতলায় দড়াম করে একটা দরজা খোলার শব্দ শুনে তারা দু'জনেই দারুণ চমকে উঠলো। জয়ন্ত তীরের বেগে ঘর ছেড়ে দালানে বেরিয়ে পড়ে প্রায়ান্ধকার উঠোনের দিকে দৃষ্টিপাত করেই বলে উঠলো, 'মাণিক, দুম্‌দাম্ করে ও কী ছুটে যাচ্ছে? আমি ভূত মানি না, কিন্তু ওটা মানুষের মূর্তিও নয়।'

ততোক্ষণে মাণিকও দালানের প্রান্তে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সেও আতঙ্কগ্রস্থ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'জয়-জয়! অন্ধকারে সবই আবছায়ার মতো দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে ও-মূর্তি হচ্ছে মহা-ভয়ঙ্কর!'

— 'মাণিক! মূর্তিটা যে সিঁড়ির দিকে গেলো! ঐ শোনো, কাঠের সিঁড়ির ওপরে যেন মত্তহস্তীর পদ শব্দ! মূর্তি আমাদেরই আক্রমণ করতে আসছে!'

— 'উঠোনের ওপর দিয়ে অনেকগুলো মানুষও ছুটে আসছে! জয়ন্ত, আমরা ফাঁদে পড়েছি।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শত্রুপুরে

জয়ন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'হ্যাঁ মাণিক, ফাঁদে পড়েছি বটে! কিন্তু এখনো পালাবার উপায় আছে।'— বলেই সে সিঁড়ির দরজার দিকে বেগে ছুটে গেলো এবং পর মুহূর্তেই দরজার পাল্লা ছু'খানা টেনে বন্ধ করে শিকল লাগিয়ে দিলো।

— 'মাণিক, টর্চটা জ্বালো।'

টর্চের আলোয় দেখা গেলো, দালানের কোণেই তেতলায় ওঠবার সিঁড়ি।

— 'মাণিক, তেতলায় চলো।'

ছু'জনে দ্রুতপদে তেতলার বারান্দায় গিয়ে উঠলো। সেখানেও সিঁড়ির মুখে আর একটা দরজা ছিলো এবং সে দরজাও বন্ধ করে দিলো।

বারান্দায় পাশাপাশি ছু'খানা ঘর। একটা ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগানো, আর একটা ঘরের দরজা খোলা।

জয়ন্ত বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে ছুটে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললো, 'কি মুশকিল! এখান থেকে ছাদে ওঠবারও সিঁড়ি নেই, নামবার পথও বন্ধ।'

মাণিক হতাশ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললো, 'না জয়ন্ত। ঐ শোনো, আমাদের বন্ধুরা নামবার পথ খুলে দেবার চেষ্টা করছে।'

দোতলার সিঁড়ির দরজায় বিষম জোরে ঘন ঘন আঘাতের শব্দ শোনা গেলো।

জয়ন্ত চিন্তিত ভাবে বললো, 'সিঁড়ির দরজা ভেঙে যারা ওপরে উঠতে চায়, তাদের সঙ্গে আছে সেই মূর্তিটাও।'

মাণিক বললো, 'একটু আগেই ছবিতে আমরা বোধ হয় সত্য চৌধুরীকে দেখেছি। মনে হলো, সেও তোমার মতন হয়তো প্রায় সাত ফুট লম্বা। তার সেই মোষের মতন কালো বীভৎস মূর্তিকেই আমরা উঠোন দিয়ে ছুটতে দেখেছি। অন্ধকারে তাকে আরো ভয়ানক দেখাচ্ছিলো।'

জয়ন্ত বললো, 'না মাণিক, না। যদিও স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাইনি, তবু জোর করে বলতে পারি, সে মূর্তির মধ্যে একটুও মনুষ্যত্ব ছিলো না। মানুষ তেমন ভাবে ছোটে না।' সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনেছি, মানুষের পায়ের শব্দও অতো ভারি হয় না।'

— 'কি আশ্চর্য, তবে ওটা কী?'

— 'তোমার প্রশ্নের জবার এখুনি পাবে। শুনছো না, দোতলার সিঁড়ির দরজা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো? ওরা ওপরে আসছে। কিন্তু আমরা এখন কি করবো?'

কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতো দু'জনেই তখন খোলা ঘরটার ভেতরে ঢুকে পড়লো। জয়ন্ত ভেতর থেকে সে ঘরের দরজাও বন্ধ করে দিলো।

মাণিক টর্চ জ্বেলে দেখলো, সে ঘরে চারটে জানলা আছে— দুটো বারান্দার দিকে এবং দুটো রাস্তার দিকে।

রাস্তার দিকে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত দেখলো, নিঝুম রাতের শূন্যপথ যেন খাঁ খাঁ করছে। কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া নেই।

জয়ন্ত চিৎকার করে ডাকলো, 'পুলিশ, পুলিশ, পুলিশ— !'

কিন্তু সে অঞ্চলে পুলিশের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হলো না।

মাণিক বললো, 'আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো ভায়া, বিদ্যুতের চকমকি জ্বালিয়ে ঘন মেঘ ছুটে আসছে।'

— 'তার মানে এখনি ঝড় উঠবে, বৃষ্টি আসবে।'

— 'পথে এর মধ্যেই পুলিশের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। একটু পরে হাজার চেঁচালেও কেউ আমাদের সাড়া পাবে না।'

— 'তাহলে এসো, সময় থাকতে ,আমরা ছ'জনে মিলে চেঁচাই।'

জয়ন্ত ও মাণিক একসঙ্গে চিৎকার শুরু করলো, 'পুলিশ, পুলিশ! খুন!, খুন!!'

আকাশকে তখন দেখাচ্ছে অদ্ভুত। আধখানা আকাশ অজস্র তারকায় ভরা— যেন চুম্‌কি বসানো কালো সাড়ি। বাকি আধখানা আকাশ অদৃশ্য হয়েছে অন্ধকারের চেয়ে কালো মেঘদলের জঠরে, কিন্তু সেখানেও থেকে থেকে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে উঠেছে বিদ্যুতের চক্‌মকি। যেন সেগুলো হচ্ছে অন্ধ মেঘের অগ্নিদন্ত। ঐ সব দাঁত দিয়েই সে শাদা আকাশকে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌ছে।

খানিক তফাতে গঙ্গাকে দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। চঞ্চল বিজলী মুহূর্তে মুহূর্তে নিচে নেমে জলের দোলায় দুলে রূপে গঙ্গা আলো করেই চকিতে আবার পালিয়ে যাচ্ছে সকৌতুকে। বিজলী সকলেরই কাছে যায়, কিন্তু কারুকে ধরা দিতে ভালোবাসে না। কিন্তু এ-সব দেখবার বা ভাববার অবসর তখন জয়ন্ত ও মাণিকের ছিলো না। তাদের মাথার ওপরে তখন নৃশংস আনন্দে জেগে উঠেছে নৃমুণ্ড-শিকারীর ক্ষমাহীন খড়্গ— আসন্ন ঝড়কে বুকে করে যেন সেই মহাবিপদেরই পূর্বাভাস দিতে ধেয়ে এসেছে আকাশের কাজল কালো পুঞ্জমেঘ!

তাদের সমস্ত চিৎকার ব্যর্থ হলো। কোনো পাহারাওলার সাড়া মিললো না। নৃমুণ্ড-শিকারীদের ভয়ে গঙ্গার কাছে রাতে কোনো পাহারাওলাই থাকে না। হয়তো কোনো কোনো গৃহস্থ ঘুম থেকে সচমকে জেগে উঠে তাদের চিৎকার শুনতে পেয়েছিলো, কিন্তু তারাও জানে নৃমুণ্ড-শিকারীদের কাহিনী! পরের মাথা বাঁচাবার জন্যে নিজের মাথা দেবার আগ্রহ কারোর হলো না।

মাণিক হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, 'নাঃ, এ কলকাতা শহরে সবাই কাপুরুষ, কেউ সাড়া দেবে না!'

জয়ন্ত বললো, 'তেতলার সিঁড়ির দরজায় কি রকম ধাক্কা পড়ছে, শুনছো তো? ও দরজাও ভেঙে পড়লো বলে।'

মাণিক বললো, 'ওদের দলে কতো লোক আছে, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।'

— 'বোঝবার চেষ্টা করেও লাভ নেই। হয়তো পাঁচ-সাত জন, হয়তো দশ-পনেরো জন। ওরা বিশ-পঁচিশ জন হলেও আমি মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু আমি খালি ভাবছি একজনের কথা। কে সে তা জানি না— কিন্তু আমার মন বলছে, সে ভয়ঙ্কর! তাকে দেখতে কেমন তাও জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে চতুষ্পদ না হলেও সে মানুষ নয়। কেন সে মানুষের সঙ্গে থাকে, কেন সে আমাদের আক্রমণ করতে চায়, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। মাণিক, আমি হতভম্ব হয়ে গেছি।'

হঠাৎ বাড়ি কাঁপিয়ে হুড়মুড়-হুড়মুড় করে একটা শব্দ হলো।

মাণিক বললো, 'ঐ যাঃ! তেতলার সিঁড়ির দরজাও ভেঙে পড়লো!

জয়ন্ত, কঠিনভাবে হাস্য করে বললো, 'এবারে এই ঘরের দরজার পালা। 'কিন্তু, তারপর?'

বাইরের বারান্দায় ধুপ্-ধুপ্ করে অনেকগুলো পায়ের শব্দ হলো— তার মধ্যে একজনের পায়ের শব্দ বিষম ভারি। প্রত্যেক পদক্ষেপে তেতলার মেঝে থর-থর করে কাঁপছে!

তারপরেই দরজার ওপরে পড়লো দড়াম করে এক জোর ধাক্কা। প্রথম ধাক্কাতেই দরজাটা ভেঙে পড়ে আর কি!

জয়ন্ত একলাফে বারান্দার একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর ডান হাতে রিভলভার বার করে হঠাৎ জানলার একটা পাল্লা খুলে উপরি উপরি চারবার গুলি বৃষ্টি করেই পেছনে সরে এলো।

অন্ধকারে কারুর দিকেই সে লক্ষ্য স্থির করতে পারে নি বটে, কিন্তু আচম্বিতে আর্তনাদ শুনেই বুঝে নিলো যে, তার রিভলভারের একটা গুলি অন্তত যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

তারপরেই আবার ধুপ্-ধুপ্ করে অনেকগুলো অতি-ব্যস্ত পায়ের শব্দ শোনা গেলো। তারা বুঝলো, শত্রুরা প্রাণের ভয়ে বারান্দার ওপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত তাদের শুনিয়ে খুব চেঁচিয়ে বললো, 'মাণিক, তুমিও রিভলভার তৈরি রাখো। বারান্দায় যে আসবে তাকেই আমরা কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলবো। সহজে আমরা প্রাণ দেবো না।'

আচম্বিতি কড়্-কড়্-কড়্-কড়্ রবে বজ্র ভীষণ গর্জন করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হলো ঝটিকার ভৈরব হুহুংকার। গঙ্গার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে তরঙ্গে পাগলামির মাতন জাগিয়ে, টলোমলো গাছে গাছে ব্যাকুল ক্রন্দন ফুটিয়ে, বাড়ির জানলায় জানলায় প্রচণ্ড করতাল বাজিয়ে দুরন্ত ঝড় প্রবল ধুলোভরা নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ও বজ্রভরা বিদ্যুৎ ছুঁড়তে ছুঁড়তে শহরের ওপর ভেঙে পড়লো বিপুল বিক্রমে।

জয়ন্ত বললো, 'বাইরে থেকে সাহায্য পাবার যেটুকু আশা ছিলো, তাও গেলো। এ গোলমালে সিংহ গর্জন করলেও কেউ শুনতে পাবে না।'

মাণিক কিছু না বলে টর্চ জ্বেলে ঘরের চারদিকে আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই চাপা গলায় বলে উঠলো, 'জয়, জয়! টেলিফোন।'

জয়ন্তের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। হ্যাঁ তাই তো, ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর একটা টেলিফোন রয়েছে যে!

সে আগে আরেকবার জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মারলো, কিন্তু বিদ্যুতালোকেও সেখানে শত্রুদের কারুকে দেখা গেলোনা। তবে তারা যে আনাচে কানাচে কোথাও লুকিয়ে আছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। পাছে তারা ভরসা করে আবার কাছে আসে, তাই তাদের ভয় দেখাবার জন্যে জয়ন্ত আর একবার রিভলভার ছুঁড়লো। তারপর ছুটে টেলিফোনের কাছে গিয়েই রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললো, 'বড়োবাজার-টু, ও, থ্রি, ওয়ান। ইয়েস, প্লীজ।'

—'হ্যালো, থানা, সুন্দরবাবু কোথায়? ঘুমোচ্ছেন? এখনি গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দিন। আমার নাম? জয়ন্ত। হ্যাঁ, জরুরি দরকার। ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে এসে আমরা বন্দী হয়েছি। হ্যাঁ, সেই কাটা-

মুণ্ডুর মামলায়। আমরা তেতলার একটা ঘরের ভেতরে আছি। ওরা দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছে। পুলিশের আসতে দেরি হলেই আমরা মারা পড়বো। আসতে কতো দেরি হবে? আন্দাজ আধঘন্টা হয়তো আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো, কারণ আমাদের কাছে দু'-দুটো রিভালভার আছে। কিন্তু কিসে কি হয় বলা যায় না, ওরা দলে বেশ ভারি। আরো তাড়াতাড়ি আসবার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনের সত্য চৌধুরীর বাড়ি। একেবারে তেতলায়—'

জয়ন্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ঘরের ভেতরে গ্রুম করে বেজায় একটা শব্দ হলো। তার পরেই বিষম উগ্র একটা দুর্গন্ধ।

জয়ন্তের হাত থেকে রিসিভারটা সশব্দে পড়ে গেলো মেঝেয়, রাস্তার ধারের জানলার কাছে সরে গিয়ে রেলিংয়ের ফাঁকে মুখ রেখে বদ্ধস্বরে সে বললো, 'মাণিক, শীগ্‌গির এদিকের জানলার ধারে এসো। বারান্দার জানলা দিয়ে ওরা বিষাক্ত গ্যাস বোমা ছুঁড়েছে।'

কিন্তু গ্যাসের ঝাঁঝে মাণিকের মাথা তখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে, কারণ বোমাটা ফেটেছে তারই কাছে। টলতে টলতে কয়েক পা এগিয়ে এসেই সে অবশ হয়ে মাটিতে বসে পড়লো।

জয়ন্তও জানলার ধারে গিয়ে রক্ষা পেলোনা, বিষম যন্ত্রণায় তাকেও মেঝের ওপরে প্রথমে বসে, তারপর শুয়ে পড়তে হলো। সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় তারা শুনলো, ঘরের বন্ধ দরজা প্রচণ্ড ধাক্কায় ধড়াস করে খুলে গেলো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূত, রাক্ষস না দানব ?

এমন ঝড় বাদলের রাতে সুন্দরবাবু তাঁর বিছানায় কুঁকড়ে-সুঁকড়ে ঘুমোচ্ছিলেন বেশ আরামেই ; হঠাৎ জরুরি ডাক শুনেই তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে নিচে নেমে এলেন মহা খাপ্পা হয়ে।

থানার সাব-ইনস্পেক্টর মনোহরকে ইউনিফর্ম পরে প্রস্তুত দেখে দেখে তিনি আরো গরম হয়ে গেলেন। মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'হুম্ ! এই একটা রাত আমাকে আর না ডাকলে কি চলতো না ? ভগবান কি তোমার মগজে একফোঁটা বুদ্ধি দান করেন নি ? বলি, আর কতো কাল আমার বুদ্ধি ভাঙিয়ে খাবে বাপু ? এতোরাতে এমন দুর্যোগে কি আবার জরুরি মামলা এলো ?'

—'আজ্ঞে, জয়ন্তবাবু ফোন করেছিলেন, আমরা এখনি সেপাই নিয়ে সেখানে না গেলে তাঁরা নাকি মারা পড়বেন।'

শুনেই বিপুল বিস্ময়ের ধাক্কায় সুন্দরবাবুর সমস্ত রাগ আর বিরক্তি কোথায় ভেসে গেলো, সচমকে বললেন, 'য়্যাঁ, বলো কি ? হুম্, তাও কি হয় ? ···আর হবে নাই বা কেন ? ছোকরারা যা গোঁয়ার, যেচে বিপদকে ডেকে নিয়ে আসে।'

— 'স্তর, আমরা তাহলে কি করবো ? শুনছি আসামীরা দলে বেশ ভারি।'

— 'এখন আর ভাববার সময় নেই, সেপাইদের শীগ্‌গির তৈরি হতে বলো, হুম্, আমি চোখের নিমেষে পোষাক পরে আসছি।'— সুন্দরবাবু

ঘর থেকে যেই বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই টেলি-ফোন যন্ত্রে আবার ঘন ঘন সঙ্গীতের সৃষ্টি হলো।

— 'আঃ, কে আবার রিং করে? ......হ্যালো! ...হ্যাঁ, আমি সুন্দরবাবু। আপনি কে? হুম্, কি বললেন? জয়ন্ত? কি আশ্চর্য! তুমি এখন কোথায়? নিজের বাড়িতে? হুম্, আসামীরা তোমাদের রিভলভারের ভয়ে পালিয়ে গেছে? ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে আমাদের আর যেতে হবে না? হুম্, তোমরা কাল সকালে এসে সব কথা খুলে বলবে? বহুৎ আচ্ছা, হুম্-হুম্! কি বলছো? আমি এতো বেশি 'হুম্' বলছি কেন? তা কি তুমি জানো না? হুম্! ...আচ্ছা, আজ আর আমরা যাবো না। আচ্ছা— ' সুন্দরবাবু রিসিভারটা রেখে দিলেন।

সাব-ইনস্পেক্টর মনোহর বললো, 'তাহলে স্যর আমাদের আর যেতে হবে না?'

— 'হুম্! যেতে হবে না কি রকম? আলবৎ যেতে হবে...এক্ষুণি যেতে হবে...আরো তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

— 'আজ্ঞে, ঐ যে শুনলাম, জয়ন্তবাবুরা বাড়িতে ফিরেছেন, আর আসামীরা পালিয়েছে— '

— 'ও সব ধাপ্পা! আমাকে এতো হুম্ বলতে শুনে জয়ন্ত কখনো আশ্চর্য হয়? যে আমাকে চেনে, সে-ই জানে, কেন আমি হুম্ বলি? ...ওহে মনোহর, সেপাইদের সাজতে বলো, আমরা এখনি পনেরো নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে যাবো। অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকোনা, বুঝছো না। ফোনে এতোক্ষণ জয়ন্ত কথা কইছিলো না! পাছে আমরা এখনি দল বেঁধে ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আসামীদেরই কেউ জয়ন্তের নামে আমাদের সেখানে যেতে মানা করেছে! হুম্, পুলিশের কাজে আমার কালো চুল শাদা হয়ে গেলো আর আমাকেই ঠকাবার চেষ্টা? আমি কি গাড়োল? আমি কি মনোহর?'

মনোহর দুঃখিত স্বরে বললো, 'আজ্ঞে স্যর, আপনার মতে কি গাড়োল বলতে আমাকেই বোঝায়?'

— 'হুম্, তা নয়তো কি ? তুমি হলে এখনি ঠকে যেতে।'

— 'আজ্ঞে— '

— 'আবার 'আজ্ঞে' বলে ! যাও, সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে তর্ক করো না, নিজের কাজে যাও। আর সময় নেই— আমি চট্ করে পোষাক পরে আসি।'

কলকাতার নির্জন পথে পথে পাগলা ঝোড়ো হাওয়া তখন গোঁ-গোঁ করে ছুটে বেড়াচ্ছে, হুড়্-হুড়্-হুড়্-হুড়্ করে জল ঢালতে ঢালতে। কালো মেঘ তখনো ঘন ঘন আগুন-দাঁত খিঁচিয়ে গঙ্গার বুক যেন চিরে ফালা ফালা করে দিয়েই হুঙ্কার ছাড়ছে আর হুঙ্কার ছাড়ছে।

১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেন। আকাশের অন্ধকারের সঙ্গে মিলে গেছে গলির অন্ধকার, কারণ পথের গ্যাসের আলোগুলো কারা নিভিয়ে দিয়েছে।

সুন্দরবাবু ত্রস্ত স্বরে বললেন, 'হুম্, গতিক সুবিধের নয়, মনোহর।'

— 'আজ্ঞে, কেন স্যর ?'

— 'গ্যাসের আলো নেভানো। আজ সন্ধ্যায় ঐ কায়দাতেই ওরা আমায় ফাঁদে ফেলেছিলো। অন্ধকারের ভেতর শত্রুরা লুকিয়ে আছে।'

— 'বড়োই মুশকিল, স্যর ! তাড়াতাড়িতে টর্চ আনা হয়নি।'

— 'রিভলভার বার করো ! সেপাইদের লাঠি বাগিয়ে ধরতে বলো। ঐ দেখো, ১৫ নম্বর বাড়ির তেতলায় একটা আলো জ্বলছে। কাদের সব ছায়াও দেখা যাচ্ছে। ওরা ভেবেছে, আজ রাত্রে আমরা আসবো না, জয়ন্ত আর মাণিককে খুন করে ধীরে-সুস্থে ওরা সবাই সরে পড়তে পারবে।'

— 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর। জয়ন্তবাবু ফোন করবার পরেই আসামীরা যখন ফোন করেছে তখন বুঝতে হবে যে, তাঁরা শত্রুদের খপ্পরে

পড়েছেন। আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়।...ঐ দেখুন স্যর, বাড়ির নিচে, অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে, কারা যেন নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে।'

হঠাৎ তেতলার আলোও নিভে গেলো— মনে হলো যেন বিশ্বব্যাপী অন্ধকার হাঁ করে আলোটাকে গিলে ফেললো।

সুন্দরবাবু চিৎকার করে বললেন, 'ওরা টের পেয়েছে, আমরা এসেছি। সবাই দৌড়ে বাড়ির ওপরে গিয়ে পড়ো। সদর দরজা যদি বন্ধ থাকে, লাথি মেরে ভেঙে ফেলো। যাকে পাবে তাকেই গ্রেপ্তার করো! যে বাধা দেবে তাকেই আমরা গুলি করে মেরে ফেলবো, হুম্।'

তখন ঝড় বিদায় নিয়েছে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্ করে। আঁধারের মধ্যে পথের ওপর বেজে উঠলো পাহারাওয়ালাদের ভারি জুতোর শব্দ। সুন্দরবাবু শত্রুদের ভয় দেখাবার জন্যে আকাশের দিকে রিভলভার তুলে একবার আওয়াজ করলেন। তারপরেই তাঁর মনে হলো, শত্রুরা দস্তুরমতো ভয় পেয়েছে। কারণ বাড়ির নিচে যারা নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছিলো, তাদের আর দেখা বা সাড়া পাওয়া গেলোনা।

সদর দরজা খোলা।

সুন্দরবাবু বললেন, 'মনোহর, দু'জন সেপাইকে এখানে পাহারায় রেখে বাড়ির ভেতরে দল বেঁধে ঢুকে পড়ো।' বাড়ির ভেতরে ঢুকে সকলেরই চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেলো! অন্ধকার সেখানে পুঞ্জীভূত। সে অন্ধকার এমনই নিরেট, মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে মানুষের দেহ যেন চুরমার হয়ে যাবে। সেখানকার স্তব্ধতাও বিস্ময়কর।

মনোহর বললো, 'আজ্ঞে স্যর, এখানে বোধ হয় জন-প্রাণী নেই। আসামীরা লম্বা দিয়েছে।'

— 'লম্বা দিলেই হলো? এইমাত্র তেতলায় আলো জ্বলতে দেখেছি। এরি মধ্যে যাবে কোথায়? চলো তেতলায়। জয়ন্ত তো ফোনে আমাদের তেতলায়ই যেতে বলেছে?'

— 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর! কিন্তু তেতলায় যাবো কোন্‌দিক দিয়ে? অন্ধকারে তো কোনো দিকই দেখা যাচ্ছে না।'

— 'হুম্, মনোহর! অকাট্য প্রমাণ পেলাম, তুমি একটি আস্ত গাড়োল। কোন্ আক্কেলে আলোর ব্যবস্থা করলে না, বলো দেখি? বলি, সিগারেট-টিগারেট খাও তো, পকেটে দেশলাই আছে তো?'

— 'আজ্ঞে না, স্যর।'

— 'কথায় কথায় অতো আজ্ঞে-আজ্ঞে করো না, ভালো লাগে না। এ কি বিদ্‌ঘুটে ঘুট্‌ঘুটি অন্ধকার রে বাবা! সেই সঙ্গে মস্ত এক গাড়োল আমার ঘাড়ে চেপেছে— আমি এখন কাকে সামলাই?'

— 'আজ্ঞে স্যর, অতো ব্যস্ত হবেন না। একটু ভেবে দেখা যাক। এই তো সদর দরজা। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটা একটা লম্বা পথ বলে মনে হচ্ছে। পথের শেষে একটি উঠোন থাকাই সম্ভব। উঠোনের কোনো একদিকে তেতলার সিঁড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কি বলেন স্যর?'

— 'আমি কিছুই বলি না, আমি খালি এগিয়ে যেতে চাই। যেদিকে হোক এগিয়ে চলো। এই সেপাইরা, এগিয়ে চলো সব।'

পাহারাওয়ালারা আবার জুতো বাজিয়ে এগিয়ে চললো। তিন-চার সেকেণ্ড পরেই সুন্দরবাবু বললেন, 'এই সেপাইরা, দাঁড়াও।'

তারা দাঁড়িয়ে পড়লো।

— 'আজ্ঞে, ওদের দাঁড়াতে বললেন কেন, স্যর?'

— 'হুম্, কান খাড়া করে শোনো তো মনোহর, ওপর থেকে কি একটা হুম্ হুম্ করে নিচের দিকে নেমে আসছে না?'

মনোহর কান খাড়া করে শুনলো কিনা জানি না, কিন্তু চমকে উঠে বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আসছে স্যর।'

— 'কি আসছে?'

— 'আজ্ঞে, বুঝতে পারছি না স্যর! হাতি যদি সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারতো, তাহলে ঐ ধরনেরই শব্দ হতো বটে। কিন্তু সেটা অসম্ভব। হাতি আবার কবে সিঁড়ি দিয়ে নামে স্যর?'

— 'হুম্, হাতি কখনো সিঁড়ি দিয়ে নামে না, তবু অমন শব্দ

হয় কেন? শব্দটাকে যে ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে। শব্দটা যে একেবারে নিচে নেমে এসেছে! শব্দটা যে নিচে নেমে আমাদের দিকেই আসছে!'

তারপরেই বাধলো সে এক বর্ণনাতীত কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। একটা অজানা ক্রুদ্ধ গর্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাহারাওয়ালাদের আর্তনাদ। ঝড়ের ফুৎকারে কলাগাছ পড়ার মতো ধপাধপ্ দেহ পড়ার শব্দ! কে এক অতিকায় দানব যেন পাহারাওয়ালাদের দেহগুলো শিশুর মতো তুলে চারিদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

সুন্দরবাবু অন্ধকারে রিভলভারও ছুঁড়তে পারলেন না, পাছে সেপাইদের কারোর গায়ে গুলি লাগে। হতভম্ব হয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় ডাকলেন, 'অ মনোহর!'

রাস্তা থেকে আওয়াজ এলো, 'আজ্ঞে স্যর। আমি পালিয়ে এসেছি স্যর! আপনিও পালিয়ে আসুন স্যর! ওরা আমাদের পেছনে রাক্ষস লেলিয়ে দিয়েছে স্যর।'

ভূত হোক, রাক্ষস হোক, যেই-ই হোক— সেই ভয়াবহ বিপদ যে তাঁর সামনে এসে পড়েছে, সুন্দরবাবু স্পষ্টই তা বুঝতে পারলেন। তিনি আড়ষ্ট ভাবে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে একেবারে যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

আচম্বিতে সদর দরজার ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকালো। এক পলকেই সুন্দরবাবু দেখে নিলেন, সদর দরজার আলো-ভরা ফাঁকের পটে ফুটে উঠেছে অতি ভয়ানক এক দানব মূর্তি। তিনি তার অন্ধকার মাথা মুখ-চোখ-নাক কিছুই দেখতে পেলেন না, তাঁর নজরে পড়লো কেবল মূর্তির কাঁধ থেকে দু'খানা মোটা-মোটা লম্বাবাহু বেরিয়ে একেবারে মাটির ওপরে এসে পড়েছে।

এর পরেও আর কোনো ভদ্রলোকের জ্ঞান থাকে? তাই সুন্দরবাবুরও রইলো না। মাত্র একটি 'হুম্' শব্দ উচ্চারণ করে তিনি দস্তুরমতো অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুন্দরবাবুর মুদ্রাদোষ নেই

সুন্দরবাবুর যখন জ্ঞান হলো তখন তিনি চোখ মেলে দেখলেন, খালি ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। অনুভব করলেন, তাঁর পিঠের তলায় রয়েছে ঠাণ্ডা ভিজে মাটি এবং মুখে-বুকে ঝরছে ঝর ঝর করে বৃষ্টির জল।

একে একে সব কথা মনে হলো। সেই ভয়াবহ বাড়ির ভেতরে ঢুকে মূর্তিমান এক দুঃস্বপ্নকে দেখে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি খোলা আকাশের তলায় মাটিতে শুয়ে ভিজছেন। তিনি যে বেঁচে আছেন এবং নৃমুণ্ড-শিকারীরা যে রাম-দা তুলে তাঁকে বিনাবাক্য-ব্যয়ে বলি দেয় নি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে তাঁকে এখানে আনলো এবং এ-জায়গাটা কোন্ জায়গা ?

হঠাৎ তাঁর মাথার ওপরে কে একখানা কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাত রাখলো।

সভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে সুন্দরবাবু শুয়ে শুয়েই হড়াৎ করে খানিকটা সরে গেলেন এবং তার পরেই চট্‌পট্ উঠে অদ্ভুত বেগে মারলেন এক লম্বা দৌড়। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে অনেকগুলো পায়ের শব্দ! শত্রুরা ধরতে আসছে! হাতে তাদের ধারালো খাঁড়া! একথা মনে হতেই সুন্দরবাবুর গতি অসম্ভব দ্রুত হয়ে উঠলো। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। জয়ন্ত ও মাণিক সবিস্ময়ে একাধিকবার লক্ষ্য করেছে, বিপদ এড়িয়ে পালাবার সময়ে সুন্দরবাবু তাঁর প্রকাণ্ড দেহের ও প্রচণ্ড ভুঁড়ির বিপুল ভার একটুও অনুভব করেন না এবং ইচ্ছা করলে তখন তিনি যেন পাঞ্জাব মেলের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারেন।

কিন্তু ছিদ্রহীন অন্ধকারে এমন দ্রুত গতির বিপদ অনেক। সুন্দরবাবু হয়তো অনুসরণকারীদের নাগালের বাইরে গেলেন, কিন্তু তারপরেই বুঝলেন, একটা বিষম ঢালু জায়গা দিয়ে তিনি হুড় মুড় করে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন! কোথায় যাচ্ছেন? সেই অবস্থাতেই তিনি শুনতে পেলেন, পেছন থেকে চিৎকার করে কে বলছে, 'আজ্ঞে স্যর! এতো বেশি ছুটবেন না স্যর! সামনেই খাল।'

আর খাল! সুন্দরবাবু কেবল ঝপাৎ করে খালেই প্রবেশ করলেন না, গতির বেগ সামলাতে না পেরে এগিয়েও গেলেন অগাধ জলে।

ডাঙায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে মনোহর ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে লাগলো, 'এই চন্দন সিং! এই পাঁড়ে, দোবে, চৌবে, মিশির। আমাদের স্যর জলে ঝাঁপ খেয়েছেন, শীগ্‌গির তাঁকে টেনে তোলো!'

অথৈ জলে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সুন্দরবাবু আকুল স্বরে ডাকলেন, 'ও মনোহর! আমি যে দু'-তিন মিনিটের বেশি জলে ভাসতে পারি না। শীগ্‌গির এসে আমায় ধরো, হুম্!'

— 'আজ্ঞে স্যর! আমি যে একটুও সাঁতার জানিনা, স্যর! এই চন্দন সিং! এই পাঁড়ে, দোবে, চৌবে, মিশির। ওরে বাবা, কি হবে গো! হায়, হায়, হায়, হায়! অ্যাজ্ঞে স্যর, আপনি কি এখনো ওপরে ভেসে আছেন? না, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন স্যর?'

সুন্দরবাবু জবাব দিতে পারলেন না, খালি বললেন, 'হুম্'! তাঁর পা দুটো এরি মধ্যে যেন দু'মণ ভারি হয়ে তাঁকে পাতালে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু চার-পাঁচ জন সেপাই সাঁতরে গিয়ে পাতাল প্রবেশের দায় থেকে সে-যাত্রা তাঁকে উদ্ধার করলো।

ডাঙায় উঠে সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ ধরে হুম্-হুম্ শব্দে হাঁপ ছাড়তে লাগলেন। হাঁপ ছাড়ার শব্দ যখন ক্ষীণ হয়ে এলো, মনোহর ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলো, 'আজ্ঞে এখন কি একটু সামলেছেন স্যর?'

— 'হুম্।'

— 'বড্ড বেশি জল খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে কি স্যর ?'

— 'উঁহুঁ, হুম্‌ ।'

— 'অমন করে পালালেন কেন স্যর ?'

— 'আমার মুখে কে হাত রেখেছিলো যেন !'

— 'সে তো আমি স্যর ।'

— 'তুমি ?'

— 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর ! আমি মুখে হাত বুলিয়ে দেখছিলাম, আপনার জ্ঞান হয়েছে কিনা ।'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'মনোহর, তুমি আস্ত গাড়োল ! হাত দিয়ে কখনো 'দেখা' যায় ? ভগবান তবে চোখ সৃষ্টি করছেন কেন ?'

'আজ্ঞে স্যর, ভগবান যে অন্ধকার সৃষ্টি করে চোখকে অন্ধও করে দেন। দেখুন না, অন্ধকারে এখনো আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু হাত-পা-মাথা দিয়ে বেশ দেখতে পাচ্ছি, ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে !'

— 'মনোহর, সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে তর্ক করো না। তুমি কেবল গাড়োলই নও, তুমি কাপুরুষ। আমাকে ভূত না রাক্ষসের মুখে ঠেলে ফেলে তুমি অনায়াসেই পিঠটান দিয়েছিলে !'

— 'আজ্ঞে, দিয়েছিলাম স্যর ! কিন্তু আপনি ভির্মি যাবার পর আবার ফিরে গিয়েছিলাম। সবাই মিলে আপনাকে ধরাধরি করে আমরাই তো বাইরে এনেছিলাম !'

— 'কিন্তু সেই রাক্ষসটা এখন কোথায় ?'

— 'বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে পলকের জন্যে তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। মনে হলো, সে তখন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো।'

— 'তাকে দেখতে কী রকম ?'

— 'একটা কালো হাতির মতো।'

— 'হুম্‌, আবার আস্ত গাড়োলের মতো কথা বললো। হাতি কখনো বাড়ির ভেতরে থাকে ? আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মানুষের মতো তার দুটো হাত ও দুটো পা আছে—'

— 'আজ্ঞে, তার আছে বড়ো বড়ো দাঁত— যাকে বলে বিকট দন্ত।'

— 'তার গা দিয়ে বোঁটকা গন্ধ বেরোচ্ছিলো—'

— 'আর তার চোখ দিয়ে বেরোচ্ছিলো আগুন।'

— 'হুম্, তুমি আর কি কি দেখেছো, মনোহর ?'

— 'আজ্ঞে, আর কিছুই দেখিনি স্যর ! তারপরেই বিদ্যুৎ নিভে গেলো। তারপরেই মাটির ওপরে ধুপ্ ধুপ্ করে পায়ের শব্দ হলো। শব্দটা চলে গেলো খালের দিকে।'

— 'তারপর ?'

— 'তারপর আর একটা নতুন শব্দ।'

— 'নতুন শব্দ মানে ?'

— 'আজ্ঞে স্যর, জলে ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় ফেলার মতো শব্দ। মনে হলো, কারা যেন দাঁড় বেয়ে নৌকো চালাচ্ছে।'

সুন্দরবাবু নীরবে ভাবতে লাগলেন। নৃমুণ্ড-শিকারীদের ধরবার জন্য বাগবাজার খালের সাঁকোর ওপরে তিনিও এক কিম্ভুতকিমাকারকে দেখে-ছিলেন আবছায়ার মতো। এবং সেদিন তিনিও শুনেছিলেন, খালের জলে ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় ফেলে নৌকো চালানোর শব্দ। এ সব অদ্ভুত রহস্যের অর্থ কি ? কলকাতার খালে-নদীতে আজকাল কি কোনো অমানুষিক রাক্ষস-মাঝি নৌকো নিয়ে আনাগোনা করে ? তারই রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাবার জন্যে শহরে মানুষের পর মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে ? কিন্তু এ রাক্ষস খালি মুণ্ডু কেটে নিয়ে যায় কেন ? সে কি খালি মুণ্ডু খেতেই ভালোবাসে ? কিন্তু তার সঙ্গে যে মানুষের যোগ আছে, এরও তো প্রমাণ রয়েছে ! ভূত রাক্ষস-দানবের সঙ্গে মানুষের মিতালি ? আশ্চর্য !

পুরাতন পুলিশ-কর্মচারীর পাকা মাথা এইখানে খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগলো। সুন্দরবাবু ঘুট্‌ঘুটে রাতে খুব জোর করে হয়তো বলতে পারবেন না যে, তিনি ভূত মানেন না মোটেই ; কিন্তু ভূত-রাক্ষস-দানব মানানসই হয় শিশুদের সেকালের রূপকথায়। তাদের শ্রদ্ধা বা স্বীকার করলে পুলিশের কাজে দিতে হয় ইস্তফা। সেকালের জীবজন্তুদের মতো যক্ষ-রক্ষ,

দৈত্য-দানাও পৃথিবীতে আর বাস করে না এবং ডাইনসরের মতো ভূত প্রেতের গল্পও পড়তে বা শুনতে ভালো লাগে বলেই আজকের দিনেও লেখকেরা আর কথকরা তাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন অতো বেশি। আসলে ওসবের মধ্যে কোনো পদার্থই নেই। কিন্তু! ···হুঁ 'কিন্তু' থেকে যায় তবু একটা। ওই ভৈরব অবতারটি কে? সুন্দরবাবুর চোখের সুমুখেই আবির্ভূত হয়ে সে একলাই আজ এতোগুলো পুলিশের লাঠিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, গণ্ডা-গণ্ডা ষণ্ডা চেহারার কুস্তি-লড়া পাহারাওয়ালাকে খেলা ঘরের পুতুলের মতন তুলে আছাড়ের পর আছাড় মেরেছে! পাহারা-ওয়ালাদের কেউ একটা হাত পর্যন্ত তোলবার ফাঁক পায়নি। ও শক্তি কি মানুষের?

খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুন্দরবাবু আজ যেমন তল খুঁজে পাননি, এই গভীর চিন্তার সাগরে ডুবেও তাঁর হাল হলো সেই রকম। ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথা গুলিয়ে গেলো, তিনি আর পারলেন না— উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন 'হুম্!'

— 'আজ্ঞে, স্যর?'

— 'মনোহর, এই রাক্ষসটার চেয়েও কথায় কথায় তোমার ঐ 'আজ্ঞে স্যর' হচ্ছে বেশি ভয়ানক! হুম্, আর আমি সইতে পারছি না।'

— আজ্ঞে, ওরকম একটু-আধটু কথার দোষ সকলেরই থাকে, কি করবো স্যর, উপায় নেই।'

—' উপায় নেই? নেই বললেই হলো? হুম্, আমিও তো মানুষ, আমার কোনো মুদ্রাদোষ আছে?··· কি, চুপ করে রইলে যে বড়ো? বলো, বলো না, আমার কোনো মুদ্রাদোষ আছে? ওটি বলবার জো নেই, হুম্!'

— 'আজ্ঞে স্যর, কিছু দোষ নেবেন না স্যর, কিন্তু কথায় কথায় আপনার ঐ 'হুম্'টা কি স্যর?'

'সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মনোহর, তুমি একটি আস্ত গাড়োল। বড্ড বাজে বকো।'

— 'আজ্ঞে, আমরা এখন কি করবো স্যর ?'

— 'তোমরা সকাল না হওয়া পর্যন্ত এইখানে বসে পাহারা দাও।'

— 'আজ্ঞে, কার ওপরে পাহারা দেবো স্যর ?'

— 'হুম্, সেই কিম্ভূতকিমাকার হয়তো তার দলবল নিয়ে এখনো বিষ্ণুবাবুর গলিতেই লুকিয়ে আছে।'

— 'লুকিয়ে আছে স্যর ? সর্বনাশ ! তাহলে তারাও তো আমাদের ওপরে পাহারা দেবে ! আমার বিশ্বাস, অন্ধকারেও তারা দেখতে পায়।'

— 'হতে পারে।'

— 'হতে পারে ? বলেন কি স্যর ? যদি তারা তেড়ে আসে, স্যর ?'

— 'লাঠি চালিও।'

— 'আজ্ঞে, লাঠি তোলবার সময় কি পাবো ?'

— 'তাহলে চম্পট দিও। হুম্, আমি এখন চললাম।'

— 'কোথায় স্যর, কোথায় ? আবার ঐ বাড়িতে ?'

— 'তুমি কেবল গাড়োলই নও, মস্ত পাগল। ও-বাড়িতে আবার পা বাড়াবো ? ও-বাড়িকে আমি ঘৃণা করি। আমি এখন থানায় চললাম।'

— 'আজ্ঞে, আপনি কি ভয় পেয়েছেন স্যর ?'

— 'ভয় ! হুম্, ভয় ডর কিছুই আমার নেই। পুলিশের কি ভয় পেলে চলে হে ? কিন্তু আমার শরীর আর বইছে না। আমি আজ অজ্ঞান হয়েছি…আছাড় খেয়েছি…জলে ডুবেছি। হয়তো কালই আমায় নিউমোনিয়া ধরবে। তার ওপরে শোকে-দুঃখে আমার মন মেজাজও নেতিয়ে পড়েছে।'

'আজ্ঞে, শোক-দুঃখ আবার কেন স্যর ? আপনি তো জল জ্যান্ত এখনো বেঁচে রয়েছেন।'

— 'গাড়োল ! আমার শোক-দুঃখ তুমি কি বুঝবে ? জয়ন্ত আর মাণিকের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে। হয়তো তারা আর বেঁচে নেই, আমি বন্ধু হয়েও তাদের উদ্ধার করতে পারলাম না। কিন্তু সে কথা যাক, শোনো মনোহর, তোমরা রাতটা এইখানে বসে কাটাও।

তারপর সকাল হলে ঐ-বাড়িখানা খানাতল্লাসি করে থানায় গিয়ে আমার কাছে রিপোর্ট দাখিল করবে।'

— 'কিন্তু ও-বাড়িতে আমাদের যদি ঢুকতে না দেয় স্যর ?'

— 'কে ঢুকতে দেবে না ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকালে তোমরা খালি বাড়িতে ঢুকেই খানাতল্লাসি করবে।'

— 'আজ্ঞে, তাহলে আর খানাতল্লাসির দরকার কি স্যর ?

'মনোহর, তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মূর্খ জীবনে আমি দেখিনি। আসামীরা পালালেও পেছনে কতো প্রমাণ রেখে যায়, জানো না ? আচ্ছা, সকলে তোমরা আর এক কাজ করো। তোমরা ঐ-বাড়িখানা ঘেরাও করে, লক্ষ্মীছেলের মতো চুপটি করে বসে থেকো, তারপর আমিই আবার এসে খানাতল্লাসি শুরু করবো। এখন আমি চললাম।'

সকাল বেলা মেঘেরা বিদায় নিলো বটে, কিন্তু আকাশ ধরলো।

সুন্দরবাবু যথাসময়ে উঠে য়ুনিফর্ম পরে ওপরের ঘরে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। তাঁর মুখে গভীর চিন্তার আভাস।

হঠাৎ তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত স্বরে বলে উঠলেন, 'মনে পড়েছে, ঠিক লোকের কথা মনে পড়েছে। তাদের সাহায্য পেলেই আমি জয়ন্ত আর মাণিককে ঠিক খুঁজে বার করতে পারবো।'

সুন্দরবাবু দ্রুতপদে নিচে নেমে এসে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন। নম্বর বলে সাড়া পেয়েই বললেন, 'হ্যালো, কে ? বিমলবাবু কি ? নমস্কার। কি করছেন ? কুমারবাবু আর বাঘার সঙ্গে চা-পান করেছেন ? আচ্ছা, আপনারা দুই বন্ধুতে একবার থানায় আসতে পারেন কি ? হ্যাঁ, এখনি। কি দরকার ? সব কথা পরে শুনবেন। এখন খালি এইটুকু জেনে রাখুন, আমরা এক ভয়ানক কিম্ভুতকিমাকারের হাতে পড়েছি। হ্যাঁ, মশাই, কিম্ভুতকিমাকার। তাকে ভূতও বলতে পারেন, রাক্ষসও বলতে পারেন, দানবও বলতে পারেন। আসছেন ? আচ্ছা, 'হুম্ !'

নবম পরিচ্ছেদ

কে এই ভীমাবতার?

শেষ চা-টুকু হু'চুমুকে নিঃশেষ করে কুমার বললো, 'সুন্দরবাবু, আবার হঠাৎ কি বিপদে পড়লেন হে?'

ড্রয়ার খুলে রিভলভারটা বার করে পকেটে ফেলে বিমল বললো, 'থানায় গেলেই জানা যাবে। চলো।'

রাস্তায় বেরিয়ে কুমার বললো, 'খবরের কাগজে দেখেছি সুন্দরবাবু এখন নৃমুণ্ড-শিকারীর মামলা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমাদের ডাক পড়েছে বোধ হয় সেইজন্যেই।— 'খুব সম্ভব তাই। কিন্তু সুন্দরবাবুর বন্ধু ডিটেক্টিভ জয়ন্ত থাকতে আমাদের ডাক পড়বে কেন? আমরা তো হচ্ছি মাত্র অ্যাড্‌ভেঞ্চারার!···আরে, আরে! বাঘা, তোকে আমরা ডাকিনি, তুই এলি কেন রে?'

বাঘা সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার মনে করলো না। ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তাদের আগে যেতে লাগলো। বাঘাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে তারাও কিছু বললো না।

থানায় ঢুকতেই সুন্দরবাবু ছুটে এলেন সবেগে। তাড়াতাড়ি বিমলের হাত দুটো চেপে ধরে বলে উঠলেন, 'ভয়ানক কাণ্ড বিমলবাবু, ভয়ানক কাণ্ড! জয়ন্ত আর মাণিক বোধ হয় বেঁচে নেই।'

বিমল প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন চুপ করে রইলো। 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' মামলায় জয়ন্ত ও মাণিকের সঙ্গে তাদের প্রথম পরিচয়, সে আজ বেশিদিনের কথা নয়। কিন্তু এই অল্প দিনেই তারা পরস্পরের বন্ধুর মতন হয়ে উঠেছে। কাজেই খবরটা শুনে তার বুকের ভেতরে একটা ধাক্কা লাগলো।

কুমার বললো, 'কেন, তাঁদের কী হয়েছিলো ?'

— 'হুম্‌, তারা নৃমুণ্ড-শিকারীদের পাল্লায় পড়েছে। হয়তো এতোক্ষণে তাদের প্রাণ গেছে ?'

— 'হয় তো ? তবে যে বললেন, তাঁরা বেঁচে নেই !'

— তাছাড়া কি বলবো ? নৃমুণ্ড-শিকারীদের পাল্লায় পড়ার মানেই তো হচ্ছে মুণ্ডু উড়ে যাওয়া !'

বিমল বললো, 'আচ্ছা, সব কথা আগে খুলে বলুন দেখি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে খুলে বলবার সময় নেই। চলুন, ট্যাক্সিতে উঠে সংক্ষেপে সব বলছি। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। এরকম রহস্যময় ব্যাপারে আপনাদের বাহাদুরি তো আমি স্বচক্ষেই দেখেছি।'

ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিলো। বিমল ও কুমারের সঙ্গে বাঘাও একলাফে গাড়ির ভেতরে গিয়ে হাজির। দেখেই সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে গাড়ি থেকে আবার নেমে পড়বার উপক্রম করলেন।

কুমার তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বললো, 'কি হলো সুন্দরবাবু, যান কোথায় ?'

— 'হুম্‌, রাস্তায়। আপনাদের শখের নেড়ি কুকুর গাড়িতে চড়েছে। বাপ্‌রে ! ওকে দেখলেই ভয় হয়।'

— 'আমি বলছি, কোনো ভয় নেই।'

— 'আমি বলছি, রীতিমতো ভয় আছে। আমার ওপর এখন শনির দৃষ্টি। জানেন, ঘণ্টা কয়েক আগে আমি আছাড় খেয়েছি, অজ্ঞান হয়েছি, জলে ডুবেছি ! এর ওপর ধাড়ি নেড়ি কুকুরের কামড় আর সইবে না।'

— 'কিন্তু বাঘা যে আজ গোঁ ধরেছে, আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না ! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। বাঘা, তুই ড্রাইভারের পাশের সিটে বসগে যা।'— এই বলে কুমার সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো।

বাঘাও অমনি অত্যন্ত সুবোধের মতো টুপ করে ছোট্ট একটি লাফ

নেমে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে আসন গ্রহণ করলো। সে বুঝতে পেরেছিলো তাকে নিয়েই একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। একবার আড়চোখে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর জিভ বার করে হাঁপাতে লাগলো।

সুন্দরবাবু বললেন, 'এতো বড়ো, এতো মোটা আর এতো ভারি নেড়ি-কুকুর জীবনে আমি আর দেখিনি।'

কুমার বললো, 'বাঘা আমাদের দেশী কুকুর, নেড়িকুত্তা বলে ওকে তাচ্ছিল্য করবেন না সুন্দরবাবু। বরং যত্ন করলে আমাদের দেশী কুকুরও যে কতো বড়ো আর কতো সবল হতে পারে, সেইটেই ভেবে দেখুন।'

— 'কুকুর নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। এখন সব কথা বলি, শুনুন—'

ট্যাক্সি বিষ্ণুবাবুর লেনে ঢুকে থামলো যথাস্থানে।

মনোহর বোঁ-বোঁছুটেকের এসে ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়েই স্যালুট ঠুকে বললো, 'স্যর, স্যর, এসেছেন স্যর? বাঁচলাম স্যর। শেষ রাতটুকু যে দুর্ভাবনায় কেটেছে!'

— 'হুম্, তোমার আবার দুর্ভাবনা কিসের বাপু? বিপদ দেখলেই যে লোক রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়োতে পারে, তার আবার দুর্ভাবনা?'

মনোহর যে কাল রাতে রাক্ষসের মুখে তাঁকে ফেলে লম্বা দৌড় মেরে পালিয়ে গিয়েছিলো, সুন্দরবাবু সে রাগ তখনো হজম করতে পারেননি।

— 'আজ্ঞে স্যর, দৌড়ের কথা কেন বলছেন স্যর? আমি তো আপনার কাছে একেবারেই নাবালক। আমি দৌড়োই খালি ডাঙায়, আর আপনি যে জলে-স্থলে সমান দৌড়োতে পারেন স্যর! খালের কথা এরি মধ্যে ভুলে গেলেন স্যর?

— 'আঃ, সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে বাজে তর্ক করো না। কাজের কথা বলো।'

—'কাজের কথা আর কি বলবো স্যর? সকলে মিলে ঐ মরা বাড়িখানার ওপরে পাহারা দিচ্ছি।'

— 'মরা-বাড়ি? সে আবার কী? বাড়ি কখনো জ্যান্ত আর মরা হয়?'

কুমার বললো, মনোহরবা· বোধ হয় বলতে চান যে, ও বাড়িতে কোনো মানুষের সাড়াশব্দ নেই।'

মনোহর সোৎসাহে বললো, 'আজ্ঞে স্যর, ঠিকই ধরেছেন। আমি তো ঐ কথাই বলতে চাই স্যর। মশা-মাছি আর পিঁপড়ে ছাড়া ও-বাড়ির ভেতরে এখন আর কেউ নেই।'

— 'সেই রাক্ষসটা আর দেখা দেয়নি?'

— 'আজ্ঞে, না স্যর।'

— 'কোনোরকম তর্জন-গর্জনও করেনি?'

— 'টুঁ' শব্দটি শুনিনি স্যর।'

— 'হুম্, শুনে হাঁপ ছাড়লাম। চলুন বিমলবাবু, এবারে আমরা ও-বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ি।···দুর্গা, দুর্গা।'

সবাই অগ্রসর হলো। সর্বাগ্রে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো বাঘা। কিন্তু দরজা পার হয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং চারদিকে ঘ্রাণ নিতে লাগলো।

বিমল বললো, 'বাঘার মনে বোধ হয় কোনো সন্দেহ হয়েছে।'

সুন্দরবাবু অ াচমকে বললেন, 'কিসের সন্দেহ?'

— 'সে বুঝতে পেরেছে, এটা শত্রুপুরী।'

— 'বুঝতে পেরেছে না ছাই।'

হঠাৎ বাঘা গর্র্-গর্র্ করে গজরাতে লাগলো।

— 'ও বাবা আপনাদের কুকুর অমন করে কেন মশাই? কামড়াবে নাকি?'

—'না, বাঘা বলছে—আমি এখানে কোনো শত্রুর গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।'

— 'শত্রুর গায়ের গন্ধ ? বলেন কি ? শত্রু তাহলে এখনো এখানেই আছে ? হুম্ !'

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে পিছোতে লাগলেন এবং তালে তাল মিলিয়ে পিছু হটতে লাগলো মনোহর।

বিমল কোনো রকমে হাসি চেপে বললো, 'মাভৈঃ'।

—'হুম্ !'

— 'আজ্ঞে স্যর, সে মূর্তিটাকে আপনি তো দেখেন নি, তাহলে আর মাভৈঃ বলতেন না। পালিয়ে আসুন স্যর। এখনো পালাবার সময় আছে।'

কিন্তু বিমল ও কুমার একবারও পেছন ফিরে তাকালো না, দৃঢ়পদে বাঘার অনুসরণ করে বাড়ির ভেতর দিকে অগ্রসর হলো। বাঘা তখন কিসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

মনোহর বললো, 'ওঁরা যে পাগলের মতো মরতে চললেন! চলুন স্যর আমরা এইবেলা লম্বা দিই।'

রুমাল বার করে টাকের ঘাম মুছতে মুছতে মুছতে সুন্দরবাবু বললেন, 'না মনোহর, সেটা ভালো দেখায় না। ডিউটি ইজ ডিউটি। কিন্তু কুকুরটা কিসের গন্ধ পেলো, বল্ দেখি ?'

— 'আজ্ঞে স্যর, বিপদের গন্ধ।'

— 'মনোহর মাঝে মাঝে তুমি এমন বিটকেল কথা কও, কোনো মানে হয় না। খানিক আগে বললে— 'মরা-বাড়ি'। এখন আবার বলছো 'বিপদের গন্ধ'। বিপদের অবার গন্ধ কি হে ? যাক, এখন আমার সঙ্গে চলো।'

— 'আজ্ঞে স্যর, আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে পাহারা দিলেই ভালো হয় না ?'

— 'ও, তার মানে আবার তুমি আমাকে ফেলে পালাতে চাও ? না-না, ও-সব হবে-টবে না। এবারে তোমার পালাবার পথ আমি বন্ধ করবো। এবারে তুমি আমার সামনের দিকে থাকো।'

তখন বাঘার সঙ্গে বিমল ও কুমার একতলার একখানা প্রায়ান্ধকার ঘরের ভেতরে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে বাঘার গজরানি আরো বেড়ে গেলো। বিমল ও কুমার অনুভব করলো, সমস্ত ঘরখানা একটা উগ্র ভয়াবহ দুর্গন্ধে ভরপুর।

কুমার বললো, 'এ ঘরে কে থাকতো?'

বিমল আঙুল দেখিয়ে বললো, 'জানলার লোহার গরাদগুলো দেখেছো? দু' ইঞ্চিরও বেশি মোটা!'

— 'দরজার সামনেও কোল্যাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেট।'

— 'তার মানে, এ-ঘরে কারুকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো।' বলেই বিমল মেঝের ওপরে বসে পড়ে কি যেন তুলে নিতে লাগলো।

— 'কি করছো বিমল?'

— 'চুপ। এই দেখো। এখন কারুকে কিছু বলো না। আগে ভালো করে পরীক্ষা করি।'

এমন সময়ে সুন্দরবাবু দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বললেন, 'খবর কি?'

— 'খবর শুভ। চলুন সুন্দরবাবু, বাইরে যাই। এসো কুমার।' বিমল বললো।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কাল আমরা যখন এখানে আসি, তখন তেতলার ঐ কোণের ঘরটায় আলো জ্বলছিলো। আমাদের দেখেই কারা আলো নিভিয়ে দেয়। চলুন, আগে আমরা ঐ ঘরেই যাই।'

বিমল বললো, 'না, আগে একতলার আর দোতলার সব ঘর পরীক্ষা না করে তেতলায় ওঠা নিরাপদ নয়।'

একতলা আর দোতলার অন্যসব ঘর দেখে তারা সেই সাজানো-গোছানো 'হল-ঘরে প্রবেশ করলো। জয়ন্ত ও মাণিক সেই হল-ঘরটাকে যে অবস্থায় দেখেছিলো এখনো তার কিছুই পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু কোথাও মানুষের দেখা বা সাড়া নেই। মনোহর ঠিকই বর্ণনা দিয়েছে— মরা-বাড়ি।

সুন্দরবাবু বললেন, 'যা ভেবেছিলাম তাই। আসামীরা পালিয়েছে। তবু চলুন, একবার তেতলাটা দেখেই যাই।'

বিমল জবাব দিলো না, ঘরের লেখবার টেবিলের দিকে হেঁট-মুখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কুমারও তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তখন সুন্দরবাবুও কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন।

বিমল বললো, 'দেখো তো কুমার, ব্লটিং প্যাডের ওপরে কি যেন লেখা রয়েছে?'

কুমার ভালো করে দেখে বললো, 'কেউ কারো ঠিকানা লিখে, খামখানা প্যাডের ওপর চেপে কালি শুকিয়ে নিয়েছে। উল্টো ছাপ পড়েছে— সব জায়গায় স্পষ্টও নয়। তবে নামের গোড়ার অক্ষরটা দেখছি S, আর আর উপাধি হচ্ছে চৌধুরী। আর একটা কথা পড়া যা যাচ্ছে— 'ফ্রেজারগঞ্জ' বোধ হয়।' বিমল বললো, 'আমিও ঠিক ওই টুকুই পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এস্ চৌধুরী, অর্থাৎ সত্য চৌধুরী। সেই-ই এ বাড়ির মালিক, আর বোধ হয় পালের একজন গোদা। আমরা খবর পেয়েছি সে এখন কলকাতায় নেই।'

বিমল বললো, 'খুব সম্ভব চিঠিখানা কালই লেখা হয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কি করে জানলেন?'

অক্ষরের ছাঁদগুলো দেখলেই বোঝা যায়, খুব তাড়াতাড়িতে লেখা। চেয়ে দেখুন, কলমদানিতে কালো কালির কলম নেই, সেটা পড়ে রয়েছে টেবিলের তলায়।'

— 'তাতে কি বোঝায়?'

— 'লোকটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লিখে কলমটা যথাস্থানে রাখবার সময় পায়নি। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যস্তভাবে উঠে গেছে। কাল এখানে যে সব কাণ্ড ঘটেছে, তার ব্যস্ততার আর উত্তেজনার কারণ বোধ হয় তাই।'

— 'হুম্, ওসব বাজে কথা রেখে তেতলার ঘরে চলুন।'

কিন্তু তেতলার ঘরও খালি।

মনোহর বললো, 'স্যর, স্যর! ঐ দেখুন টেলিফোন। জয়ন্তবাবু তাহলে এই ঘর থেকেই ফোনে আমাদের ডেকেছিলেন।'

সুন্দরবাবু ম্রিয়মান মুখে বললেন, 'কিন্তু জয়ন্ত আর মাণিকের কি হলো?'

বিমল বললো, 'জয়ন্তবাবু হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যক্তি, খুব সম্ভব তাঁকে এখনো হত্যা করা হয়নি। বাড়ির কোনো ঘরে এক ফোঁটা রক্ত বা হত্যার কোনো চিহ্নই নেই। সম্ভবত এখনকার মতো তিনি আর মাণিকবাবু বন্দী হয়ে আছেন।'

— 'কিন্তু কি করে তাঁদের উদ্ধার করবো? কোথায় গেলে তাঁদের পাবো?'

বিমল খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে নীরব হয়ে রইলো। তারপর যেন নিজের মনেই বললো, 'একটি মাত্র সূত্র পেয়েছি, কিন্তু সেটা কি কোনো কাজে লাগবে?'

— 'হুম্, আমি তো সূত্র-ফুত্র কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! সব অন্ধকার।'

—'আপনার মুখে শুনলাম, সত্য চৌধুরী আসামীদের দলের একজন প্রধান ব্যক্তি, আর সে এখন কলকাতায় নেই। ধরুন, সে আছে ফ্রেজার-গঞ্জে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আসামীরা জয়ন্তবাবুদের বন্দী করে পুলিশের ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে, চিঠি লিখে সত্য চৌধুরীকে খবর জানিয়ে চিঠিখানা এখানকার কোনো ডাকবাক্সে ফেলে গেছে।'

— 'হতেও পারে, না হতেও পারে। না হওয়াই সম্ভব।'

— 'তা বটে। শুধু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

— 'কি চেষ্টা করবো?

— 'এখন বেলা মোটে সাতটা। কাল শেষ রাতে যদি কেউ চিঠি লিখে থাকে তবে সেখানা এখনো বোধ হয় এই পাড়ার ডাকঘরেই বা ডাক-বাক্সে জমা আছে। সেখানা কোনো রকমে সংগ্রহ করা যায় নাকি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিছু ফল হবে বলে মনে হয় না। তবু ডাক ঘরেই যাচ্ছি। এখানকার পোষ্ট মাষ্টার আমার বিশেষ বন্ধু।'

— 'বন্ধু না হলেও ক্ষতি ছিলো না, কারণ আপনি যাচ্ছেন রাজ-কার্যেই। আর দেরি করবেন না, বেরিয়ে পড়ুন। আমরাও বাড়িতে যাই। খবরটা দেবেন।'

আধ ঘণ্টা পরেই বিমল ও কুমারের বৈঠকখানায় দিগ্বিজয়ীর মতো বুক ফুলিয়ে সুন্দরবাবুর প্রবেশ। তাঁর দুই চক্ষু আনন্দে ও উৎসাহে সমুজ্জ্বল।

বিমল হাসিমুখে বললো, 'কি সংবাদ ?'

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য, আশ্চর্য! বিমল-বাবু, আপনি গোয়েন্দা না হয়েও আমাদের সবাইকে যে হারিয়ে দিলেন! জয়ন্তকে যদি ফিরে পাই, বলবো— দুয়ো জয়ন্ত!'

— 'কেন বলুন দেখি ?'

— 'ব্লটিং প্যাডে উল্টো ছাঁদে তুচ্ছ দুটো কালির আঁচড় আর ঘরের মেঝেতে একটা স্থানচ্যুত কলম! এইমাত্র দেখেই আপনি কতোবড়ো একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন! হুম্, আশ্চর্য!'

—'কি আবিষ্কার ?'

—'নৃমুণ্ড-শিকারীদের আস্তানা আবিষ্কার, তাদের দলপতিকে আবিষ্কার, এতোদিন ধরে আমরা কেউ যা করতে পারিনি! তার ওপরে জয়ন্ত আর মাণিককে আবিষ্কার।'

— 'তাহলে সত্য-সত্যই ওখানে কাল রাতে কেউ চিঠি লিখেছিলো ?'

পকেট থেকে একখানা খাম বার করে সুন্দরবাবু বললেন, 'এই নিন সেই চিঠি।'

খামের ভেতর থেকে চিঠিখানা বার করে বিমল পড়লো ঃ

মাননীয় মহাশয়,

আজ রাতে ডিটেকটিভ জয়ন্ত আর তার বন্ধুকে আমরা বন্দী করিয়াছি, জানিবেন। তারপর পুলিশের সহিত আমাদের দাঙ্গা হইয়াছে। ভীমাবতারের হাতে মার খাইয়া পুলিশ পলাইয়া গিয়াছে, হয়তো এখনি আবার ফিরিয়া আসিবে। আপনার অনুমতি পাই নাই বলিয়া বন্দীদের বধ করিতে পারিলাম না। তাহাদের লইয়া আমরা

নৌকায় চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িব। তারপর পথে আপনার বাগান বাড়ি হইতে মোটর বোট লইয়া ফুলছড়ি দ্বীপের আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইব। আপনিও যথাসম্ভব শীঘ্র সেখানে যাইলে ভালো হয়। আর কিছু লিখিবার সময় নাই। ইতি—

আপনার অনুগত
শ্রীপশুপতি হাজরা

দশম পরিচ্ছেদ

ভূতরা অসামাজিক, অমানুষিক, অস্বাভাবিক

বিমল চিঠিখানা হাতে করে খানিকক্ষণ বসে রইলো নীরবে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'তাহলে জয়ন্তবাবুরা এখন ফুলছড়ি দ্বীপের দিকে যাত্রা করছেন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ফুলছড়ি দ্বীপের নাম আমি শুনেছি।'

কুমার বললো, 'কিন্তু আমরা সেখানে একবার গিয়েছিলাম। সুন্দরবন ছাড়িয়ে মাত্‌লা আর জামিরা নদী যেখানে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, সেখানে কতকগুলো দ্বীপ আছে। তাদেরই একটি হচ্ছে ফুলছড়ি দ্বীপ। ফ্রেজারগঞ্জও তার খুব কাছে। সেখান থেকে জলপথে ঐ দ্বীপে যাওয়া যায়।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তাহলে এখন আমাদেব কর্তব্য কি? আমরাও কি পোর্ট পুলিশের লঞ্চ নিয়ে পশুপতিদের পিছনে তাড়া করবো?'

বিমল বললো, 'না। কারণ প্রথমত তারা অনেক আগে বেরিয়েছে, হয়তো তাদের ধরতে পারবো না। দ্বিতীয়ত, আসামীদের নাগাল পেলেও জলপথে তাদের সতর্ক চোখগুলোকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে কাছে যেতে পারবো না! দূর থেকে পুলিশের লঞ্চ দেখলেই তারা নিশ্চয়ই জয়ন্তবাবু আর মাণিকবাবুকে হত্যা করে জলে ফেলে দিয়ে নির্দোষী সাজবার চেষ্টা করবে। আমাদের চুপি চুপি যেতে হবে একেবারে তাদের আড্ডায়, অর্থাৎ ফুলছড়ি দ্বীপে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু তাদের আড্ডা আছে হয়তো গভীর জঙ্গলের মধ্যে কোনো গোপন স্থানে। আমরা তার সন্ধান পাবো কেমন করে?'

— 'সন্ধান পাওয়া খুবই সহজ।'

— 'সহজ ?'

— 'হ্যাঁ। আগে ফ্রেজারগঞ্জে গিয়ে আমরা সত্য চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করবো। সত্যাই তার আড্ডার সন্ধান বলে দিতে বাধ্য হবে।'

— 'কিন্তু দেরি হলে পশুপতিরা যদি জয়ন্ত আর মাণিককে মেরে ফেলে ?'

— 'পশুপতির চিঠিতেই দেখছেন তো, সত্য চৌধুরীর হুকুম পায়নি বলেই সে বন্দীদের খুন করেনি।'

— 'হুম্, সে কথা সত্যি। কিন্তু বলা তো যায় না, সত্য চৌধুরী যদি আমাদের আগেই ফুলছড়ি দ্বীপে গিয়ে হাজির হয় ?'

— 'কেন যাবে সে ? জয়ন্তবাবুরা যে বন্দী হয়েছেন এ খবর সে জানেনা। পশুপতির চিঠি আমাদের হাতে। এ চিঠি আমরা ফেরৎ দেবো না। চিঠির বদলে তার ঠিকানায় গিয়ে হাজির হবো সদলবলে আমরাই। তারপর বোঝা যাবে, সে আমাদের পথ দেখিয়ে ফুলছড়ি দ্বীপে নিয়ে যেতে রাজি হয় কিনা।'

কুমার বললো, 'আমিও বিমলের প্রস্তাব সমর্থন করি। সুন্দরবাবু, আপনি এখন তাড়াতাড়ি ফ্রেজারগঞ্জে যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলুন। সঙ্গে একদল সশস্ত্র পুলিশ নিতে ভুলবেন না। জয়ন্তবাবুদের উদ্ধার করবার আগে হয়তো আমাদের একটা খণ্ড-যুদ্ধে নিযুক্ত হতে হবে।'

সুন্দরবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুম্, যুদ্ধে আমি ভয় পাই না। আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু আমার ভয়, সেই বীভৎস ভীমাবতারকে! আমার গভীর সন্দেহ হচ্ছে, সেপাইরা কি তাকে কাবু করতে পারবে ?'

কুমার মুখ টিপে হাসতে হাসতে বিমলকে বললো, 'কিহে, ভীমাবতারের গুপ্তকথা সুন্দরবাবুর কাছে খুলে বলবো নাকি ?

বিমল মাথা নেড়ে বললো, 'না, এখন নয়।'

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'হুম্, হুম্ ! ভীমাবতার কে, আপনারা তা জানেন ?'

বিমল বললো, 'জানি।'

— 'কি আশ্চর্য! জানেন তবু বলবেন না?'

— 'না।'

— 'কেন শুনি?'

— 'বললে হয়তো আরো বেশি ভয় পাবেন।'

— 'হুম্, যা ভয় পেয়েছি তারই তুলনা হয় না। তার চেয়ে আর বেশি ভয় পাবার উপায়ই নেই। আপনি অনায়াসেই বলতে পারেন। ভীমাবতার কে? সে কি মানুষ, না ভূত?'

— 'যদি বলি ভূত, তাহলে কি করবেন?'

— 'তাহলে তার সঙ্গে আর দেখা করবো না। জয়ন্ত আর মাণিক জানে— আপনারাও জেনে রাখুন, ভূত সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। কারণ ভূতরা হচ্ছে অসামাজিক, অমানুষিক আর অস্বাভাবিক। তাদের সঙ্গে কোনো ভদ্রলোকেরই সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। আমি জানতে চাই, ভীমাবতারটা ভূত কিনা?'

বিমল বললো, 'তাহলে খালি এইটুকু জেনে রাখুন যে ভীমাবতার হচ্ছে ভূতের চেয়েও অসামাজিক, অমানুষিক আর ভয়ানক।

— 'তার মানে?'

— 'তার মানে কোনো বিশেষ প্রমাণ পেয়ে এই ভীমাবতারটির সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু শেষটা সে-সন্দেহ সত্য না হতেও পারে। কাজে কাজেই ভীমাবতার সম্বন্ধে আপাতত বেশি কিছু আর বলতে পারবো না। বিশেষ, এখন আমরা যাচ্ছি ফ্রেজারগঞ্জে, যেখানে ভীমাবতার নেই। সুতরাং আপনি নির্ভয় হতে পারেন।'

সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নির্ভয় হবো, না ছাই হবো! হুম্, নমস্কার! চললুম আমি সশরীরে যমের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা উইল করে গেলেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে বোধ হয়। দুর্গা, দুর্গা।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তের জাগরণ

এইবারে জয়ন্ত আর মাণিকের খবর নেবার সময় হয়েছে।

জ্ঞান হবার পর জয়ন্ত সর্ব প্রথমে দেখলো, সে শুয়ে আছে ঠাণ্ডা মাটির ওপরে, একটা আধা অন্ধকার ঘরে।

ওঠবার চেষ্টা করলো, পারলো না। তার হাত দুটো পিছ-মোড়া করে বাঁধা এবং পা দুটোও বাঁধা শক্ত দড়িতে। তখন নাচার ভাবে শুয়ে শুয়ে সে ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগলো। কিন্তু দেখবার বিশেষ কিছু নেই। চার দেওয়ালে চারটা ছোটো ছোটো জানলা এবং একদিকে একটা দরজা। একদিকের একটা জানলা খোলা— তার বাইরে দেখা যাচ্ছে ওপরে আলোকিত আকাশ এবং নিচে মর্মরিত অরণ্যের চূড়া।

হঠাৎ তার ডানপাশ থেকে সাড়া এলো, 'জয়ন্ত।'

চমকে সেদিকে ফিরে জয়ন্ত দেখতে পেলো মাণিককে। তারও অবস্থা এক।

— 'জয়ন্ত, এবারে বোধ হয় আমাদের লীলা খেলা ফুরোলো।'

— 'হ্যাঁ মাণিক, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে! সুন্দরবাবু আর কোনো নতুন মামলায় আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবেন না। সুন্দরবাবুর হতাশ মুখ মনে করে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।'

— 'কিন্তু আমরা কোথায় আছি?'

— 'বলা অসম্ভব। তবে কলকাতায় নয় নিশ্চয়ই। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো। শহরের আকাশ এমন পরিষ্কার আর নীল হয় না। চারিদিকের স্তব্ধতার ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে কেবল

বাতাস আর গাছপালার কানাকানি আর পাখিদের ডাক। মানুষ বা অন্য কোনো জীবজন্তুর সাড়া নেই। খুব সম্ভব আমরা কোনো নির্জন বনের ভেতর আছি। শহর বা গ্রাম এখান থেকে অনেক দূর।'

— 'আমরা কতোক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম বলে মনে হয়?'

— 'তাও বলা শক্ত। একদিনও হতে পারে, দু'দিনও হতে পারে।'

— 'কি করে বুঝলে?'

— 'আমরা যখন বিষ্ণুবাবুর লেনে গিয়েছিলাম, তখন রাত্রিকাল। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখো, এখন রোদ উঠেছে গাছের মাথায়। তার মানে, একটু পরেই সূর্য অস্ত যাবে, সন্ধ্যা হবে, আবার রাত আসবে। আমরা যখন অজ্ঞান হয়েছিলাম, তখন কালকেও আর একবার দিন আর রাত এসেছে গিয়েছে কিনা, তা কে জানে?'

— 'শোনো জয়ন্ত, স্বপ্নের মতো আমার একটা কথা মনে হচ্ছে কতোক্ষণ আগে জানি না, কিন্তু আর একবার আমার অল্প অল্প জ্ঞান হয়েছিলো। মনে হলো, আমার কানের কাছে যেন স্রোতের কল্‌কল্‌ শব্দ হচ্ছে। যেন মোটর বোটের আওয়াজও শুনলাম। কিন্তু ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই নাকের কাছে কেমন একটা বিষম উগ্র গন্ধ জাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম।'

— 'তোমার এ-স্বপ্ন সত্য হলে বলতে হয়, জল-পথে আমাদের শহরের বাইরে অন্য কোথাও নিয়ে আসা হয়েছে আর যাতে আমাদের জ্ঞান না হয়, বারবার চেষ্টা করা হয়েছে।......কিন্তু ও কিসের শব্দ?......চুপ।'

সশব্দে ঘরের দরজা খুলে গেলো। ভেতরে এসে দাঁড়ালো একটা মূর্তি। কালো রং, জোয়ান চেহারা, কুৎসিত, নিষ্ঠুর মুখ। হাতে এক গাছা তেলে পাকানো মোটা বাঁশের লাঠি।

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট খানেক ধরে বন্দীদের দেখলো। তারপর কালো মুখে শাদা দাঁত খেলিয়ে বললো, 'এই যে জয়ন্ত! তাহলে আর তোমরা অজ্ঞান হয়ে নেই?'

— 'না, এখন আমরা জ্ঞানবান্ হয়েছি। কিন্তু তুমি কে বাপু?'

— 'আমি? আমি পশুপতি!' বলেই সে হা-হা-হা-হা করে হাসতে লাগলো।

— 'অতো হাসির ঘটা কেন, বন্ধু?'

— 'হাসছি তোমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে।'

— 'আমাদের ভবিষ্যৎ কি এতো হাস্যকর? বেশ বন্ধু, তাহলে তোমার মুখে আমাদের ভবিষ্যতের বর্ণনা শুনলে আমরা খুব খুশি হবো।'

— 'ওরে হাঁদারাম, ভবিষ্যতের বর্ণনা শুনলে তোদের পেটের পিলে চমকে যাবে।'

— 'আমরা পিলে-রুগী নই হে। আমাদের পিলে অতো সহজে চমকায় না।'

— 'তাহলে শোন্। কাল কি পরশুর মধ্যে দেহ দুটো হবে তোদের স্কন্ধ-কাটা। আর তোদের মুণ্ডু দুটো থাকবে কাঁচের জারের ভেতরে স্পিরিটে ডোবানো।'

— 'স্পিরিটে ডোবানো? এ আবার কি খেয়াল?'

— 'খেয়াল নয়রে মুর্খ, খেয়াল নয়। আমাদের কর্তা সত্যবাবু হচ্ছেন সম্ভবত তান্ত্রিক সাধক, তাঁর ওপরে মা-কালীর অসীম করুণা। স্বপ্নে মা জানিয়েছেন, তাঁর আসল নর-মুণ্ডের মালা পরবার সাধ হয়েছে। তাই মায়ের কাছে কর্তাও মহাপ্রতিজ্ঞা করেছেন যে, একশো-আট নর-মুণ্ডের মালা তাঁর চরণে উপহার দেবেন। কিন্তু এই বিধর্মী ফিরিঙ্গিদের রাজত্বে একশো আটটা নর-মুণ্ড জোগাড় করা তো আর দু'-চার দিনের কাজ নয়! তাই আমরা এক-একটা মুণ্ড কাটি আর স্পিরিটে ডুবিয়ে টাটকা রাখি। তেষট্টিটা মুণ্ড আমরা পেয়েছি— তোদের নিয়ে হবে পঁয়ষট্টিটা। আর তেতাল্লিশটা পেলেই মুণ্ড-মালা গাঁথা হবে।'

— 'সুন্দর প্রস্তাব। মায়ের গলার মালায় দুলবো শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। তোমাদের এই মা কোথায় আছেন?'

— 'এই ফুলছড়ি দ্বীপেই। এখানেই আমাদের কর্তার সাধন আশ্রম কিনা!'

— 'বটে! তাহলে কলকাতা থেকে আমরা বেড়াতে এসেছি ফুলছড়ি দ্বীপে?'

— 'বেড়াতে নয়রে গাধা, মরতে।'

— 'তুমি কি দয়া করে এখনি আমাদের স্কন্ধ-কাটা করতে চাও?'

— 'না, কর্তার কাছে খবর পাঠিয়েছি। তাঁর হুকুম পাইনি বলেই তোরা এখনো বেঁচে আছিস।'

— 'তবে এখন তুমি কি করতে এখানে এসেছো? চাঁদ মুখ দেখাতে?'

— 'আমার মুখ যে চাঁদের মতো নয়, সে-কথা আমি জানি রে হনুমান।'

— 'আর আমার মুখ যে হনুমানের মতন নয়, সে-কথা আমিও জানি হে, বন্ধু! কিন্তু তুমি দয়া করে এখানে এসেছো কেন? কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করতে?'

— 'না রে গঙ্গারাম, না। বলির পাঁঠাকেও দানা-পানি দিতে হয়, জানিস না? আমি জানতে এসেছি তোদের খিদে তেষ্টা পেয়েছে কিনা?'

— 'মাণিক, তোমার কোন্‌টা পেয়েছে, খিদে না তেষ্টা?'

— 'তেষ্টা।'

— 'আমারও তাই।'

— 'আচ্ছা।' বলে পশুপতি বেরিয়ে গেলো। একটু পরেই সে দু' বোতল জল নিয়ে ফিরে এলো। জয়ন্ত ও মাণিকের মুখের কাছে বোতল ধরে, সে একে একে দু'জনকেই জলপান করালো।

জয়ন্ত বললো, 'জল দিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করলে বলে ধন্যবাদ। কিন্তু যখন আমাদের খাবার আসবে তখন আমরা খাবো কেমন করে? আমাদের হাত-পা বাঁধা।'

— 'যতোক্ষণ না জবাই হোস, ততোক্ষণ তোদের হাত-পা বাঁধাই থাকবে রে ছুঁচো! আমরা এসে খাইয়ে যাবো।'

— 'বন্ধু জীবতত্ত্বে তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছি। আমি গাধা...... আমি হনুমান......আমি ছুঁচো। তোমার

কৃপায় আমি আরো কতো নব নব মূর্ত্তি ধারণ করবো, বলতে পারো?'

পশুপতি হেসে ফেলে বললো, 'সে-কথা পরে এসে বলবো, এখন আমি চললাম।' সে বেরিয়ে গিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর তার পায়ের শব্দও দূরে মিলিয়ে গেলো।

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলো। তারপর বললো, 'মাণিক মনে আছে?'

— 'কি?'

— 'এ-মামলাটা যখন হাতে নিই তখন তুমি বিলাতের পৃথিবী-প্রসিদ্ধ হত্যা-বাতিক-গ্রস্ত জ্যাক্ দি রিপারের কথা তুলেছিলে?'

— 'হুঁ।'

— 'মনে আছে, আমিও তখন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম যে, এই নৃমুণ্ড-শিকারীও হচ্ছে সেই রকম কোনো বাতিক-গ্রস্ত-হত্যাকারী?'

— 'হুঁ।'

— 'দেখছো, আমার সন্দেহই সত্য? সত্য চৌধুরী হচ্ছে বাঙালি জ্যাক-দি-রিপার। অপরাধ-বিভাগে এই শ্রেণীর অপরাধীদের নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। এদের উন্মাদ রোগ প্রকাশ পায় কেবল বিশেষ এক বাতিকের ক্ষেত্রে।'

— 'ও আলোচনা এখন থাক! আমার ভালো লাগছে না, জয়ন্ত। চোখের সামনে চক্ চক্ করছে নৃমুণ্ড-শিকারীর খাঁড়া! ঐ দুরাত্মা পশুপতিটার সঙ্গে তুমি এই দুঃসময়ে হাসি ঠাট্টা করেছিলে বলে গা আমার জ্বলে যাচ্ছিলো।'

জয়ন্ত অট্টহাস্য করে বললো, 'যে পূজার যে মন্ত্র মাণিক, যে ব্রত আমরা নিয়েছি তাতে এইভাবেই আমাদের মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং দুঃখ করে লাভ কি?'

— 'দেখো জয়ন্ত, মাঝে মাঝে আমার মনে আশার সঞ্চারও হচ্ছে।'

— 'কি আশা?'

— 'মুক্তি-লাভের একটা কোনো উপায় তুমি আবিষ্কার করবেই। ভগবান তোমার ঐ অপূর্ব মাথা নৃমুণ্ড-শিকারীর খাঁড়ার জন্য সৃষ্টি করেন নি। আমি জানি জয়ন্ত, বিপদ যতো গভীর হয়, তোমার বুদ্ধি ততো খোলে।'

— 'আশা কুহকিনী মাণিক, আশা কুহকিনী। আশার ছলনায় ভুলো না। অসম্ভবের বিরুদ্ধে কি চেষ্টা করবো ভাই ? হাত ছুটো যদি পিছ-মোড়া করে বাঁধা না থাকতো, তাহলেও কিছু আশা ছিলো। ঐ জানলাগুলোর লোহার গরাদ এক ইঞ্চির চেয়ে বেশি মোটা নয়। তুমি আমার এই বাহুর শক্তি জানো মাণিক, ওরকম গরাদ আমি মোমের মতো নরম বলে মনে করি। কিন্তু হাত-পা বাঁধা। কোনো আশাই নেই।'

মাণিক বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'দিনের আলো নিভে আসছে, বকের দল বাসায় ফিরছে, পাখিরা বিদায়ী গান গাইছে। জানি না, কালকের সন্ধ্যা এসে আর আমাদের দেখতে পাবে কিনা। জয়ন্ত, ফাঁসির আগের দিনে অপরাধীদের মনের ভাব কিরকম হয়, বুঝতে পারছো ?'

— 'মোটেই পারছিনা। আমি এখন নিষ্পলক নেত্রে ঐ বোতল ছুটোর দিকে তাকিয়ে আছি।'

— 'বোতল ?'

— 'হ্যাঁ। দেখোনা, আমাদের পশুপতি তাচ্ছিল্য করে বোতল ছুটো এইখানেই ফেলে রেখে গিয়েছে।'

— 'পশুপতিকে তুমি 'আমাদের বন্ধু' বলো না, জয়ন্ত।'

— 'নিশ্চয়ই বলবো। এতোক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম, এইবারে গম্ভীর ভাবেই বলবো।'

— 'কেন ?'

— 'কারণ গ্রীক পণ্ডিত আর্কিমেডিসের ভাষায় এখন আমরা অনায়াসেই বলতে পারি— য়্যুরেকা ! য়্যুরেকা !'

— 'তোমার কথার অর্থ কি, জয় ?'

— 'মাণিক, আমার এক টিপ্ নস্যি নিতে সাধ হচ্ছে

মাণিক সানন্দে বললো, 'জয়ন্ত, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেছো! কারণ, নস্যি নেওয়ার সাধ হচ্ছে তোমার বিপুল খুশির লক্ষণ।'

— 'হ্যাঁ বন্ধু, ঐ বোতলই আমাদের উদ্ধার করবে।'

— 'কি বলছো তুমি, জয়ন্ত?'

জয়ন্ত জবাব দিলো না। বোতল ছিলো তার পায়ের কাছে। সে হঠাৎ তার বাঁধা পা দুটো দিয়ে একটা বোতলের ওপর সজোরে আঘাত হানলো। বোতলটা ছিট্‌কে দেয়ালের ওপরে গিয়ে পড়ে ভেঙে গেলো সশব্দে।

— 'কি আশ্চর্য জয়ন্ত, ঐ বোতলই যদি আমাদের বাঁচায়, তবে ওটা ভাঙলে কেন?'

— 'মাণিক, তুমি কি কখনো ভাঙা কাঁচের ধার পরীক্ষা করোনি? ভাঙা কাঁচ ক্ষুরেরও কাজ করতে পারে— এমন কি, তা দিয়ে দাড়িও কামানো যায়।'

— 'জয়! জয়! বুঝেছি বুঝেছি! কিন্তু আমাদের হাত যে বাঁধা ভাই।'

জয়ন্ত কোনো কথা না বলে গড়িয়ে গড়িয়ে ভাঙা বোতলের টুকরো-গুলোর কাছে গেলো। তারপর বললো, 'মাণিক, তুমি পাশ ফিরে স্থির হয়ে শুয়ে থাকো দিকি।'

মাণিক কথামতো কাজ করলো। জয়ন্ত কিছুক্ষণ ভাঙা কাঁচগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বড়ো একখণ্ড কাঁচ বেছে নিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেটাকে দাঁত দিয়ে চেপে গড়িয়ে গড়িয়ে মাণিকের পেছন দিকে এলো। তারপর সেই কামড়ে ধরা কাঁচখানা দিয়ে মাণিকের পিছ-মোড়া করে বাঁধা হাতের দড়ির ওপরে ঘষতে লাগলো। মিনিট কয়েকের মধ্যেই মাণিকের হাত দুটো দড়ির বন্ধন থেকে পেলো মুক্তি।

কাঁচখানা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে জয়ন্ত বললো, 'বন্ধু, এইবারে স্বাধীন হাতের সাহায্যে তুমি নিজের পায়ের বাঁধন খোলো। তারপর ভগবান ছাড়া এই দুনিয়ায় কারুকে আমি গ্রাহ্য করি না।' ....

দুই বাহু বার কয়েক বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করে জয়ন্ত আগে তাদের আড়ষ্টতা দূর করলো। গোটা কয়েক ডন্-বৈঠকও দিয়ে নিলো।

ঠিক সেই সময়ে ঘরের বাইরে জাগলো কার যেন পায়ের শব্দ! মাণিক ত্রস্তস্বরে বললো, 'নিশ্চয়ই সেই শয়তান পশুপতি! হয়তো আমাদের খাবার নিয়ে আসছে।'

— 'একজনের নয় মাণিক, আমি দু'-তিনজনের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' বলেই সে এক লাফ মেরে জানলার কাছে গিয়ে পড়লো।

— 'জানলা ভাঙো জয়ন্ত! শীগ্‌গির!'

মাণিকের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জানলার দুটো লোহার গরাদ জয়ন্ত এক হ্যাঁচকা টানে বেঁকিয়ে খুলে ফেললো। একটা গরাদ মাণিকের হাতে দিয়ে বললো, 'দরকার হলে, এটা অস্ত্রের মতো ব্যবহার করো।'

দরজায় কুলুপ খোলার শব্দ হলো। পরমুহূর্তে জয়ন্ত ও মাণিক জানলা দিয়ে গলে একে একে বাইরে লাফিয়ে পড়লো।

ওদিকে ঘরের মধ্যে জেগেছে তখন বিষম হট্টগোল, ভাঙা জানলার ফাঁকে পশুপতির হতভম্ব মুখ। জয়ন্ত ও মাণিককে দেখতে পেয়েই সে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো, 'কোথায় পালাবি? তোদের পেছনে যাবে মূর্তিমান যম। ডাক ভীমাবতারকে।'

ছুটতে ছুটতে মাণিক বিস্মিত স্বরে বললো, 'ভীমাবতার কে, জয়ন্ত?'

নিজের গতি আরো বাড়িয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললো, 'হয়তো সেই ভয়াবহ বিভীষণ। আরো জোরে পা চালাও, মাণিক।'

মিনিট খানেক পরেই তাদের পেছনে দূর থেকে জেগে উঠলো এক বীভৎস গর্জন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভীমাবতারের জাগরণ ও নিদ্রা

মাণিক শিউরে উঠে বললো, 'ও কোন্ জীবের গর্জন, জয় ?'

জয়ন্ত বললো, 'ভগবান জানেন ! তবে মানুষের গর্জন নিশ্চয়ই নয়।'

— 'হয়তো ওটা এই বনেরই কোনো জীব ! মানুষ দেখে গর্জন করছে।'

— 'ওটা অজানা জীবের গর্জন । ও-রকম গর্জন করতে পারে, সুন্দরবনে এমন কোনো জানোয়ার আছে বলে জানি না।'

তারা দু'জনেই ছুটতে ছুটতে কথা কইছিলো। গর্জন হঠাৎ থেমে গেলো, কিন্তু তার বদলে শোনা গেলো আর এক রকম বেয়াড়া শব্দ। মনে হলো, পেছনের গাছপালার ভেতরে মড়-মড় শব্দ তুলে লতা-পাতা-ডাল ছিঁড়ে-ভেঙে কোন্ এক মত্ত হস্তীর মতন বৃহৎ জীব তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে দিয়েছে !... কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বোঝা গেলো, শব্দটা তাদের দিকেই সবেগে এগিয়ে আসছে !

এদিকে যে সরু পথ দিয়ে তারা ছুটছিলো, সেটা এসে পড়লো একটা মাঝারি মাঠের ওপরে। মাঠের ওধারে প্রায় সিকি মাইল পরে আবার বন-জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। মাঠের ডান ও বাম প্রান্তেও অরণ্যের প্রাচীর।

জয়ন্ত দৌড় থামিয়ে বললো, 'দাঁড়াও মাণিক, আর ছুটো না।' মাণিক দাঁড়িয়ে পড়লো।

শেষ গোধূলির ঝাপসা আলোয় মাঠের চারিদিকে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললো, 'এখন কি করা যায়, বলো দেখি ?'

— 'বিনা বাক্য-ব্যয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন।'

— 'উহু, ঐ খোলা মাঠ দিয়ে পালাতে গেলে আমরা বোধ হয় ধরা পড়বো। শুনছো না, পেছনের শব্দ আমাদের কতো কাছে এসে পড়েছে? যে ঐ শব্দের সৃষ্টি করেছে তার গতি আমাদের চেয়ে দ্রুত বলেই মনে হচ্ছে।'

— 'তাহলে উপায়?'

'একমাত্র উপায় হচ্ছে, চট্‌পট্‌ পথ ছেড়ে পাশের জঙ্গলের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে থাকা। আমরা মাঠ দিয়ে পালিয়েছি ভেবে শত্রু যদি অন্য দিক দিয়ে বিদায় হয়— সে তো বহুৎ আচ্ছা! নাহলে— এসো মাণিক, এসো! পা টিপে টিপে বনের মধ্যে ঢুকে মাথা গুঁজে বসে পড়ো। তারপর একটু নড়া নয়, একটি টুঁ শব্দও নয়।'

বনের মধ্যে ঢুকে একটা ঝুপ্‌সি ঝোপের তলায় তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

শব্দ তখন আরো কাছে এসে পড়েছে। খোলা মাঠের ওপর ঝাপসা আলো তখনো নিঃশেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি বটে, কিন্তু অরণ্যের মধ্যে অন্ধকার তখন অবিচ্ছিন্ন না হলেও জমে উঠেছে রীতিমত।

এতোক্ষণ পরে আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার বোঝা গেলো। শব্দের উৎপত্তি জঙ্গলের নিচে নয়, গাছের ওপরে। কে যেন গাছের পর গাছের বড়ো বড়ো ডাল ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। কি ওটা? হাতি? না দৈত্য-দানব?

মাণিক আর কৌতূহল চাপতে না পেরে বলে উঠলো, 'জয়!'

— 'চুপ!'

পর মুহূর্তেই একটা বিপুল দেহ গাছে গাছে লাফ মেরে মূর্তিমান ঝড়ের মতো মাঠের দিকে এগিয়ে গেলো। অন্ধকারে তার আসল চেহারা কিছু বোঝা গেলো না। খালি মোটা মোটা দু'খানা হাত আর দু'খানা পা! তারপরেই গাছেদের আর্তনাদ স্তব্ধ।

জয়ন্ত ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, 'মূর্তিটা মাঠের ধারের শেষ গাছে গিয়ে পড়ে আমাদের দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছে।'

হঠাৎ মাটি কাঁপিয়ে ধুপ্ করে একটা শব্দ হলো।

— 'মূর্তিটা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লো। এখন দেখো, ও সর্বনেশে আমাদের খুঁজতে আসে কিনা!'

জয়ন্ত ও মাণিক দৃঢ় মুষ্টিতে লোহার ডাণ্ডা ধরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো আসন্ন বিপর্যয়ের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শত্রুরও দেখা নেই, পায়ের শব্দও নেই!

আরো মিনিটখানেক কাটলো।

জয়ন্ত বললো, 'যাক, বোধ হয় আমরা ওর চোখে ধুলো দিতে পেরেছি। ও হয়তো আমাদের খোঁজবার জন্যে মাঠের ওপারে যাত্রা করেছে।'

— 'কিন্তু কি ওটা? ঐ কি ভীমাবতার? না ওটা কোনো বড়ো জাতের বানর?— নিজের মনেই গাছে গাছে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে, আমরা মিছেই ওর জন্যে ভয় পেয়েছি!'

— 'মাণিক, ওসব ভাববার সময় নেই, ঐ শোনো, বনের ভেতর দূর থেকে নতুন গোলমাল শোনা যাচ্ছে! বন্ধু পশুপতি নিশ্চয়ই সদলবলে যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি রবে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে! এখন কি করবে? লড়বে না পালাবে?'

— 'হরিণের মতো ছুটে পালাবো।'

— 'আমারও ঐ মত। দু'জনে একটা দলকে হয়তো ঠেকাতে পারবো না। নাও, উঠে পড়ো। চালাও পা।'

তারা বনের আঁধার ছেড়ে মাঠের আলো-আঁধারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো, যেন প্রকাণ্ড একটা ঘনীভূত ছায়া দ্রুতবেগে মাঠের ওপারকার অরণ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তখনো আসল রূপ ধরা গেলো না। বললো, 'মূর্তিটা গেছে সামনের দিকে। আমরা মাঠের কোন্ দিকে যাবো? ডাইনে না বাঁয়ে?'

— 'আমরা এখানকার কোনো দিকই চিনি না, সুতরাং যেদিকে খুশি যাই, চলো।'

— 'চলো তবে ডান দিকে। কিন্তু খুব জোরে ছুটতে হবে। পশুপতিরা যেন আমাদের টিকি পর্যন্ত দেখতে না পায়।'

তারা যখন আবার দৌড়োতে আরম্ভ করলো, অশরীরী অভিশাপের মতো চলন্ত কালো ছায়াটা তখন মাঠের ওপারে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারিদিক এমন মৌন যেন এ আমাদের নিত্য-পরিচিত পৃথিবী নয়। বনের পাখিরা পর্যন্ত বাসায় ফিরে নীরব হয়ে পড়েছে। চাঁদ আজ অন্ধকারের আসর ভাঙাতে আসবে অনেক রাতে। বাতাস স্পন্দনহীন। গাছের পাতাও তাই নীরব। সমস্ত বনভূমি যেন কোনো ভীষণ নৈশ নাটকের আসন্ন অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ধীরে ধীরে।

জয়ন্ত ও মাণিক যখন ডানদিকে ছুটে প্রায় মাঠের প্রান্তে গিয়ে পড়লো, আচম্বিতে তাদের সুমুখের বনের ভেতর থেকেও অত্যন্ত দ্রুত পদশব্দ জেগে উঠলো— কে যেন মাঠের দিকেই ছুটে আসছে।

মাণিক হতাশভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'আমাদের আর কোনো আশা নেই, জয়ন্ত। এদিকেও শত্রু।'

জয়ন্তও দাঁড়িয়ে পড়লো— সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হলো আর এক নতুন মূর্তি। প্রথমটা সে তাদের দেখতে পায়নি— কিন্তু খানিকটা এগিয়ে এসেই সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মহা বিস্ময়ে।

জয়ন্ত সচকিত চোখে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি আশ্চর্য! তুমি! তুমিও এখানে আছো? আমি যে তোমাকে চিনি, সত্য চৌধুরী! আমার মনের ক্যামেরায় তোমার চেহারা যে ধরা আছে।'

তার বলিষ্ঠ দেহ যেমন দীর্ঘ, তেমন চওড়া। তুটো ক্ষুদ্র তীব্র চোখে জ্বলছে যেন তীক্ষ্ণ বিত্যুৎ-শিখা।

মাণিক সবিস্ময়ে বলে উঠলো, 'আমিও যে এর ফটো দেখেছি, এ যে সত্য চৌধুরী!'

সত্য কোনো জবাব না দিয়ে দৌড়ে তাদের পাশ কাটাতে গেলো। কিন্তু জয়ন্ত এক লাফে তার সামনে গিয়ে পড়ে মাথার ওপরে লোহার ডাণ্ডা তুলে কঠিন স্বরে বললো, 'দাঁড়াও সত্য চৌধুরী! হাতে যখন পেয়েছি, তখন আর তোমাকে পালাতে দেবো না।'

সত্য হা-হা করে হেসে উঠেই চোখের নিমেষে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জয়ন্তকে তুই হাতে জড়িয়ে ধরলো প্রাণপণে। জয়ন্ত এই আকস্মিক আক্রমণের আশা করেনি— তাকেও তখন বাধ্য হয়ে হাতের ডাণ্ডা ফেলে সত্যকে জড়িয়ে ধরতে হলো।

আরম্ভ হলো বিষম ধ্বস্তাধ্বস্তি। জয়ন্তর দেহ যেমন পেশীবদ্ধ, পরিপুষ্ট ও সুদীর্ঘ— সত্যরও তেমনি। তু'জনেই কেউ কাবু হবার পাত্র নয়। মাণিক একবার ভাবলো, ডাণ্ডা মেরে সত্যকে ঠাণ্ডা করে দেয়, কিন্তু তারপরেই ভাবলো— না, জয়ন্ত যদি জেতে তো স্থায় যুদ্ধেই জিতুক। জয়ন্তকে সে কখনো হারতে দেখেনি। তার পরাজয়ের সম্ভাবনা সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না।

হঠাৎ পাশের নিস্তব্ধ অরণ্য যেন জেগে উঠলো পায়ের শব্দের পর শব্দে! এ যে অনেক লোক ছুটে আসছে— যেন একটা জনতা!

পরক্ষণেই পেছনেও হৈ-হৈ শব্দ! দূরে— মাঠের ওপরেও অনেকগুলো ছুটন্ত ছায়ামূর্তি!

মাণিক ব্যাকুল স্বরে বললো, 'চারিদিকে শত্রু! আমরা বেড়াজালে ধরা পড়ে গেছি, জয়।'

জয়ন্ত তার সমস্ত শক্তি একত্র করে সত্যকে মাটির ওপরে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। সত্যের দেহে অসুরের মতো ক্ষমতা।

বনের ভেতরকার পায়ের শব্দ এবং মাঠের ওপরকার ছায়ামূর্তিগুলো তখন আরো কাছে এসে পড়েছে।

জয়ন্ত চিৎকার করে বললো, 'মাণিক! শত্রুরা যখন চারিদিক থেকে

দল বেঁধে আক্রমণ করতে আসছে তখন আর ন্যায়-যুদ্ধ নয়। মারো এর মাথায় লোহার ডাণ্ডা, পৃথিবীর একটা আপদ দূর হোক।'

মাণিক লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে এলে, সত্য তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু জয়ন্তর দুই বাহুর লৌহ বন্ধন শিথিল করবার সাধ্য তার হলো না।

মাণিক মাথার ওপরে ডাণ্ডা তুললো। ঠিক সেই সময়ে কাছ থেকে শোনা গেলো, 'ডাণ্ডা নামান মাণিকবাবু। আমরা এসে পড়েছি— আর ভয় নেই।'

মাণিক থমকে ফিরে দেখে, তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে বিমল ও কুমার— তাদের প্রত্যেকেরই হাতে রাইফেল! ওদিকে জঙ্গলের ভেতর থেকেও বেরিয়ে আসছে বন্দুক হস্তে দলে দলে পুলিশ।

দারুণ বিস্ময়ে মাণিক 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কাঠের পুতুলের মতো। তার মনে হলো, হয় সে একটা অসম্ভব স্বপ্ন দেখেছে, নয় তো দুশ্চিন্তার ধাক্কায় তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু জয়ন্তের তখন বিস্মিত হবার অবকাশ নেই, সত্যর মারাত্মক আক্রমণ ঠেকাতেই সে ব্যতিব্যস্ত। চারিদিকে পুলিশ দেখে সত্য তখন মরিয়া হয়ে লড়ছে।

বিমল এগিয়ে রাইফেল তুলে কর্কশ স্বরে বললো, 'স্থির হয়ে দাঁড়াও সত্য, নইলে তোমার মাথার খুলি ফুটো করে দেবো।'

সত্য পাগলের মতো বলে উঠলো, 'ছোঁড়্ তুই গুলি! কিন্তু তার আগে জয়ন্তকে মেরে মরবো আমি।'

কথা কইতে কইতে সত্য বোধ হয় একটু আনমনা হয়েছিলো, জয়ন্ত সেই সুযোগে এক প্যাঁচে তাকে একেবারে মাটির ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। সত্য মাটির ওপরে পড়ে ভয়ানক হাঁফাতে লাগলো এবং সেই অবস্থাতেই উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে উঠে বললো, 'তোরা যদি দল বেঁধে না এসে পড়তিস, তাহলে দেখতাম ঐ জয়ন্তকে।'

জয়ন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'স্বীকার করি সত্য, আমাদের দু'জনের মধ্যে বাহুবলে কে শ্রেষ্ঠ, তা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সত্য চৌধুরী বললো, 'তোর জন্যই আমি মা-কালীর মুণ্ডমালা গাঁথতে পারলাম না। ওরে পাষণ্ড, নৃমুণ্ড-মালিনী তোর সর্বনাশ করবেন।'

জয়ন্ত হাসিমুখে বললো, 'কিন্তু আমি স্বপ্ন পেয়েছি, তুমি ফাঁসি-কাঠে ওঠবার আগে মা-কালী আমাকে কিছুই করবেন না।'

মাণিক মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলো, যে সব মূর্তি তাদের দিকে ছুটে আসছিলো তারা আবার অদৃশ্য হয়েছে, কে কোথায়। এমন সময়ে পাশের বনের ভেতরে জাগলো এক বিষম আর্তনাদ! কে পরিত্রাহি চিৎকার করে বললো, 'বিমলবাবু— কুমারবাবু! বাঁচান! ভীমাবতার ······হুম্-হুম্-হুম্-হুম্।'

এ যে সুন্দরবাবুর গলা! বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মাণিক বনের দিকে ছুটে গেলো, কিন্তু তারা কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতেই সুন্দরবাবু জঙ্গল ভেদ করে এক লাফে মাঠের ওপরে ধপাস করে পড়ে গেলেন। তারপর পেট-মোটা লাটাইয়ের মতন গড়াতে গড়াতেই পালাতে লাগলেন।

অকস্মাৎ আর এক সুবৃহৎ ছায়ামূর্তির আবির্ভাব! তখন আকাশে আর আলো নেই বললেই হয়, মূর্তিটাকে দেখাচ্ছিলো একটা ঘন অন্ধকারের মতো— কেবল তার জ্বলন্ত চোখ দুটো ও দাঁতগুলো চক্‌চক্ করে উঠছে।

বিমল ও কুমারের হাতের বন্দুক তৎক্ষণাৎ গর্জন করে উঠলো, পর মুহূর্তেই বিকট আর্তনাদ ও গুরুভার দেহ পতনের শব্দ!

সুন্দরবাবু দুই চোখ মুদে তখনো মাঠে গড়াতে গড়াতে আরো দূরে পালিয়ে যাচ্ছেন। মাণিক তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে দু'হাতে চেপে ধরে বললেন, 'থামুন, থামুন! আর গড়াবেন না সুন্দরবাবু! ভীমাবতার পটল তুলেছে।'

অন্ধকার-মূর্তিটা যেখানে ভূতলশায়ী হয়েছে জয়ন্ত সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, কিন্তু বিমল বাধা দিয়ে বললো, 'এখনি ওদিকে যাবেন না, জয়ন্তবাবু। হয়তো এখনো ও মরেনি, কাছে গেলে মরণ কামড় দিতে পারে।'

— 'কিন্তু ও কে?'

— 'ওরাং ওটাং।'

— 'ওরাং ওটাং? কি করে জানলেন আপনি?'

— 'বিষ্ণুবাবুর গলিতে ওর ঘর থেকে আমি কয়েকগাছা লালচে-তামাটে রংয়ের চুল আবিষ্কার করেছি। সে চুল ওরাং ওটাংয়ের।'

— 'আশ্চর্য! বোর্ণিও-সুমাত্রা দ্বীপের বনমানুষ বাংলাদেশে এলো কেমন করে?'

— 'সেকথা আমরা সত্য চৌধুরীর মুখেই শুনতে পাবো। তবে এইটুকু জানি, বাচ্চা অবস্থায় ধরলে ওরাং ওটাং মানুষের পোষ মানে। সত্য চৌধুরী নিশ্চয়ই ওকে অনেক দিন ধরে পোষ মানিয়েছে, ওকে নরহত্যা করতে শিখিয়েছে।'

— 'কিন্তু বিমলবাবু, এখনো কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

বিমল হেসে বললো, 'যথাসময়েই সে-সব কথা সুন্দরবাবুর মুখেই শুনতে পাবেন। আপাততঃ; খালি এইটুকু জেনে রাখবেন যে, ফ্রেজারগঞ্জে আমরা গিয়েছিলাম সত্য চৌধুরীকে ধরতে। তার বাসা ঘেরাও করেছিলাম। কিন্তু সে ভয়ানক লোক। আমাদের তিনজন সেপাইকে গায়ের জোরে কাবু করে পালিয়ে গিয়ে মোটর-বোটে চড়ে এই দ্বীপের দিকে আসে, আর আমরাও তার পেছনে লঞ্চ নিয়ে তাড়া করে এসে উঠেছি এই দ্বীপে। ভাগ্যি ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি, নইলে কি হতো বলা যায় না।'

জয়ন্ত অভিভূতের মতো বিমলের হাত চেপে ধরে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললো, 'আপনারা আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন। আর তিন চার মিনিট দেরি হলে আমরা মারা পড়তাম।'

বিমল বললো, 'সাধুর জীবন রক্ষার ভার নেন স্বয়ং ভগবান, আমরা নিমিত্ত মাত্র।'

এতোক্ষণ পরে সুন্দরবাবুর হাঁফ কমলো। বিমলের দিকে অভিমান ভরা চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনারা বেশ লোক যাহোক! গহন বনে যমের মুখে আমাকে পেছনে ফেলে আপনারা কিনা অনায়াসে চলে এলেন?'

মাণিক সহাস্যে বললো, 'ভুল বলবেন না সুন্দরবাবু। ওঁরা তো

আপনাকে পেছনে ফেলেন নি, আপনাকে পেছনে ফেলেছে আপনারই আশ্রিত ঐ বিপর্যয় ভুঁড়ি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, মাণিক! এই কি তোমার ঠাট্টার সময়? জানো, তোমাদের বাঁচাতে এসেই আমি মরতে বসেছিলাম? এর পরেও আমার ভুঁড়ির ওপরে নজর দিচ্ছো? অকৃতজ্ঞ!'

এমন সময়ে হঠাৎ চারিদিকের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে দূরে একখানা মোটর বোটের শব্দ জেগে উঠলো।

সুন্দরবাবু চমকে বললেন, 'ও আবার কি?'

জয়ন্ত ব্যস্তভাবে বললো, 'পশুপতি সদলবলে পলায়ন করছে! কিন্তু তাদের পালাতে দেওয়া হবে না। বিমলবাবু চলুন, আমরা জনকয় সেপাই নিয়ে লঞ্চে উঠে ওদের গ্রেপ্তার করি। সুন্দরবাবু বাকি লোক জন নিয়ে এখানে পাহারা দিন, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত।'

সুন্দরবাবু একবার ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারের দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে দেখলেন, তারপরে দৃঢ়স্বরে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। কারণ আমি হচ্ছি এ দলের মধ্যে সুপিরিয়র অফিসার— সব দায়-দায়িত্ব আমার।···মনোহর!'

মনোহর এগিয়ে এসে বললো, 'আজ্ঞে, স্যর।'

— 'এক ডজন সেপাই নিয়ে তুমি এখানে পাহারা দাও।'

মনোহর কাঁচু মাচু মুখে বললো, 'আজ্ঞে স্যর, সেটা কি ঠিক হবে স্যর?'

— 'ছিঃ মনোহর, ভয় পেওনা। ডিউটি ইজ ডিউটি! আমরা দূরাত্মা সত্য চৌধুরীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। তবে আর ভয়টা কিসের?'

— 'আজ্ঞে, স্যর, ভরসাও তো কিছু দেখছি না। এ রাক্ষুসে দলে যদি আরো দু'-তিনটে ওরাং ওটাং থাকে স্যর?'

— 'তোমাদের বন্দুক আছে। তাদের বন্দী করো। বধ করো। তাও না পারো— পলায়ন করো।'

— 'স্যর, স্যর! পালিয়ে কোথায় যাবো স্যর? এটা যে দ্বীপ স্যর! চারিদিকেই লোনা জল!'

— 'সাঁতার কেটে পালিও।'

— 'আজ্ঞে স্যর! সাঁতার স্যর?'

— 'হুম্!'

সুন্দরবাবু এমন জোরে 'হুম্' বলে গর্জ্জন করলেন যে, বেশ বোঝা গেলো, এটা হচ্ছে তাঁর চরম হুম্। মনোহর আর 'আজ্ঞে স্যর' বলতে ভরসা করলো না।

যে ঘটনার কথা বলবো, সেটা কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, এটা বিশ্বাস করবার মতো কথাও নয়। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরে বসে এমন ঘটনার ধারণা করাও অসম্ভব।

যদিও কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র দিলীপকুমার সেন এই ঘটনার আগাগোড়াই লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, এবং তার সাক্ষীরও অভাব নেই, তবু সমস্ত রহস্যই যে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। যেসব ঘটনা অলৌকিক, পার্থিব জগতে তাদের অস্বাভাবিকতার যুক্তিসঙ্গত কারণ আবিষ্কার করা সহজ নয়! আমরাও সে-চেষ্টা করবো না, কেবল সোজা কথায় সমস্ত ব্যাপারটা পাঠকদের কাছে বর্ণনা করবো। যাঁদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে না হয় তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই।

দিলীপ আজ চার-বছর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-জীবন যাপন করছে। সে নির্জনতা ভালোবাসতো বলে টালিগঞ্জের এমন এক জায়গায় বাসা নিয়েছিলো যেখানে লোকালয় কম, মাঠ-ময়দান ও গাছপালাই বেশি। টালিগঞ্জ ট্রাম-ডিপোর পেছন দিয়ে যে-সুদীর্ঘ

রাস্তাটি সোজা গড়িয়াহাটার দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে, দিলীপের বাসাবাড়িটি ছিলো তারই এক ধারে। তার পড়বার ঘরে বসে চারিদিকে তাকালে দেখা যায় কেবল সুনীল আকাশ, সবুজ মাঠ আর দূরে ও কাছে বন-জঙ্গলের জীবন্ত ছবি। কোথাও কোনো গোলমাল নেই, মাঝে মাঝে কেবল দ্রুতগামী মোটরের কর্কশ চিৎকার আশ-পাশের মৌনব্রত ভাঙবার অল্প-স্বল্প চেষ্টা করে।

কিন্তু বাসাবাড়িতে দিলীপ খালি একলাই থাকতো না। এক-তলাটি ছিলো দিলীপের এবং দোতলায় বাস করতো ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী নামে আর একটি যুবক। তার সঙ্গে এখনো দিলীপের ভালো করে পরিচয় হয়নি, কারণ ভৈরব অল্পদিনই এই বাসায় এসে উঠেছে।

একদিন সকালে কতকগুলো মড়ার হাড় ও মোটা মোটা ডাক্তারি কেতাবের মাঝখানে বসে দিলীপ নিজের মনেই পড়াশুনা করছে, এমন সময়ে তার দুই বন্ধু প্রতাপ ও অবনী এসে হাজির। এদেরও দু'জনের বাড়ি ছিলো টালিগঞ্জেই এবং তারা প্রায়ই দিলীপের সঙ্গে গল্প করতে আসতো।

বই থেকে মুখ তুলে দিলীপ শুধোলো, 'কিহে, সকাল বেলায় কি মনে করে?'

প্রতাপ একখানা চেয়ারের ওপরে বসে পড়ে বললো, 'আমি এসেছি তোমার সঙ্গে গল্প করতে, আর অবনী এসেছে তার হবু ভগ্নীপতির সঙ্গে দেখা করতে।'

দিলীপ একটু আশ্চর্য হয়ে বললো, 'আমার বাড়িতে অবনীর হবু-ভগ্নীপতি! তার মানে?'

— 'তোমার বাসায় যে ভৈরবচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে, তারই সঙ্গে অবনীর বোনের বিয়ের কথা হচ্ছে যে !'

— 'বটে, তা তো আমি জানতাম না ! ভৈরববাবু তাহলে একটি ভালো পাত্র, বিয়ের বাজারে তাঁর দাম আছে !'

অবনী হাসতে হাসতে বললো, 'ঘটকেরা তো তাই বলছে, কিন্তু প্রতাপ তা স্বীকার করে না।'

— 'কেন ?'

প্রতাপ বললো, 'ভৈরবকে আমি কিছু-কিছু চিনি। তার নাম বা স্বভাব কিছুই মিষ্ট নয়।'

দিলীপ বললো, 'ভৈরববাবুর কথা আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে তোমার আপত্তির কারণ কি ?'

— 'ভৈরব হচ্ছে ভবঘুরে। তার বয়স তিরিশের বেশি নয়, কিন্তু এই বয়সেই সে মিশর, আরব, পারস্য, চীন আর জাপান প্রভৃতি দেশ ঘুরে এসেছে।'

— 'দেশভ্রমণ কি দোষের বিষয় ?'

— 'না। লোকে নানান্ উদ্দেশ্যে দেশ-ভ্রমণ করে। কিন্তু ভৈরব যে কিসের খোঁজে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায় তা শিবের বাবাও জানেন না। তার দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সন্দেহজনক। সে যে-দেশেই গিয়েছে সেইখান থেকেই নানান সব সেকেলে জিনিস সংগ্রহ করে এনেছে। তার মতন একেলে ছেলের অতো সেকেলে জিনিস সংগ্রহ করবার ঝোঁক কেন, তারও খবর কেউ রাখেনা। এ-সব রহস্য আমি পছন্দ করি না !'

দিলীপ সকৌতুকে হেসে উঠে বললো, 'তুমি দেখছি অকারণেই ভৈরববাবুর ওপর খাপ্পা হয়েছো ! ভৈরববাবুর সেকেলে জিনিস সংগ্রহ

করবার বাতিক থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে আমি তো কিছু অন্যায় দেখছি না।'

প্রতাপ বললো, 'তাহলে তার স্বভাবের একটু পরিচয় দিই; শোনো। নন্দলালকে তুমি চেনো তো, সেও মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। এই পরশুদিনই নন্দলালের সঙ্গে ভৈরবের রীতিমতো একটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে।'

— 'কি রকম, কি রকম?'

— 'তোমার মনে আছে বোধ হয়, পরশু সকালে কি-রকম বর্ষা নেমেছিলো? সেই সময় টালিগঞ্জের একটা সরু গলির ভেতর দিয়ে ভৈরব কোথায় যাচ্ছিলো। পথের ওদিক দিয়ে মাথায় কি একটা মস্ত-বড়ো শাক-সব্জীর ঝুড়ি নিয়ে এক বুড়ি আসছিলো বাজারের পানে। বদ্‌মাইস ভৈরবটা কি করলো, জানো? সেই বুড়ি বেচারিকে এমন এক ধাক্কা মেরে এগিয়ে গেলো যে, ঝুড়ি-সুদ্ধ বুড়ি পড়লো গিয়ে পাশের এক খানার ভেতরে মুখ গুঁজড়ে। দৈবক্রমে নন্দলালও ঠিক সেই সময়েই সেখানে এসে পড়ে। ভৈরবের নিষ্ঠুরতা দেখে নন্দলাল একেবারেই ক্ষেপে গেলো। সে তখনি ভৈরবকে রীতিমতো উত্তম-মধ্যম দিতে কসুর করলো না। তারপর থেকে ভৈরবের সঙ্গে নন্দলালের কথা বন্ধ হয়েছে। এখন বলো দেখি, এরপরেও কি আর ভৈরবের ওপরে কারোর শ্রদ্ধা থাকতে পারে? এই লোকের সঙ্গেই অবনী দিতে চায় তার বোনের বিয়ে! আশ্চর্য!'

অবনী অপ্রতিভ স্বরে বললো, 'কি করবো ভাই, বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কি কথা-কওয়া উচিত? ভৈরব নাকি ধনীর ছেলে,

তার ওপরে গ্র্যাজুয়েট! বাবার মতে এমন পাত্র নাকি হাত-ছাড়া করতে নেই! আমি আজ পাকা-দেখার দিন স্থির করতে এসেছি।'

প্রতাপ বললো, 'তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি ভৈরবচন্দ্রের চন্দ্রমুখ দর্শন করে এসো। ততোক্ষণে আমি দিলীপের ষ্টোভ জ্বেলে একটু চা-তৈরির চেষ্টা করি।'

দিলীপ আবার একটা মড়ার মাথার খুলি টেনে নিয়ে বললো, 'দেখো ভাই অবনী, বিয়ের পরে তোমার বোন সুখী হবেন কিনা জানি না, কিন্তু বিয়ের দিনে যেন আমরা লুচি-মণ্ডা থেকে বঞ্চিত না হই।'

চা পান করে প্রতাপ চলে গেলে পর দিলীপ আবার ভালো করে পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করছে, এমন সময় হঠাৎ বিষম তোড়ে বৃষ্টি নামলো। টালিগঞ্জের সেই নির্জন ও অন্ধকার মাঠের শূন্যতা বৃষ্টি ও ঝড়ের কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠলো। দিলীপ উঠে জানলাগুলো বন্ধ করে ঘরের দরজাটাও বন্ধ করতে যাচ্ছে, এমন সময় অবনী নিচে নেমে ব্যস্ত হয়ে বললো, 'দরজা বন্ধ করছো কি হে, এই বৃষ্টিতে আমি যাবো কোথায় ?'

দিলীপ বললো, 'কে তোমায় যেতে বলেছে ? ঘরের ভেতরে এসো। ইজি-চেয়ারে শুয়ে চুপ করে বৃষ্টির গান শোনো, আর আমি নিজের মনে লেখাপড়া করি।'

অবনী ঘরে ঢুকে ইজি-চেয়ারে বসে পড়ে বললো, 'এই বাদলায় রাখো তোমার লেখাপড়া ! এসো খানিকটা গল্প-গুজব করা যাক।'

দিলীপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বই মুড়ে বললো, 'আজ যখন তোমাদের দুই শনি-অবতার আবির্ভাব হয়েছে, তখন আমার লেখাপড়া যে হবে না সেটা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম ! বেশ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক !'

বাইরে পড়তে লাগলো বৃষ্টি, আর ভেতরে চলতে লাগলো দুই-বন্ধুর গল্প। একঘণ্টা পরেও বাইরের বৃষ্টি ও ভেতরের গল্প থামবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না।

ঘরের ঘড়িতে টুংটুং করে যখন এগারোটা বেজে গেলো, অবনীর তখন খেয়াল হলো যে, তাকে আজ বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু জানলার ওপরে তখনও ঝোড়ো-হাওয়ার ধাক্কার সঙ্গে বৃষ্টি পড়ার অশ্রান্ত শব্দ হচ্ছে।

দিলীপ বললো, 'অবু, আজ বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যাও। এখান থেকে বেরোলে তোমাকে সাঁতার কাটতে হবে।'

অবনী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তাই সই। বাবা আমার অপেক্ষায় বসে আছেন, সব কথা শোনবার জন্যে। চললাম।' সে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুললো।

— সঙ্গে-সঙ্গে সেই বৃষ্টি ও ঝড়ের শব্দের ভেতরেই বাইরে থেকে ভেসে এলো ভীত আর্ত চিৎকার! অবনী চম্‌কে ফিরে দাঁড়ালো।

দিলীপও লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বিস্মিত-কণ্ঠে বললো, 'কে, চিৎকার করলে ?'

দুই বন্ধুই দরজার কাছে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আগেই বলেছি, দিলীপের বাসা যে-জায়গায় তার কাছে কোনো লোকালয় নেই। এই ঝড়-জলে পথেও কোনো লোক থাকবার কথা নয়। এখানে কে চিৎকার করবে ?

অবনী ভয়ে ভয়ে বললো, 'অন্ধকারে পথে কেউ মোটর-চাপা পড়লো নাকি ?'

দিলীপ ঘাড় নেড়ে বললো, 'পাগল! পথ এখন জলের তলায়, সেখানে মোটর চালাবার সাহস কারোর হবে না।'

আবার শোনা গেলো— কেউ যেন দারুণ আতঙ্কে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আর্তনাদের পর আর্তনাদ করছে! এবারে বেশ বোঝা গেলো, শব্দটা আসছে দিলীপের বাসার ওপরতলা থেকেই।

অবনী কম্পিত স্বরে বললো, 'এ যে ভৈরববাবুর গলা! তিনি তো ঘরে একলা আছেন! কী দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন?'

দিলীপ কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে বললো, 'সেটা জানতে হলে আমাদেরও ওপরে যেতে হয়।'

অবনী বললো, 'তাহলে আমিই ওপরে যাই, তুমি এইখানে দাঁড়াও। ভৈরববাবু তাঁর ঘরে বাইরের লোক আসা পছন্দ করেন না!'

— 'পছন্দ করেন না! কেন?'

— 'তাঁর ঘরের সাজসজ্জা অদ্ভুত। বাইরের লোক সে সব দেখলে কেবল অবাকই হবে না, ভয় পেতেও পারে, তাঁকে পাগলও ভাবতে পারে!' বলেই অবনী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো।

দিলীপ সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে, বিস্মিত মনে অবনীর কথাগুলো ভাবতে ভাবতে শুনতে লাগলো, ভৈরবের বদ্ধকণ্ঠের অস্ফুট কাতরানি।

তারপরই শোনা গেলো ওপর থেকে অবনীর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর—
— 'দিলীপ, দিলীপ! শীগ্‌গির ওপরে এসো। ভৈরববাবু মরো-মরো হয়েছেন!'

দিলীপ তিন-চার লাফে দোতলার সিঁড়িগুলো পার হয়ে ভৈরবের ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালো। খোলা দরজা দিয়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোকে ঘরের ভেতরটা স্পষ্টরূপে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ঘর দেখে সত্যি-সত্যিই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেলো! এমন দৃশ্য সে জীবনে আর-কখনো দেখেনি!

পণ্ডিতরা প্রাচীন মিশরের মাটি খুঁড়ে অতীতের সমাধি-মন্দির প্রভৃতি থেকে যে-সব অদ্ভুত মূর্তি আবিষ্কার করেছেন, দিলীপ অনেক কেতাবে তাদের অসংখ্য ছবি দেখেছে। ঘরের দেওয়ালের সামনে

দাঁড় করানো রয়েছে সেই রকম অনেকগুলো ছোটো-বড়ো কাঠের মূর্তি! মূর্তিগুলোর চেহারা মানুষের মতোই, কিন্তু তাদের কারোর মাথা ষাঁড়ের মতো, কারোর মাথা সারস পাখির মতো, কারোর বা বিড়াল কি প্যাঁচার মতো! এরাই ছিলো প্রাচীন মিশরের দেব-দেবী! ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে একটা কুমীরের মৃতদেহ— দিলীপ জানতো, কুমীরও ছিলো প্রাচীন মিশরীদের কাছে দেবতা-স্থানীয়।

ঘরের মাঝখানে একটা বড়ো টেবিলের ওপরে প্রাচীন মিশরের একটা কফিন্ বা 'মমি'র বাক্স, তার ডালা খোলা। এবং তারই ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মিশরী 'মমি' বা মানুষের সুরক্ষিত মৃতদেহ!

কলকাতার যাদুঘরে দিলীপ একটা 'মমি' দেখেছিলো। সেটা হচ্ছে কয়েক হাজার বছর আগেকার একটি মিশরীয় নারীর মৃতদেহ! সে মড়াটার দেহ কলকাতার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এসে শীগ্‌গিরই জীর্ণ হয়ে পড়েছে, তাই আগে সেটা দাঁড় করানো ছিলো বটে, কিন্তু এখন তাকে শুইয়ে রাখতে হয়েছে। যাদুঘরের ঐ 'মমি'টা হচ্ছে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, তার দেহের নানান জায়গা খসে পড়েছে, কিন্তু আজ সে চোখের সামনে প্রাচীন মানুষের যে সুরক্ষিত দেহটা দেখলে, এটা পুরুষের দেহ, আর এমন পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্তের মতো দেখতে যে তাকে মৃতদেহ বলে কল্পনা করাও অসম্ভব! যদিও হাজার হাজার বছরের মহিমায় তার গায়ের রং অস্বাভাবিকরূপে কালো হয়ে গিয়েছে, তার সমস্ত শরীর রীতিমতো অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছে, তবু তার শুকনো, বীভৎস মুখের দিকে তাকালে মন এক অপার্থিব ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

'মমি'টার ঠিক পায়ের তলাতেই ঘরের মেঝের ওপরে লম্বা হয়ে

পড়ে রয়েছে ভৈরবচন্দ্রের দেহ এবং তার হাতে রয়েছে কোষ্ঠি-ঠিকুজির মতো পাকানো একখানা আধ-খোলা লম্বা কাগজ। দিলীপ বুঝলো, সেখানা হচ্ছে প্রাচীন মিশরের 'প্যাপিরাস্' পাতার পুঁথি!

অবনী কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো, 'ভৈরববাবু বোধ হয় বাঁচবেন না!'

দিলীপ হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, এতো সহজে কাতর হবার পাত্র নয়। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে ভৈরবের পাশে গিয়ে বসে পড়লো এবং তার দেহটা পরীক্ষা করে বললো, 'ভয় নেই অবনী, ভৈরববাবু কেবল অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তুমি এগিয়ে এসে এঁর পা দুটো ধরো, মাথার দিক আমি ধরছি। এখন চলো এঁকে ঐ সোফার ওপরে শুইয়ে দিতে হবে। জলের কুঁজোটা নিয়ে এসো, ভৈরববাবুর মুখে আর বুকে জলের ঝাপটা দাও।......কিন্তু এর এমন দশা হলো কেন?'

অবনী বললো, 'জানি না। ঘরে এসে ওঁকে আমি ঐ অবস্থাতেই দেখেছি।'

দিলীপ ভৈরবের বুকের ওপর হাত রেখে বললো, 'এঁর বুক যেন হাপরের মতন উঠছে নামছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ভয়ানক কিছু দেখেই ইনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন।'

অবনী বললো, 'তাহলে হয়তো যতো নষ্টের গোড়া ঐ 'মমি'টা!'

— 'মমি? কি-রকম?'

— 'ঐ কতো হাজার বছরের পুরোনো মড়া দেখলে কার না ভয় হয়? জ্যান্ত মানুষের পক্ষে এ-সব ভূতুড়ে ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা ভালো নয়। কিছুকাল আগে আর একবারও এঁকে আমি এই অবস্থায় দেখেছিলাম। সেদিনও ইনি ঐ ভূতুড়ে মূর্তিটার পায়ের তলায় এমনিভাবেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন!'

— 'মমি'টাকে নিয়ে ইনি কি করতে চান ?'

— 'কে জানে। ভৈরববাবুর মাথায় বোধ হয় ছিট্ আছে। এই-সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করাই হচ্ছে ওঁর বাতিক। আমি কতো মানা করি— বলি, জীবন্তের সঙ্গে মৃতের সম্পর্ক রাখা ভালোও নয় উচিতও নয়! শুনে উনি হাসেন, বলেন, এ-হচ্ছে আমার শব-সাধনা!'

— 'চুপ! রোগীর জ্ঞান ফিরে আসছে।'

ভৈরবের মুখ এতোক্ষণ শাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিলো, এইবারে তার ওপরে একটু একটু করে রঙের আভাস ফুটে উঠছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসও ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এলো। খানিক পরে সে চোখ খুলে ঘরের এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলো। হঠাৎ তার চোখ পড়লো 'মমি'র দিকে, সঙ্গে-সঙ্গে সে উঠে বসলো এবং তার পরেই এক লাফে এগিয়ে গিয়ে পাকানো 'প্যাপিরাস্' কাগজের সেই পুঁথিখানা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের একটা টানার ভেতরে পুরে ফেললো। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'আমার ঘরে বাইরের লোক কেন? আপনাদের কি দরকার?'

অবনী আহত স্বরে বললো, 'দরকার আমাদের কিছুই নেই! আপনি চিৎকার করে কাঁদছিলেন, তাই শুনে আমরা এসেছি সাহায্য করতে।'

ভৈরব অপ্রতিভ স্বরে বললো, 'এই যে, দিলীপবাবু! আমার এখন মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলে ফেলেছি, আপনারা আমাকে মাফ্ করবেন। ভাগ্যিস্ আপনারা এসেছিলেন, নইলে কি যে হতো, জানি না! ওঃ, আমি কি নির্বোধ, আমি কি নির্বোধ!' — বলতে বলতে আবার সোফার ওপরে গিয়ে বসে পড়ে দুই হাতের ভেতরে মুখ ঢেকে ফেললো।

অবনী ভৈরবের কাছে গিয়ে তার মাথার ওপরে হাত রেখে বললো, 'ভৈরববাবু, আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন! নিশুতি রাতে 'মমি' নিয়ে নাড়াচাড়া করা মানুষের উচিত নয়। কিসে কি হয়, বলা যায় না।'

ভৈরব মুখ তুলে মৃদুস্বরে বললো, 'অবনীবাবু, আমি যা দেখেছি, তা যদি আপনিও দেখতেন, তাহলে এতোক্ষণে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যেতেন।'

— 'কী দেখেছেন আপনি ?'

ভৈরব হঠাৎ গলার স্বর বদলে বললো, 'না, এমন কিছু নয়। আমি বলছি কি, তুপুর রাতে 'মমি'র সঙ্গে থাকতে হলে অনেকেরই সাহসে কুলোবে না!……একি, আপনারা চলে যাচ্ছেন নাকি ? না, না, এখনি যাবেন না, আর একটু বসুন!'

অবনী বললো, 'ঘরের ভেতরে এ কিসের গন্ধ ? দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।'

টেবিলের ওপরের একটা পাত্র থেকে শুকনো পাতার মতো কি-কতকগুলো তুলে নিয়ে একটা জ্বলন্ত ধুনুচির ভেতরে নিক্ষেপ করে ভৈরব বললো, 'এ হচ্ছে মিশরী পুরুতদের পবিত্র ধুনো।…আচ্ছা অবনীবাবু, আমি কতোক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম ?'

— 'বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পাঁচ-ছয়।'

ভৈরব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, 'অচেতন হচ্ছে এক অদ্ভুত জিনিস! অচেতনতার মধ্যে সময়ের মাপ নেই। অজ্ঞান হয়ে থাকলে কেউ বুঝতে পারে না তার অসাড়তার ভেতর দিয়ে কয়েক মুহূর্ত কি কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে! টেবিলের ওপরে ঐ যে মৃত মানুষটিকে দেখছেন, প্রাচীন মিশরে ও বেঁচে ছিলো চার হাজার বছর

আগে! কিন্তু ওকে যদি এখনি জাগাতে পারা যায়, ও হয়তো বলবে, মিনিট-খানেক আগেই ও বেঁচে ছিলো! দিলীপবাবু, এই 'মমি'টা খুব চমৎকার, নয়?'

পচা-মড়া কাটাই হচ্ছে দিলীপের ব্যবসা। নরদেহের নাড়ি-নক্ষত্র তার জানা আছে। 'মমি'টার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে তাকে ভালো করে আবার দেখতে লাগলো। তার দেহের মাংস শুকিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব নেই। হাড়ের ওপরে চামড়া এখনো 'টাইট্' হয়ে চেপে আছে, দুই কানের ওপরে রুক্ষ ঝাঁকড়া চুলগুলো এখনো ঝুলে রয়েছে। কোটরের ভেতরে বাদামের মতন দুটো তীক্ষ্ণ চোখ এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভৈরব উঠে দাঁড়িয়ে 'মমি'র কপালের কোঁচ্‌কানো চামড়ার ওপরে হাত রেখে বললো, 'এই প্রাচীন ভদ্রলোকের নাম আমি জানি না। এঁকে আমি কিনেছিলাম একটা নিলাম থেকে।'

দিলীপ বললো, 'জ্যান্ত অবস্থায় লোকটি বোধহয় খুব জোয়ান ছিলো।'

— 'খালি জোয়ান নয়, অতিকায়। মাথায় এই লোকটি ছয় ফুট সাত ইঞ্চি উঁচু! এর হাড়গুলো কি-রকম চওড়া দেখুন। এ যদি এখন জ্যান্ত হয়ে ওঠে, তাহলে গায়ের জোরে আমরা কেউই এর সঙ্গে যুঝতে পারবো না।'

ভৈরব বেশ সহজভাবেই কথা কইবার চেষ্টা করছিলো বটে, কিন্তু দিলীপ স্পষ্ট বুঝতে পারলো, তার মনের ভেতরটা এখনো ভয়ে থম্‌-থম্ করছে। তার হাত কাঁপছে, তার ঠোঁট কাঁপছে এবং তার চোখের দৃষ্টি থেকে থেকে কেবলই সেই 'মমি'টার মুখের দিকে ফিরে যাচ্ছে। তবু তার ভয়ের ভেতর থেকেও যেন একটা আনন্দের

আভাসও ফুটে উঠছে। বিষম বিপদের মধ্যেও সে আবিষ্কার করেছে যেন কোনো সফলতার কারণ। দিলীপকে দরজার দিকে অগ্রসর হতে দেখে ভৈরব বললো, 'আপনি কি এখনি যাবেন? আর একটু থাকবেন না?'

দিলীপ বললো, 'আর থাকা অসম্ভব। আমার পড়া এখনো শেষ হয়নি।'

— 'অবনীবাবু, আপনি?'

— 'আমিও আর থাকতে পারবো না, রাত অনেক হলো।'

জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভৈরব বললো, 'আচ্ছা, চলুন অবনীবাবু, আপনাকে খানিক এগিয়ে দিয়ে আসি।'

দিলীপ বুঝলো, ভৈরব এখন এ-ঘরে একলা থাকতে রাজি নয়। কিন্তু কেন? নিজের ঘরে তার ভয় কিসের?

তারপর থেকেই দিলীপের সঙ্গে ভৈরব রীতিমতো মাখামাখি শুরু করে দিলো। যদিও দিলীপ মিশুকে লোক ছিলো না, এবং ভৈরবের কর্কশ স্বভাব তার বিশেষ ভালো লাগতো না, তবু সাধারণ ভদ্রতার অনুরোধে ভৈরবের সঙ্গে অল্প-বিস্তর মেলামেশা করতেই হলো। ভৈরব প্রায়ই তার কাছ থেকে নানা শ্রেণীর বই পড়বার জন্যে নিয়ে যেতো এবং সেও মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে ভালো ভালো বই চেয়ে আনতো।

এইভাবে দিন-কয়েক পরে পরিচয় কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ হলে দিলীপ বুঝলো যে, নানা বিষয়ে ভৈরব হচ্ছে অসাধারণ পণ্ডিত। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দিলীপ তার কাছে প্রায় শিশু। প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তার চেয়ে বিশেষজ্ঞ লোক বোধহয় সারা ভারতবর্ষে নেই।

দিলীপ একদিন কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলো, 'আচ্ছা ভৈরববাবু, প্রাচীন মিশরীরা মড়াকে 'মমি' করে কবর দিতো কেন?'

ভৈরব বললো, 'প্রাচীন মিশরের বিশ্বাস ছিলো, আত্মা অমর। পৃথিবীর মৃত্যুর পরে আর অনন্ত জীবন আরম্ভ হবার আগে দেহ ছেড়ে আত্মা কিছুকাল আলাদা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তারপর আবার পার্থিব দেহের ভেতরেই ফিরে আসে। আত্মা আর দেহের এই পুনর্মিলনের আগেই নশ্বর দেহ পাছে নষ্ট হয়ে যায়, সেই ভয়ে মিশরীরা নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহকে চিরস্থায়ী করে রাখবার চেষ্টা

করতো। তারা দেহকে কফিনে পুরে কেবল গোর দিয়েই নিশ্চিন্ত হতো না, আত্মা যে-দিন আবার দেহের ভেতরে ফিরে আসবে, তখন তার জীবনযাত্রা-নির্বাহের জন্মে কবরের ভেতরে খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড়, খাট-বিছানা, তৈজসপত্র প্রভৃতি যা-কিছু দরকার সবই রেখে দিতো। রাজা-রাজড়া আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু হলে তাঁদের দাস-দাসীদেরও দেহের সঙ্গে কবরে যেতে হতো, অর্থাৎ তাদের হত্যা করে দেহগুলো কবরে পাঠানো হতো— যাতে করে দেহের ভেতরে ফিরে এসে রাজার আত্মা লোকাভাবে কষ্ট না পায়।'

— 'ভৈরববাবু, আপনি কি এই বিশ্বাস সত্যি বলে মনে করেন?'

— 'আমি সত্যি বলে ভাবি কিনা, সে-কথা শুনে কি হবে? তবে প্রাচীন মিশরের পুরুতরা যে মমিকে বাঁচিয়ে তোলবার মন্ত্র জানতো, এটা হয়তো মিথ্যা নয়।'

— 'সে মন্ত্র এখন আর কেউ জানে না?'

— 'প্রাচীন মিশরে যে অদ্ভুত মানুষরা বাস করতো তাদের কেউ আর বেঁচে নেই, 'মমি' রূপে নষ্ট হয় নি কেবল তাদের দেহগুলো। তবে পুরোনো প্যাপিরাস-পাতার গুটোনো পুঁথিতে মড়া-জাগানো মন্ত্র-তন্ত্র এখনো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে-রকম পুঁথি এখন অত্যন্ত দুর্লভ।'

— 'আপনি প্রাচীন মিশরের ভাষা জানেন?'

— 'জানি'।

— 'তাদের মড়া-জাগানো মন্ত্র আপনি কখনো পড়েছেন?'

— 'আমি? না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি'— বলেই ভৈরব অন্য প্রসঙ্গ তুললো।

কিন্তু সে প্রসঙ্গটাও হচ্ছে মমির প্রসঙ্গ। সে বললো, 'প্রাচীন

মিশরের মানুষরা তাদের সভ্যতা আর অনেক গুপ্তকথা নিয়ে পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে বটে, মমিদের জ্যান্ত মানুষ করে তোলবার বিদ্যাও আজ কেউ জানে না বটে, কিন্তু মিশরের পুরোনো গোরস্থানের মধ্যে আজও যে দেহ-হীন আত্মারা জীবন্ত হয়ে আছে, মিশর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অনেক বিলিতি পণ্ডিত এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারেন না। বিলিতি সংবাদপত্রেও প্রায় পড়া যায়, কৌতূহলী সাহেব-ভ্রমণকারীরা মিশর থেকে মমি কিনে বিলাতে নিয়ে গিয়ে নানান অলৌকিক কাণ্ড দেখেছেন, আশ্চর্য সব বিপদে পড়েছেন! কবর থেকে বার করে আনলে মমি যে অভিশাপ বহন করে আসে, এ-কথা তো এখন চলতি বিলাতি প্রবাদের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে! যে-সব বিখ্যাত সাহেব-পণ্ডিত মাটি খুঁড়ে প্রাচীন মিশরের কবর ঘেঁটে তছ্‌নছ্‌ করেন, তাঁদের অনেকেই যে পরে নানা দৈব-দুর্ঘটনায় অপঘাতে মারা পড়েন, এ-কথাও সবাই জানে! এই-সব দেখে-শুনে স্বীকার করতে হয় যে, আজ আমরা যাদের মমি দেখি, তাদের আত্মা এখনো মরে নি, নিজেদের পার্থিব দেহকে এখনো তারা ভালোবাসে এবং সুযোগ পেলেই আবার সেই দেহে ফিরে আসতে চায়! আমরা হিন্দু, আমরাও প্রাচীন জাতি, আর আমরাও আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করি। দেহের প্রতি মমতা থাকলে পাছে আত্মা পৃথিবী ছাড়তে না চায়, হয়তো সেই ভয়েই হিন্দুদের শাস্ত্র বিধান দিয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে মৃতদেহকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে।'

সময়ে সময়ে দিলীপের মনে হতো, ভৈরবের মধ্যে উন্মাদ-রোগের পূর্বলক্ষণ দেখা দিয়েছে! একদিন কথা কইতে কইতে হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'মঙ্গল আর অমঙ্গলকে নিজের অধিকারে আনতে পারা— ওঃ সে কী সৌভাগ্য! স্বর্গের দেবতা আর নরকের

দানবকে যদি হাতের মুঠোয় পাই, তাহলে আমি পৃথিবী শাসন করতে পারি।'

আর একদিন সে বললো, 'অবনীর বোনকে আমি বিয়ে করবো বটে, কিন্তু অবনী কোনো কর্মেরই নয়! অবশ্য মানুষ হিসাবে অবনী ভালো লোক, কিন্তু যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, সে তার যথার্থ বন্ধু হতে পারবে না। সে আমার বন্ধু হবার যোগ্য নয়!'

আজ ক'দিন থেকে তাকে আবার একটা নতুন রোগে ধরেছে। দিলীপ নিচে থেকে প্রায়ই শুনতে পায়, ওপরের ঘরে একলা বসে ভৈরব নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কয়। গভীর রাতে দিলীপ পড়াশুনো করছে, ওপরের ঘরে বাইরের জনপ্রাণী নেই, অথচ চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে বেশ শোনা যায়, ভৈরব খুব মৃদু স্বরে— প্রায় ফিস্-ফিস্ করে আপন মনে কথাবার্তা কইছে!

তার এই অদ্ভুত অভ্যাসে বিরক্ত হয়ে দিলীপ একদিন বললো, 'ভৈরব বাবু, নিজের সঙ্গে নিজেই গল্প করতে কি আপনার খুব ভালো লাগে?'

ভৈরব চমকে উঠে বললো, 'আমি কি নিজের সঙ্গে গল্প করি? না, না, আপনি ভুল শুনেছেন!'

কিন্তু দিলীপ ভুল শোনে নি, শীঘ্রই সে-প্রমাণ পাওয়া গেলো। কেষ্ট হচ্ছে দিলীপের পুরানো চাকর। সে একদিন বললো, 'বাবু, একটা কথা জিগ্যেস করবো?'

— 'কি কথা?'

— 'ওপরের ঘরের ঐ বাবুটির মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?'

— 'কেন?'

— 'আমার তো তাই মনে হয়। ঘরে কেউ থাকে না, অথচ তিনি কথা বলেন কার সঙ্গে?'

— 'সে কথায়-তোমার দরকার কি, কেষ্ট ?'

— 'দরকার নেই বটে, কিন্তু এটা কি আশ্চয্যি নয় ? এর চেয়েও আশ্চয্যি কি জানেন ? বাবুটি যখন নিজের ঘরের দরজায় চাবি বন্ধ করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যান, তাঁর ঘরের ভেতরে মেঝের ওপরে ভারি ভারি পা ফেলে তখনো কে বেড়িয়ে বেড়ায় ! বাবু, এ-সব ভালো কথা নয়, আমার ভারি ভয় হয় !'

— 'কী বাজে বকছো !'

— 'বাজে নয় বাবু, আমি নিজের কানে শুনেছি ! কেবল ঘরের ভেতরে নয় বাবু, এক-একদিন বাইরেও পায়ের শব্দ শুনতে পাই। একদিন হলো কি, আমি উঠোনের কোণে আমার ঘরের সামনে বসে তামাক সাজছি। তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে, উঠোনের ওদিকটা অন্ধকার। বাসায় কেউ ছিলো না বলে সদর দরজায় খিল দিয়ে রেখেছি। হঠাৎ শুনলাম, সিঁড়ি দিয়ে কে নেমে আসছে ! বাসায় কেউ নেই, তবু সিঁড়ি দিয়ে কে নামে ! আমি শুধোলাম— 'কে যায় ?' সাড়া পেলাম না, কিন্তু উঠোনের যেখানটা অন্ধকার, সেখানে শুনলাম কার পায়ের শব্দ ! তারপরই ভুম্ করে সদরের খিল খুলে গেলো আর দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেলো ! এ কী কাণ্ড, বাবু !'

— 'কেষ্ট, ভৈরববাবু নিশ্চয়ই তোমার অজান্তে বাসায় ছিলেন, বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই !'

— 'তাহলে তিনি সাড়া দিলেন না কেন ?'

— 'সেটা তাঁর খুশি।'

— 'তাহলে আর একটা কথা বলি শুনুন ! ভৈরববাবুর খাবার আসে রোজ হোটেল থেকে, জানেন তো ? এতোদিন দু'বেলা একজনের জন্যেই খাবার আসতো, কিন্তু হোটেলের চাকরের মুখে শুনলাম,

আজকাল রোজ রাত্রে খাবার আসে দু'জনের জন্যে। ভৈরববাবু একলা, কিন্তু তাঁর ঘরে রাত্রে দু'জনের খাবার যায় কেন? সে খাবার কে খায়?'

— 'ভৈরববাবুই। হয়তো তাঁর খিদে বেশি, একজনের খাবারে কুলোয় না।'

— 'কিন্তু তাঁর খিদে কি রাত্রেই বাড়ে? সকালে তো দু'জনের খাবার আসে না? আর আগে তো তাঁর এমন রাক্ষুসে খিদে ছিলো না? হঠাৎ তাঁর রাতের খিদেই বা বাড়লো কেন? যখন থেকে এই আশ্চয্যি পায়ের শব্দ পাচ্ছি, তাঁর খিদে বেড়েছে তখন থেকেই!'

— 'কেষ্ট, তুমি একটি রাবিস!'

— 'বিশ্বাস করছেন না, কি আর বলবো!'— এই বলে কেষ্ট চলে গেলো।

দিলীপ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো— ভৈরব যখন ঘরে থাকে না, তখন কে সেখানে চলা-ফেরা করতে পারে? ভৈরব কি তার ঘরের ভেতরে অন্য কোনো লোককে লুকিয়ে রেখেছে? সে কে? আর লুকিয়েই বা থাকবে কেন? আজ কেষ্ট যে এই দু'জনের খাবারের কথা বললো, সেটাই বা কি ব্যাপার? যদি ধরি, ভৈরবের ঘরে কেউ লুকিয়ে আছে আর দু'জনের খাবার আসে সেই জন্যেই, তাহলে রোজ সকালেও দু'জনের খাবার আসে না কেন? সকালে সে কি উপোস করে থাকে?……এ-সবই যে ধাঁধার মতো গোলমেলে কাণ্ড! কেষ্টকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলাম বটে, কিন্তু আমাকেও যে ভাবিয়ে তুললো!

সে-রাত্রে ভৈরব নেমে এসে দিলীপের সঙ্গে গল্প করছিলো। কথা কইতে কইতে দিলীপ স্পষ্ট শুনতে পেলো, দোতলার ঘরের মেঝে কার পদশব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে—কে যেন ভারি ভারি পা ফেলে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে! তারপরেই দুম্ করে ওপরের দরজার আওয়াজ!

দিলীপ সচমকে বলে উঠলো, 'ভৈরববাবু, কে আপনার ঘরের দরজা খুললো, কি বন্ধ করলো!'

ভৈরব এক লাফে উঠে পড়ে একান্ত অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তার মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, সে যেন ভয়ও পেয়েছে এবং দিলীপের কথা বিশ্বাসও করতে পারছে না।

সে থেমে থেমে বললো, 'ঘরের দরজায় নিশ্চয়ই আমি তালা দিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। দরজা খোলা অসম্ভব!'

— 'শুনুন ভৈরববাবু, শুনুন! সিঁড়ির ওপরে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? কে যেন নিচে নেমে আসছে!'

ভৈরব বেগে বাইরে ছুটে গিয়ে দিলীপের দরজার পাল্লা দু'খানা চেপে বন্ধ করে দিলো এবং দ্রুতপদে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে তার পায়ের শব্দ হঠাৎ থেমে গেলো এবং তারপরে শোনা গেলো ফিস্ ফিস্ করে কথার আওয়াজ! ' খানিক পরে আবার দোতলা ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো, তারপর ভৈরব নিচেয় এসে ফের যখন দিলীপের ঘরে ঢুকলো, তখন তার কপাল বেয়ে নেমে আসছে ঘামের দর-দর ধারা!

অবসন্নের মতো চেয়ারের ওপরে বসে পড়ে ভৈরব হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'নাঃ সব ঠিক আছে! ঐ হতচ্ছাড়া কুকুরটার কাণ্ড আর কি!

সেই-ই দরজাটা খুলে ফেলেছিলো, আমি তালা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম কিনা।'

ভৈরবের বিকৃত মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দিলীপ বললো, 'আপনার যে আবার একটা কুকুর আছে, এ-খবর তো আমার জানা ছিলো না।'

— 'হ্যাঁ সবে পুষেছি। আবার তাড়িয়ে দেবো, জ্বালিয়ে মারলো!'

— 'আমিও কুকুর ভালোবাসি। একবার তাকে আনুন না, দেখবো।'

— 'বেশ তো, তবে আজ নয়। আজ আমার একটা জরুরি কাজ আছে, এখনি বাইরে যেতে হবে।'

ভৈরব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো। কিন্তু দিলীপ নিচে বসেই শুনতে পেলো, জরুরি কাজে বাইরে না গিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকেই ভেতর থেকে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলো!

দিলীপ মনে মনে খাপ্পা হয়ে উঠলো! ভৈরব তাহলে পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী! এমন কাঁচা মিথ্যাকথা কইলো যে, একটা শিশুকেও ফাঁকি দিতে পারবে না! ঘরে কুকুর আছে, না ছাই আছে! সিঁড়ির ওপরে এইমাত্র যে পায়ের শব্দ শোনা গেলো, কোনো কুকুরের পায়ের আওয়াজই সে-রকম হতে পারে না! দস্তুরমতো মানুষের পায়ের আওয়াজ। কেষ্ট তো ঠিক কথাই বলেছে! কিন্তু কে তার ঘরে লুকিয়ে আছে? কেন লুকিয়ে আছে? সে কি খুনে? চোর? পুলিশের ভয়ে এখানে এসে গা ঢাকা দিয়েছে? তাই কি ভৈরব মিথ্যা বললো? কিন্তু যে লোক পলাতক আসামীকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখে, তার সঙ্গে তো আর কোনো সম্পর্ক রাখাই উচিত নয়। শেষটা কি সেও পুলিশী মামলায় জড়িয়ে পড়বে?

মনে-মনে ভৈরবকে 'বয়কট্' করবার প্রতিজ্ঞা করে, দিলীপ 'অ্যানাটমি'র একখানা মস্ত বই টেনে নিয়ে পড়তে বসলো। কিন্তু খানিক পরেই আবার পড়ায় বাধা পড়লো।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে, ঘরের মধ্যে প্রতাপের আবির্ভাব হয়েছে।

তার পাশে বসে পড়ে প্রতাপ বললো, 'দিলীপ, তুমি একটি আস্ত গ্রন্থকীট! দিন রাত খালি পড়া আর পড়া আর পড়া! এদিকে পরশু আমাদের ইলিয়ট শীল্ডের খেলা, সে কথা কি তোমার মনে নেই?'

— 'টিমে কি আমি আছি?'

— 'নিশ্চয়! 'সিলেক্‌শন' হয়ে গেছে আজই। তুমি খেলবে রাইট লাইনে। কাল মাঠে গিয়ে 'প্র্যাকটিস' করে এসো।'

— 'যাবো। কিন্তু আজ বিদায় হও দেখি, আমাকে পড়তে দাও। আর কোনো খবর নেই তো?'

— 'একটা খবর আছে। তোমাকে সেদিন নন্দলাল আর ভৈরবের ঝগড়ার কথা বলেছিলাম, মনে আছে তো? কাল নন্দলাল বিষম বিপদে পড়েছিলো।'

— 'কি বিপদ?'

— 'নন্দলাল কাল মাঠের রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরছিলো, এমন সময়ে হঠাৎ কে তাকে আক্রমণ করে!'

— 'কে আক্রমণ করে?'

— 'সেইটে বলাই তো মুস্কিল! নন্দলালের মতে, সে মানুষ নয়! অবশ্য তার গলায় নখের আঘাতে যে গভীর ক্ষত হয়েছে, মানুষের নখে সে রকম ক্ষত হওয়া সম্ভবও নয়!'

— 'তবে? তবে কি নন্দলালের ঘাড়ে ভূত চেপেছিলো?'

— 'ধ্যুৎ! কে বলছে তা? ভূত-টুত কিছু নয়! আমার বিশ্বাস, চিড়িয়াখানা বা কোনো খেলাওয়ালার দল থেকে ওরাংওটাং কি শিম্পাঞ্জীর মতো কোনো বড়ো-জাতের বানর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এ-কীর্তি তারই!……নন্দলাল রোজ ঐ পথ দিয়ে ঠিক ঐ সময়েই বাড়ি ফেরে। সেখানে পথের ওপরেই একটা ঝাঁকড়া বটগাছ অন্ধকার সৃষ্টি করে ঝুঁকে পড়েছে। নন্দলাল যখন তার তলা দিয়ে আসছিলো ঠিক তখনি সেই অজানা জীবটা হঠাৎ তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে— নন্দলালের বিশ্বাস, সে সেই গাছের ডাল থেকেই তার কাঁধের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো। পিঠের ওপরে পড়েই জীবটা দুই হাত দিয়ে তার গলা প্রাণপণে চেপে ধরে! নন্দলালের মনে হচ্ছিলো, কে যেন ইস্পাতের ফিতে দিয়ে তার গলা চেপে ধরেছে! সে কিছুই দেখতে পেলো না; কেবল সেই ভীষণ হাত-দু'খানা তার গলার চারিধারে চাপের ওপর চাপ দিতে থাকে! প্রাণের ভয়ে সে আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ করে ওঠে এবং তার চিৎকার শুনে কোথা থেকে দু'জন লোক ছুটে আসে! তাদের দেখেই জীবটা চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্রগতিতে একটা পাঁচিলের ওপর লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে যায়! নন্দলাল শুধু অনুভব করেছে এক-জোড়া লৌহ-হস্তের মৃত্যু-বাঁধন আর একটা মস্ত-বড়ো অপচ্ছায়া— এ-ছাড়া আর কিছুই সে জানে না।'

দিলীপ বললো, 'হয়তো সে খুনে-ঠগীর হাতে পড়েছিলো।'

— 'হতে পারে। কিন্তু নন্দলাল বলে, তা নয়। তার মতে, যে তাকে আক্রমণ করে গলা টিপে ধরেছিলো, তার হাত দু'খানা বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা!— কোনো জীবের স্পর্শই সে-রকম শীতল হয় না! নিশ্চয়ই এটা তার মনের ভ্রম, কিন্তু বেচারি ভয়ে একেবারে মুষড়ে পড়েছে।……হ্যাঁ, ভালো কথা! তোমার বন্ধু ভৈরবচন্দ্র নন্দলালকে

যে-রকম ভালোবাসে, বোধ হয় এ-খবরটা শুনলে আনন্দে নৃত্য করতে থাকবে। আমি তাকে খুব চিনি, সে কোনো শত্রুকেই ক্ষমা করে না। অতএব সাবধান, কোনোদিন তাকে ঘাঁটিও না।'

দিলীপ বললো, 'সে আমার মিত্রও নয়, শত্রুও নয়। তার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয়ই হয়েছে, তাকে আমার ঘাঁটাবার দরকার কি ?'

—'তোমার কথা তুমিই বুঝবে, আমি শুধু বলে খালাস। কেবল এইটুকু মনে রেখো, তার কাছ থেকে যতো তফাতে থাকতে পারো, ততোই ভালো!' এই বলে প্রতাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

দিলীপ আবার পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার মন তখন এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, ডাক্তারি কেতাবের কোনো কথাই সে যেন দেখতে পেলো না। থেকে থেকে তার মন কেবলই ছুটে যায় দোতলায় ঐ বিচিত্র ঘরের অদ্ভুত লোকটির কাছে— যার চারিদিকেই রয়েছে অজানা রহস্যের এক মায়াময় অপার্থিবতা! তারই ফাঁকে ফাঁকে তার বিস্মিত চিত্ত নন্দলালের ওপরে এই আশ্চর্য আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ঐ ভৈরবের স্বভাব, আর নন্দলালের ওপরে এই আক্রমণ— এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো যোগাযোগ আছে! কিন্তু কী যে সে যোগাযোগ, ভাষায় স্পষ্ট করে তা প্রকাশ করা যায় না।

দিলীপ তার ডাক্তারি বইখানা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিরক্তস্বরে বলে উঠলো, 'চুলোয় যাক্ ভৈরব আর তার বিদ্‌ঘুটে 'মমি'! তার জন্যে আজ আমার পড়া হলো না, আর কেবল এইজন্যেই তার সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কখনো মেলামেশা করবো না।'

দশদিন কেটে গেলো।

দিলীপ তার মড়ার কঙ্কাল আর ডাক্তারি কেতাব নিয়ে নিজের বিদ্রোহিতার বিরুদ্ধেই জোর করে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলো যে, ঘরের বন্ধ-দরজায় মাঝে মাঝে ভৈরবের করাঘাত শুনেও সাড়া দেবার নামটি করলো না। সে এসেই হয়তো সেকেলে মিশর আর তার গুপ্তরহস্য নিয়ে এমন সব আজগুবি গালগল্প জুড়ে দেবে যে, শুকনো ডাক্তারি কেতাবের সমস্ত কথাই ভুলে যেতে হবে।

একদিন সে বাইরে বেরোবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে তার খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেলো, তার বন্ধু অবনী অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে দালানের ওপরে নেমে এলো এবং তার পেছনে পেছনে ছুটে এলো রুদ্র-মূর্তিতে ভৈরবচন্দ্র— ভীষণ ক্রোধে তার মুখ হয়ে উঠেছে হিংস্র জন্তুর মতো কদাকার!

ভৈরব সাপের মতন ফোঁস্ করে বলে উঠলো, 'নির্বোধ! এর প্রতিফল পাবি!'

অবনী চেঁচিয়ে বললো, 'যা হয়, হবে! কিন্তু তোমার সঙ্গে আজ থেকেই সব সম্পর্ক তুলে দিলাম! আমি আর তোমার কোনো কথাই শুনবো না!'

— 'বেশ, শুনো না! কিন্তু তুমি যা প্রতিজ্ঞা করেছো, সেটা মনে রেখো!'

— 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! প্রতিজ্ঞা আমি রাখবোই! কাউকে কোনো কথাই বলবো না! কিন্তু এর পরে আমার বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব! তার চেয়ে আমার বোনকে গঙ্গাজলে ডুবিয়ে মারবো!

আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না—' এই বলেই অবনী হন্-হন্ করে দালান পেরিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেলো।

দিলীপ ঘরের ভেতর থেকে সব দেখলো, সব শুনলো। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ওদের গোলমালে যোগ দিতে তার ইচ্ছে হলো না। ভৈরবের সঙ্গে কোনো কারণে অবনীর ঝগড়া হয়েছে এবং সে তার বোনের সঙ্গে ভৈরবের বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে দিলো, দিলীপ এ-টুকু বেশ বুঝতে পারলো। তারপর সে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়লো এবং বাইরে গিয়েও এই কথাই তার বারবার মনে হতে লাগলো, ভৈরবের সঙ্গে অবনীর এমন ঝগড়া হলো কেন ?

পরদিনের কথা। সেদিন ছিলো 'ইলিয়ট্ শীল্ডের ফাইনাল'। গড়ের মাঠে মোহনবাগান গ্রাউণ্ডে নানান-কলেজের ছাত্ররা এসে গগনভেদী কোলাহলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে! দিলীপদের কলেজের সঙ্গেই আজ মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিযোগিতা, খেলার আগেই দুই পক্ষের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রীতিমতো একটা বাক-যুদ্ধ হয়ে গেলো! চলচ্চিত্রে সেই দৃশ্যটি গ্রহণ করলে, দর্শকরা চমৎকার একটি কৌতুক-নাট্যের রস উপভোগ করতে পারে!

খেলার শেষে দিলীপ যখন 'ইউনিফরম্' ছেড়ে নিজের বাড়িমুখো হয়েছে, তখন কোথা থেকে হঠাৎ অবনী এসে তার সঙ্গ নিলো।

অবনী বললো, 'ভাই দিলীপ, সেদিনকার ব্যাপার কতকটা তুমিও দেখেছো আর শুনেছো! কিন্তু সেদিন আমার এতো রাগ হয়েছিলো যে, তোমার সঙ্গে কথা না কয়েই চলে এসেছিলাম। সেজন্যে কিছু মনে করো না।'

— 'আমার তো কিছু মনে করবার কোনো কারণ নেই।'

— 'বেশ কথা! কিন্তু আমার একটি কথা তুমি রাখো। ভৈরব যে-বাসায় থাকে, সেখানে কোনো ভদ্রলোকের থাকা উচিত নয়। ও-বাসা ছেড়ে দাও!'

— 'কেন বলো দেখি?'

অবনী প্রথমটা কোনো জবাব দিলো না, দিলীপের সঙ্গে নীরবে খানিকক্ষণ এগিয়ে এলো। তারপর বললো, 'কেন যে তোমাকে ও-বাসা ছাড়তে বলছি, আমার পক্ষে তার কারণ বলা অসম্ভব। কেন না ভৈরবের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কারোর কাছে কোনো কথাই আমি বলবো না। কিন্তু এইটুকু আমার বলা উচিত যে, ভৈরবের কাছে ভদ্র বা অভদ্র কোনো মানুষেরই থাকা নিরাপদ নয়। যে-কোনো মুহূর্তে তুমি বিপদে পড়তে পারো— সাংঘাতিক বিপদ!'

— 'বিপদ? তুমি কী বলছো অবনী?'

— 'স্পষ্ট করে তোমাকে আমি কিছুই বলতে পারবো না। কিন্তু ও-বাসা ছেড়ে দাও।'

— 'কেন?'

— 'ভৈরব হচ্ছে অমানুষিক মানুষ, এ ছাড়া তার কোনো বর্ণনা করা যায় না। সেই যে সেদিন সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো, তারপর থেকেই আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়। কাল আমি তাই তাকে চেপে ধরেছিলাম। দিলীপ, তখন দায়ে পড়ে সে আমাকে যে-সব কথা বললো, শুনে আমার মাথায় চুল খাড়া হয়ে উঠলো! তার ওপরে ভৈরব বলে কিনা আমাকে তার দলভুক্ত হয়ে সাহায্য করতে! ভাগ্যে যথাসময়ে ভৈরবের আসল চরিত্র টের পেয়েছি,

তার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেলে কি সর্বনাশই না হতো! ভগবান রক্ষা করেছেন।'

— 'অবনী, হয় তুমি খুব বেশি বলছো, নয় বলছো খুব কম।'

— 'আমি কিছুই বলবো না বলে ভৈরবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি।'

— 'তুমি যদি জানতে পারো, কেউ তার প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে চায়, তাহলে অঙ্গীকার করেছো বলে কি সে-কথা প্রকাশ করবে না? ভৈরবকে আমি ভয় করবো কেন?'

— 'কারণ সে হিংস্র পশুর মতো ভয়ঙ্কর। হয়তো সে এখনো তোমার কোনো অনিষ্ট করে নি, কিন্তু সাপ কখনো কামড়ায়নি বলে কে সাপের গর্তের পাশে বাস করতে চায়?'

— 'অবনী, তুমি ভাবছো, গুপ্তকথা আমি জানি না। এটা তোমার ভুল! তুমি তো এই কথাই আমার কাছে প্রকাশ করতে চাওনা যে, ভৈরবের ঘরে আর এক ব্যক্তি বাস করছে!'

অবনী চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। মহা বিস্ময়ে দিলীপের মুখের পানে তাকিয়ে বললো, 'তুমি তাহলে সব জানো?'

গর্বের হাসি হেসে দিলীপ বললো, 'হুঁ, তা আর জানি না! ভৈরব কোনো ফেরারি আসামীকে তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে, এই তো?

অবনীর বিস্মিত ভাবটা মিলিয়ে গেলো। সে ঘাড় নেড়ে বললো, 'আমি কিছু বলতে পারবো না। ভৈরব আমার মুখ বন্ধ করে রেখেছে।'

দিলীপ বললো, 'আমি আর কিছু শুনতেও চাই না। তবে এটা জেনে রাখো, তুমি ভৈরবকে খারাপ লোক বললে বলেই বাসা ছেড়ে

আমি পালাবো না! কেন পালাবো? ও বাসা আমার খুব পছন্দসই।'

অবনীকে পিছনে রেখে দিলীপ ট্রাম লাইনের দিকে অগ্রসর হলো। তার সেই যুক্তিহীন ভয় দেখে দিলীপ মনে মনে কৌতুক অনুভব করলো। মানুষ হিসাবে ভৈরব অমানুষিক হবে কেন? বড়ো-জোর তার স্বভাবটাই মিষ্ট নয়! হয়তো তার কোনো কোনো অস্বাভাবিক বাতিক আছে— এমন বাতিক কতো লোকেরই তো থাকতে পারে! মানুষের প্রকৃতি হরেক-রকম বলেই তো এই পৃথিবী এমন বিচিত্র! হয়তো ভৈরব তার ঘরের মধ্যে কোনো খুনী আসামীকে আশ্রয় দিয়েছে! কিন্তু সেজন্যে বাইরের লোক অকারণে মাথা ঘামিয়ে ভয় পাবে কেন?

টালিগঞ্জের অমন খাসা বাসা কি ছাড়া যায়? কলকাতায় থেকেও সে কলকাতার বাইরে আছে! জনতার আর ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির হট্টগোল নেই, হাজার পাখির 'কোরাস' শুনে তার ঘুম ভাঙে, চারিদিকে তাকিয়েই দেখা যায়, মাঠের পর মাঠ ভরে সবুজ রঙের স্রোত বইছে এবং তার ওপরে ঝরে পড়ছে নীলাকাশের আলোর ঝরনা! ও বাসা ছাড়া হবে না!

দিলীপের আর এক বন্ধু ছিলো, মণিলাল। সে বয়সে কিছু ছোটো হলেও তার সঙ্গে দিলীপের খুব বনিবনাও ছিলো।

মণিলাল ধনীর ছেলে এবং দিলীপের মতো সেও নির্জনতার ভক্ত। কলেজের পড়া সাঙ্গ করেও সংসারে ঢোকে নি। নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ও ফুলের বাগান নিয়েই দিন কাটিয়ে দিতো মনের খুশিতে।

দিলীপেদের বাসা ছাড়িয়ে আরো মাইল দেড়েক এগিয়ে গেলেই তার বাগান-ঘেরা সুন্দর বাড়িখানি দেখতে পাওয়া যায়। জায়গাটি অনেকটা পল্লীগ্রামের মতো।

হপ্তায় বার-দুয়েক দিলীপ তার এই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করতে যেতো। অবনীর সঙ্গে তার শেষ দেখা হবার পরদিন সন্ধ্যা আটটার সময়ে দিলীপ ঘর থেকে বেরোলো তার বন্ধু মণিলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বেরোবার সময়ে টেবিলের দিকে চোখ পড়াতে দেখলো, তার ওপরে পড়ে রয়েছে ভৈরবের কাছ থেকে চেয়ে আনা একখানি দামী বৈজ্ঞানিক বই।

দিলীপের মনে হলো, ভৈরবের সঙ্গে সে আর মেলামেশা করতে চায় না বটে, কিন্তু তার বইখানি ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

বইখানি তুলে নিয়ে সে দোতলার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠলো। ভৈরবের দরজার সামনে গিয়ে তার নাম ধরে দু'বার ডাকলো। সাড়া পেলো না। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেলো। উঁকি মেরে দেখলো, ঘরের ভেতরে ভৈরব নেই। ভাবলো, ভালোই হলো, ভৈরবের সঙ্গে আর কথা কইতে হলোনা, বইখানা ঘরের ভেতরে রেখে চুপিচুপি চলে যাই।

সে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ল্যাম্পটা কমানো রয়েছে বটে, কিন্তু আবছা আলোয় ঘরের সব দেখা যাচ্ছে। সমস্ত ঘরখানার মধ্যে যেন এক অজানা অলৌকিক রহস্য স্তম্ভিত হয়ে আছে, আলোকের স্বল্পতায় তার ভেতরে এসে দাঁড়ালেই বুকের ভেতরে জেগে ওঠে কেমন একটা অস্বস্তি! দিলীপ এধারে ওধারে চোখ ফিরিয়ে দেখলো, ছাদে সেই ঝুলন্ত কুমির, দেওয়ালে ঘেঁষে সেই পশু-মুণ্ডধারী মিশরী দেব-দেবীর জটলা এবং মাঝখানে সেই মমির কফিন······কিন্তু, কফিনের মধ্যে

বীভৎস মমিটা নেই! ঘরের চারিদিকে তাকিয়েও দিলীপ্ সেটাকে দেখতে পেলোনা। হয়তো তাকে ঘর থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। ভালোই হয়েছে।

দিলীপ নিজের মনেই বললো, 'ভৈরবের ওপরে আমি বোধ হয় অবিচার করেছি। এখানে যদি কোনো গুপ্তরহস্য থাকতো, তাহলে সে নিশ্চয়ই ঘরের দরজা এমন করে খুলে রেখে যেতোনা।'

দিলীপ বই রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো। সিঁড়িতে আলো ছিলো না। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। সে এদিকের দেওয়াল ধরে নামছে, হঠাৎ সিঁড়ির ওপরে শোনা গেলো একটা অস্পষ্ট শব্দ, একটা আগুনের ফিন্‌কির আভাস, একটা ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ার ঝটকা— কে যেন তার পাশ কাটিয়ে বেগে ওপরে উঠে গেলো!

— 'কে, ভৈরববাবু নাকি?'

কোনো সাড়া নেই— কিন্তু ওপরে ঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো।

দিলীপের মন কৌতূহলে ভরে গেলো, সেও তাড়াতাড়ি আবার ওপরে উঠলো। ভৈরবের ঘরের দরজা তেমনি বন্ধ রয়েছে; ঠেলতেই খুলে গেলো।

ঘরের ভেতরে উঁকি মারতেই সর্বপ্রথমে তার চোখ পড়লো কফিনটার ওপরে। তার মধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মৃতদেহটা!

দিলীপ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না! আরো দুই পা এগিয়ে গিয়ে ভালো করে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখলো, কফিনের মমি কফিনেই বিরাজ করছে!

কিন্তু তিন মিনিট আগেই কফিনের ভেতরে যে কিছুই ছিলো না,

দিলীপ শপথ করে তা বলতে পারে! চোখের ভ্রম? এও কি সম্ভব? সে আড়ষ্ট চক্ষে সেই বিভীষণ সুদীর্ঘ মৃত-মূর্তির পানে তাকিয়ে রইলো এবং তার মনে হলো, মমির কোটরগত চোখ-দুটো যেন জ্যান্ত চোখের মতো একবার চক-চক করে উঠলো!

দিলীপের হতভম্ব ভাবটা তখনো কাটেনি, হঠাৎ নিচে থেকে প্রতাপের ব্যস্ত চিৎকার শোনা গেলো— দিলীপ! কোথায় তুমি? শীগ্‌গির এসো!'

দিলীপ দ্রুতপদে নেমে গিয়ে দেখলো, তার ঘরের সামনে কাতর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রতাপ!

— 'কি হে, ব্যাপার কি?'

—'অবনী হঠাৎ জলে ডুবে গেছে! ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না, আপাতত তুমি হলেই চলবে! তাকে জল থেকে তোলা হয়েছে, দেহে এখনো প্রাণ আছে। দেরি কারো না, শীগ্‌গির চলো!'

দু'-জনে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো এবং শীগগির অবনীর বাড়িতে পৌছোবে বলে দৌড়োতে আরম্ভ করলো!

অবনীদের বৈঠকখানায় ঢুকে দেখা গেলো, চৌকির ওপরে তার জলসিক্ত অচেতন দেহকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিলীপ প্রভৃতির চেষ্টায় প্রায় কুড়ি মিনিট পরে অবনীর দেহে একবার শিহরণ দেখা গেলো, তারপর তার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো, তারপর সে চোখ খুললো।

প্রতাপ বললো, 'এইবারে জেগে ওঠো ভাই, জেগে ওঠো! তুমি আমাদের যথেষ্ট ভয় দেখিয়েছো!'

দিলীপ বললো, 'আমার ডাক্তারি ব্যাগ থেকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি বার করে ওকে খাইয়ে দাও।'

অবনীর এক সহপাঠী সেখানে ছিলো। সে বললো, 'কি ভয়ই আমি পেয়েছিলাম! মাঠে বসে চাঁদের আলোয় আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে অবনী হঠাৎ উঠে একটা পুকুর ধারে গেলো। মাঝখানে কতকগুলো গাছ থাকাতে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আচম্‌কা শুনলাম তার আর্তনাদ আর ঝপাং করে জলে পড়ার শব্দ! তারপর ছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে কী কষ্টে যে তাকে ডাঙায় তুলেছি, তা খালি আমিই জানি। আমি তো ভেবেছিলাম, অবনী আর বেঁচে নেই।'

ইতিমধ্যে অবনী কতকটা সামলে নিয়েছে। সে দুইহাতে ভর দিয়ে উঠে বসলো এবং তার মুখে-চোখে ফুটে উঠলো দারুণ ভয়ের চিহ্ন!

দিলীপ বললো, 'কি করে তুমি জলে পড়ে গেলে?'

— 'আমি পড়ে যাইনি।'

— 'তবে?'

— 'কেউ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।'

— 'সে কি হে?'

— 'হ্যাঁ। পুকুর-ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ কে আমাকে দু'খানা বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতে হাল্‌কা পালকের মতো শূন্যে তুলে ধরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো!'

— 'কে সে?'

— 'আমি কিছুই দেখিনি, কিছুই শুনিনি। কিন্তু সে যে কে, আমি তা জানি।'

খুব মৃদুস্বরে দিলীপ বললো, 'আমিও জানি।'

অবনী সবিস্ময়ে বললো, 'তাহলে তুমি জেনেছো? মনে আছে, আমি তোমাকে কি অনুরোধ করেছিলাম?'

—'মনে আছে। এইবারে বোধ হয় আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করবো।'

প্রতাপ বিরক্ত কণ্ঠে বললো, 'তোমরা কি গুজ্ গুজ্ ফুস্‌ফুস্ শুরু করলে হে? অবনী এখন বিশ্রাম করুক, এখন আর কোনো কথা নয়। এসো হে, আমরা বিদায় হই।'

বাসার দিকে ফিরতে ফিরতে দিলীপের কতো কথাই মনে হতে লাগলো। —মমি-শূন্য কফিন, সিঁড়ির ওপরে শব্দ ও কন্‌কনে হাওয়া, তারপরেই কফিনের মধ্যে হারানো মমির রহস্যপূর্ণ অসম্ভব পুনরাবির্ভাব এবং তারপর অবনীর ওপরে এই অকারণ আক্রমণ। এর আগেই নন্দলালও ঠিক এই ভাবেই আক্রান্ত হয়েছিলো এবং এদের দু'জনেরই ওপরে ভৈরব তুষ্ট নয়! এই সঙ্গে ভৈরবের ঘরের অসাধারণ ব্যাপারগুলোও স্মরণ হতে লাগলো। এই সমস্ত ঘটনা একত্রে নাড়াচাড়া করতে করতে দিলীপের মনের ভেতরে একটা সম্পূর্ণ নাটক গড়ে ওঠলো! এ-সবকে মিথ্যা বলা অসম্ভব, কিন্তু পৃথিবীর চক্ষে এদের সত্যতা প্রমাণিত করাও কতোটা কঠিন! পৃথিবী বলবে—দিলীপ, তুমি ভুল দেখেছো, কফিন এক-মুহূর্তও মমি-শূন্য হয়নি, আরো-অনেকের মতো অবনীও হঠাৎ জলে ডুবে গেছে, ভেবে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, তুমি কোনো ভালো ডাক্তারের ওষুধ খাও!—দিলীপ নিজেও নিশ্চয় এ-রকম গল্প শুনলে এই কথাই বলতো! কিন্তু তবু সে এখন স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারে যে, ভৈরবের মন হচ্ছে হত্যাকারীর মন এবং সে এমন এক অশ্রুতপূর্ব ভয়াবহ অস্ত্রের দ্বারা নরহত্যা করতে চায়, পৃথিবীর অপরাধের ইতিহাসে আর কেউ কখনো যা ব্যবহার করতে পারেনি।

দিলীপ স্থির করলো, হপ্তাখানেকের মধ্যেই কোনো নতুন বাসায়

উঠে যাবে। এ বাসায় থাকলে তার পড়াশুনা আর হবে না, দোতলার ঘরের রহস্য নিয়েই মন ব্যস্ত হয়ে থাকবে।

সে বাসার কাছে এসে পড়লো। দোতলার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভৈরব।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে দিলীপ দেখলো, ভৈরব সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে।

ভৈরব বললো, 'দিলীপবাবু, নমস্কার। আপনার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতে চাই। এখন কি আপনার সময় হবে?'

দিলীপ ক্রুদ্ধস্বরে বললো, 'না।'

—'সময় হবে না? লেখাপড়া নিয়ে আপনি এতোই ব্যস্ত? আমি অবনীর কথাই বলতাম। শুনছি তার নাকি কি বিপদ হয়েছে?' ভৈরবের মুখ গম্ভীর, কিন্তু তার চোখে যেন আনন্দের আভাস!— দিলীপের ইচ্ছা হলো, মারে তার মুখে এক ঘুসো!

সে বললো, 'ভৈরববাবু, শুনে আপনি বড়োই দুঃখিত হবেন যে, অবনী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে! আপনার শয়তানি কৌশল এবারো কাজে লাগেনি! বেহায়ার মতো কিছু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না, আমি সব জেনে ফেলেছি!'

ক্ষাপ্পা দিলীপের কথা শুনে ভৈরব প্রথমটা থতমত খেয়ে দুই পা পিছিয়ে গেলো। তারপর বললো, 'আপনি পাগল হয়ে গেছেন, দিলীপবাবু। কি আপনি বলতে চান? অবনীর দুর্ঘটনার জন্যে আমি দায়ী?'

বজ্রনাদে দিলীপ বললো, 'হাঁ! দায়ী আপনি, আর আপনার ঐ শুক্‌নো মড়া! ভৈরববাবু, সেকাল হলে আপনাকে হয়তো

জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো, কিন্তু ভুলে যাবেন না, একালেও ফাঁসিকাঠ আছে। এই টালিগঞ্জে যদি আর কোনো লোক এই-ভাবে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায়, তাহলে আমিই আপনাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করবো। মিশরী মড়ার খেলা বাংলাদেশে চলবে না, — বুঝেছেন?'

— 'আপনাকে শীগ্‌গিরই পাগলা-গারদে পাঠাতে হবে দেখছি।'

— 'আচ্ছা! দেখা যাবে, আমিই পাগলা-গারদে যাই, না আপনিই ফাঁসিকাঠে দোল খান্‌!'— বলেই দিলীপ নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলো।'

পরদিন সন্ধ্যায় দিলীপ স্থির করলো, আজ মণিলালের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

পথে বেরিয়ে পেছন ফিরে দেখলো, ওপরের আলোকিত ঘরের জানলায় ভৈরব আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তির মতো। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধ হয় তাকেই দেখছিলো!

তার পাপ সংসর্গ থেকে তফাতে এসে দিলীপ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

দূরে তালকুঞ্জের মাথার ওপর থেকে চাঁদ যেন সকৌতুকে পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করছে এবং হাল্‌কা বাতাসে ভেসে আসছে শান্ত সন্ধ্যার একটি স্নিগ্ধ গন্ধ। জ্যোৎস্নায় স্বপ্নময় নীলসাগরে যেন কোনো পরীপুরীর উদ্দেশে চলেছে ছোটো ছোটো মেঘের তরণী। দুইপাশে মাঠের জনশূন্য উন্মুক্ততা নিয়ে এগিয়ে চললো দিলীপ, মনের আনন্দে।

তখন জনমানবের সাড়া নেই। প্রায় আধঘণ্টা পরে দেখা গেলো,

খানিক তফাতে মণিলালের বাড়ির জানলাগুলো আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ দিলীপের কি মনে হলো, একবার ফিরে পেছনপানে তাকিয়ে দেখলো। চাঁদের কিরণে ধব্‌ধবে পথটি একটি চওড়া শুভ্র-রেখার মতো অনেক দূরে অস্পষ্টতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তারই ওপর দিয়ে অভিশপ্ত অপচ্ছায়ার মতো কি-একটা দ্রুতবেগে এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে!

দিলীপের বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। কী ও? মানুষ? কী লম্বা ওর কালো দেহ, শুভ্র পথের জ্যোৎস্নাকেও ও যে কলঙ্কিত করে তুলেছে! ওর চোখ দুটো যেন দপ্‌দপ্‌ করছে, প্রত্যেক পদক্ষেপের তালে তালে হাড়গুলো বেজে উঠছে খড়্‌মড়্‌ করে, যেন ওর সারা দেহের সঙ্গেই মাংসের সম্পর্ক নেই! কী অস্বাভাবিক ওর গলা—যেন একটা বাঁখারির ওপরে বসানো আছে মুণ্ডুটা! ভয়াবহ সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মূর্তি ঝড়ের মতো ছুটে আসছে শিকারের দিকে!

দিলীপ আর দাঁড়ালো না। মণিলালের বাড়ির দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগলো— কণ্ঠে তার আর্ত চিৎকার! পেছনে মৃত্যু-পিশাচ, সামনে আলোকোজ্জ্বল জীবনময় অট্টালিকা, ওদিকে নরক, এদিকে স্বর্গ, কিন্তু মাঝখানে এখনো রয়েছে বিপজ্জনক ব্যবধান! এই পথটুকু আজ কী লম্বাই না মনে হচ্ছে, আজ যেন আর পথের শেষ আসবে না!

কিন্তু পথের শেষ এলো— জীবন্ত মৃত্যু তখন তার কাছ থেকে মাত্র দশহাত দূরে, জ্বলন্ত চক্ষে দু'খানা অস্থিসার দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে সে দিলীপকে ধরবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে!

একটানে বাগানের ফটক খুলে দিলীপ আবার ছুটলো, বাড়ির দরজা সেখান থেকেও খানিকটা দূরে!

সভয়ে শুনলো, বিভীষিকা তখনও তার পিছু ছাড়েনি— সেও সশব্দে ফটকটা খুলে ফেললো এবং পেছনে, অতি-নিকটে তার কঠিন পায়ের শব্দ।

দেহের শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ করে দিলীপ তার দ্রুতগতিকে দ্বিগুণ দ্রুত করে তুললো এবং কোনোরকমে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে দরজাটা বন্ধ করে খিল তুলে দিলো।

কোথা থেকে ছুটে এসে মণিলাল বললো, 'কি আশ্চর্য! দিলীপ— দিলীপ, ব্যাপার কি?'

দরজার ওপরে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে দিলীপ অতি ক্ষীণস্বরে বললো, 'আগে এক গেলাস জল!'

মণিলাল দৌড়ে গিয়ে যখন এক গেলাস জল নিয়ে ফিরে এলো, দিলীপ তখন একান্ত অবসন্নের মতো একখানা চেয়ারের ওপরে বসে পড়ে হাঁপ্ সামলাবার চেষ্টা করছে।

— 'এই নাও জল! বন্ধু, তোমার এ কী মূর্তি, মুখ যে একেবারে কাগজের মতো শাদা হয়ে গেছে!'

দিলীপ সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে তার তপ্ত পাথরের মতন শুকনো গলাটা ভিজিয়ে নিলো। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বললো, 'মণিলাল, সব কথা পরে বলছি। আপাতত শুনে রাখো, আজ রাত্রে তোমার বাড়িই হবে আমার শয়ন-মন্দির। কাল সকালে আবার সূর্যোদয় না হলে আমি আর এ-বাড়ির বাইরে যেতে পারবো না!'

দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে মণিলাল বললো, 'তুমি যা বলবে, তাই হবে। আমি তোমার জন্যে ব্যবস্থা করতে বলছি। ওকি, উঠে আবার কোথায় যাচ্ছো?'

—'দোতলার বারান্দায়। সেখান থেকে চারিদিকের সব দেখা যায়। তুমিও আমার সঙ্গে এসো। আমি যা দেখেছি তুমিও তা নিজের চোখে দেখলে ভালো হয়!'

দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে চোখে পড়লো চারিদিকেই চন্দ্রলোকের রাজ্য— যার প্রজা হচ্ছে গাছপালা, লতা-পাতা, ফুল-ফল!

দিলীপ প্রথমে বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বাগানের যতোখানি দেখা যায় তার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলো। সেখানে দখিনা বাতাসে ছোটো-বড়ো ফুলগাছের দল দুলে দুলে কেবল চন্দ্রলেখার স্বপ্ন দেখছে।

তারপর সে মাঠের পর মাঠের দিকে এবং সুদীর্ঘ শাদা ফিতার মতো মেঠো পথের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো। সেখানেও জনহীন পূর্ণ-শান্তির মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে সুমধুর জ্যোৎস্না! কাছে বা দূরে জীবন্ত কোনো প্রাণীর ছায়া পর্যন্ত দেখা গেলোনা।

মণিলাল বললো, 'দিলীপ! তুমি কি সিদ্ধি খেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছো? এখানে এসে কাকে তুমি খুঁজতে চাও?'

—'সে কথা তোমাকে বলছি।······কিন্তু, কোথায় সে গেলো, কোথায় লুকোলো?···হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ দেখো মণিলাল, ঐ দেখো। পথটা যেখানে মোড় ফিরেছে, ঐখানে তাকিয়ে দেখো—' বলেই সে উত্তেজিত ভাবে মণিলালের বাহু সজোরে চেপে ধরলো!

মণিলাল বললো, 'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি! আমাকে দেখাবার জন্য এতো জোরে আমার হাত চেপে ধরবার দরকার নেই! হ্যাঁ, ওখান দিয়ে কেউ যাচ্ছে বটে। কোনো মানুষ, দেখলে মনে হয়— সে রোগা, কিন্তু ঢ্যাঙা! বেশ তো, পথ দিয়ে মানুষ যাচ্ছে— আর মানুষরা চিরকালই পথ দিয়ে চলে, কিন্তু সেজন্যে তোমার এতো বেশি ভয় পাবার কারণ কি?'

— কারণ কিছুই নেই, তবে ঐ মূর্তিটা আমাকে ধরবার জন্যে পেছনে তাড়া করেছিলো ! আচ্ছা তোমার বৈঠকখানায় চলো, সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করছি !'

দু'জনে আবার নেমে বৈঠকখানায় এসে বসলো। প্রচুর আলোকে আনন্দময় সেই সাজানো ঘরের একখানা কৌচের ওপর বসে দিলীপ একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা একে একে মণিলালের কাছে বর্ণনা করে গেলো— ছোটোখাটো খুটিনাটি-টি পর্যন্ত বাদ দিলো না।

কাহিনী সাঙ্গ করে সে বললো, 'মণিলাল এই হচ্ছে আমার অভিশপ্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এ কাহিনী অসম্ভব বটে, কিন্তু এর প্রত্যেক বর্ণই সত্য !'

মণিলাল বেশ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো, তার মুখের ওপরে একটা হতভম্ব ভাব !

তারপর সে ধীরে ধীরে বললো, 'আমার জীবনে এমন গল্প কখনো শুনিনি ! তুমি সমস্ত বিষয় বর্ণনা করলে বটে, কিন্তু তুমি নিজে কি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছো, বলো দেখি।'

— 'তোমার নিজের মত কি ?'

— 'তার আগে তোমার মত শুনতে চাই। এ-বিষয় নিয়ে তুমি ভাববার সময় পেয়েছো, আমি পাইনি।'

— 'আসল ব্যাপার আমার যা মনে হয়, তা হচ্ছে এই। ঐ শয়তান ভৈরব মিশরে গিয়ে এমন কোনো গুপ্তমন্ত্র শিখে এসেছে, যার গুণে মমিকে— অর্থাৎ হাজার হাজার বছর আগেকার মড়াকে — অথবা একটা বিশেষ মড়াকে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে জ্যান্ত করে তুলতে পারা যায়। যেদিন সে প্রথম অজ্ঞান হয়ে যায়, সেদিন

সম্ভবত মড়াটাকে সর্বপ্রথম জাগিয়ে তুলতে গিয়েছিলো। কিন্তু একটা পুরোনো শুকনো মড়া জীবন্ত হয়ে উঠছে, এই অনভ্যস্ত অসম্ভব দৃশ্য দেখেই যে সে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। তারপরে জীবন্ত মড়ার নড়াচাড়া দেখতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যদিও মমির সেই জীবন নিশ্চয়ই দীর্ঘস্থায়ী নয়। কারণ আমি তাকে দিনের পর দিন সম্পূর্ণ জড়পদার্থের মতো কফিনের ভেতরে থাকতে দেখেছি। কিন্তু এক অপার্থিব অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়ে ভৈরব বুঝলো যে, মড়ার সাহায্যে সে মনের মতো কাজ সফল করতে পারে। কারণ এটা হচ্ছে মানুষের মড়া, অতএব জ্যান্ত হলে তার মানুষী বুদ্ধি আর শক্তিও ফিরে পায়। নন্দলালের ওপর ভৈরবের রাগ ছিলো, তার ওপরেই সে প্রথম পরীক্ষা করলো। তারপর এই নতুন ক্ষমতা পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে সে অবনীকেও নিজের দলে টানবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অবনী হচ্ছে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এ-সব অন্যায় ভূতুড়ে ব্যাপারে সে যোগ দিতে চাইলো না। ভৈরবের সঙ্গে তার ঝগড়া বাধলো। এমন লোকের হাতে সে নিজের বোনকে সমর্পণ করতে নারাজ হলো, আর তার ফলে সেও পড়লো ভৈরবের হুকুমে এই জ্যান্ত মড়ার হাতে। কিন্তু আগে নন্দলাল, তারপরে অবনী যে প্রাণে কোনোরকমে রেহাই পেলো, সেটা হচ্ছে দৈবের মহিমা! নইলে ভৈরবের ওপরে আজ দু'-দুটো নরহত্যার চাপ পড়তো। তারপর সে যখন টের পেলো যে, আমিও তার গুপ্তকথা জেনে ফেলেছি, তখন আমাকেও তার পথ থেকে সরিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলো! আমি যে এখানে আসবো, সে তা জানতো। দিলে তার মমিকে লেলিয়ে! কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, নইলে কাল সকালেই তোমার বাগানের ভেতরে পেতে আমার মৃতদেহ! আমি

ভীতু লোক নই, কিন্তু এ-রকম মৃত্যু-ভয় অতি-বড়ো সাহসীও সহ্য করতে পারে না!'

মণিলাল অবিশ্বাসের হাসি হাসতে হাসতে বললো, 'বন্ধু, অতিরিক্ত লেখাপড়া করে করে তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় চার হাজার বছরের পুরোনো মিশরের জ্যান্ত মমি! সব-চেয়ে কড়া গাঁজার ধোঁয়াও এর কাছে হার মানে! এই মমিকে খালি তুমিই দেখেছো, আর কেউ একে জ্যান্ত অবস্থায় দেখেনি।'

— 'নিশ্চয়ই আরো কেউ কেউ দেখেছে। কারণ এ অঞ্চলের অনেকেই বলছে যে, বানর-জাতীয় কোনো প্রাণী যেখানে সেখানে মানুষের ওপরে অত্যাচার করছে! তা ছাড়া তারা আর কি বলবে? আসল ব্যাপারটা যে কল্পনা করাও অসম্ভব!'

— 'কল্পনার দরকার কি? আসল ব্যাপার তো বেশ বোঝাই যাচ্ছে।'

— 'কি বোঝা যাচ্ছে?'

— 'প্রথমতঃ ধরো, তুমি বলছো শূন্য কফিনকেও হঠাৎ পূর্ণ হতে দেখেছো! তুমি ভুলে যাচ্ছো, ভৈরবের ঘরের আলো কমানো ছিলো। সেই ম্লান আলোতে প্রথমটা তোমার ভালো করে তাকাবার দরকার হয় নি, তাই তুমি চোখের ভ্রমে মমিটাকে দেখতে পাওনি!'

— 'না না মণিলাল! এ হতে পারে না।'

— 'হতে পারে না কি, তাই-ই হয়েছে। তারপর আমার বিশ্বাস, এ-অঞ্চলে হঠাৎ কোনো গুণ্ডা এসে লীলা-খেলা শুরু করেছে। নন্দলালের ওপরে সেই-ই আক্রমণ করেছে, তোমাকে একলা পেয়ে সেই-ই তেড়ে এসেছে, আর অবনী জলের ভেতরে নিজেই পড়ে গেছে দৈবগতিকে। এ-সবের জন্যে ভৈরবকে দায়ী করোনা, কারণ তোমার এ উদ্ভট মত

খোপে টিঁকবে না। তাকে জোর করে আদালতে হাজির করলেও আইন তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না।'

দিলীপ গম্ভীর স্বরে বললো, 'আমি তা জানি। তাই আইনের আশ্রয় না নিয়ে আমি নিজের শক্তির ওপরেই নির্ভর করতে চাই।'

— 'তার মানে?'

— 'আমি কলকাতাকে এক অদ্ভুত বিপদ থেকে রক্ষা করতে চাই। কেবল তাই নয়, সব-চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, আমি নিজে আত্মরক্ষা করতে চাই। আমার কর্তব্য আমি স্থির করেছি। এখন ঘণ্টাখানেক আমাকে একলা থাকতে দাও। আমাকে একটা কলম আর একখানা কাগজের 'প্যাড' দিতে পারবে?'

— 'নিশ্চয়ই। ঐ কোণের টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেই তুমি যা চাও তাই পাবে।'

দিলীপ টেবিলের ধারে গিয়ে বসলো। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে কি লিখতে লাগলো। একঘণ্টার পর দুই ঘণ্টার আগে তার লেখা শেষ হলো না। ততোক্ষণ ধরে মণিলাল একখানা সোফায় বসে বই পড়তে ও মাঝে মাঝে দিলীপের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো।

তারপর দিলীপ এক তাড়া কাগজ নিয়ে উঠে এসে মণিলালের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'এখন তুমি সাক্ষী হও। এই কাগজের তলায় একটা সই করে দাও।'

— 'সাক্ষী হবো? কিসের সাক্ষী?'

— 'এটা যে আজকের তারিখে আমি সই করেছি, তারই সাক্ষী হবে তুমি। বন্ধু, এরই ওপরে আমার জীবন নির্ভর করছে।'

— 'দিলীপ, তুমি পাগলের মতো কথা কইছো। চলো, খেয়ে দেয়ে শোবে চলো।'

— 'আমি যা করেছি, অনেক ভেবে-চিন্তেই করেছি। যে মুহূর্তে তুমি সই করবে, আমি তোমার সব কথাই শুনবো। নাও, সই করো।'

— 'কিন্তু, কি-জন্যে সই করবো সেটা বলো।'

— 'আজ আমি তোমাকে যে-ঘটনাগুলো বলেছি, এইসব কাগজে তা লিখে রাখলাম। তুমি কেবল সাক্ষী হও, মণিলাল!'

মণিলাল তখনি সই করে দিয়ে বললো, 'নাও, কেমন হলো তো? কিন্তু তোমার মতলব কি, আমি জানতে চাই।'

— 'পুলিশের হাতে যদি ধরা পড়ি, তাহলে এই কাগজগুলো দাখিল করো।'

— 'পুলিশের হাতে তুমি ধরা পড়বে? কেন?'

— 'হয়তো আমি নরহত্যা করবো!'

— 'দিলীপ, দিলীপ! গোঁয়ারের মতো কোনো কাজ করো না!'

— 'মোটেই নয়। আমি আমার কর্তব্যই করবো। এখন এই কাগজগুলো তুমি রেখে দাও। আমি এইবার খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে চাই। কাল সকালে অনেক কাজ।'

দিলীপকে যারা চেনে তারা জানে যে, শত্রু হিসাবে সে বড়ো সহজ মানুষ নয়। যেমন মন দিয়ে সে লেখাপড়া করতো, তেমনি ভাবে দেহ-মন একাগ্র করেই লোকর সঙ্গে বন্ধুতা বা শত্রুতা করতে পারতো। এই ছিলো তার স্বভাব। অর্ধসমাপ্ত করে কোনো কিছুই সে ফেলে রাখতে পারতো না।

সে যে কি করবে সে-কথা কিছুতেই মণিলালের কাছে ভাঙলো না। কিন্তু পরদিন প্রভাতে পূর্ব-আকাশে রঙের খেলা শুরু হবার আগেই দিলীপ বিছানা ছেড়ে জামা-কাপড় পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো।

এই তো সেই চির-পরিচিত বিহঙ্গ-কলরোলে ও তরু-মর্মরে

সঙ্গীতময় পথ আর মাঠ, কিন্তু অবর্ণনীয় বিভীষিকার চলন্ত ছায়াকে বুকে করে রাতে ওরাই কি ভয়ানক হয়ে উঠেছিলো!

রাতের অন্ধকার ও অস্পষ্টতা এসে পথে-ঘাটে যে-কোনো বিভীষিকার জন্যে জমি তৈরি করে রাখে। তাই হঠাৎ কোথাও একটা গাছের ডাল নড়লে বা প্যাঁচা ডেকে উঠলে বা বাদুড় ডানা ঝট্‌পট্‌ করলে মানুষের বুকও ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে! কিন্তু দিনের বেলায় সুস্পষ্ট সূর্যালোক কাপুরুষকেও সাহসী করে তোলে। সেই সৃষ্টিছাড়া মূর্তিটা আজ যদি এখন এই মেঠো পথে এসে দাঁড়ায়, দিলীপ নিশ্চয়ই তাহলে কালকের মতো ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে না!

এমনি সব ভাবতে ভাবতে দিলীপ কাঁচা রোদের সোনা-মাখা পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললো।

প্রথমে প্রতাপের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। প্রতাপ তখন সবে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রভাতী চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে।

দিলীপকে এতো ভোরে দেখে বিস্মিত হয়ে বললো, 'তুমি যে এখন? চা আনতে বলি?'

— 'না, ধন্যবাদ! প্রতাপ, তুমি এখনি আমার সঙ্গে আসতে পারবে?'

— 'কেন পারবো না?'

— 'আমি যা বলবো, করবে?'

— 'নিশ্চয়!'

— 'তোমাদের বন্দুক আছে না?'

— 'আছে। কিন্তু বন্দুক কি হবে?'

— 'সেটা সঙ্গে করে নিয়ে এসো। আর এক গাছা খুব মোটা লাঠি!'

— 'বাঘ মারা যায় এমন লাঠি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু এতো অস্ত্রশস্ত্র কেন? যুদ্ধযাত্রা করবে নাকি?'

— 'দেওয়ালের ওপরে ঐ যে বড়ো রাম-দা খানা টাঙানো রয়েছে, ওখানাও চাই।'

— 'এ যে কুরুক্ষেত্রের আয়োজন! আর কিছু চাই? কামান-টামান?'

— আপাতত দরকার হবে না। তোমাকেও দরকার হতো না, কিন্তু পাছে একজনের বেশি লোক আমাকে আক্রমণ করে, সেই ভয়েই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা কেউ শিশু নই, কেউ আক্রমণ করলে নিশ্চয়ই লড়াই করতে পারবো, কি বলো?'

— 'পারা তো উচিত! কিন্তু এখন বীর-দর্পে কোন্ দিকে যাত্রা করতে হবে, বলো? ফোর্ট-উইলিয়মের দিকে?'

— 'না। আমার বাসার দিকে!'

— 'তোমার বাসার দিকে?'

— 'অর্থাৎ ভৈরবের বাসার দিকে!'

— 'কিন্তু সে জন্যে এমন সমর-সজ্জার প্রয়োজন কি? ভৈরবকে যদি বধ করতে চাও, একটা ঘুসি বা চড় লাথিই যথেষ্ট!'

— 'না প্রতাপ, না! ভৈরব একলা নেই!'

— 'তাহলে সেও কি সৈন্য সংগ্রহ করেছে?'

— 'এ-সব প্রশ্নের জবাব পরে দেবো। এখন যা বলি, শোনো। বন্দুক আর রাম-দা নিয়ে আমি ভৈরবের ঘরে ঢুকবো। ঐ মোটা লাঠি কাঁধে করে তুমি দরজার বাইরে অপেক্ষা করবে। যদি আমার দরকার হয়, তোমাকে আমি ডাকবো। তখন তুমি লাঠি চালিয়ে শত্রু মারতে একটুও ইতঃস্তত করো না। এখন চলো।'

—'জো হুকুম, জেনারেল! তাহলে এই আমি 'কুইক-মার্চ' শুরু করলাম।'

ভৈরব টেবিলের সামনে বসে একমনে কি লিখছিলো। দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে দেখলো, দিলীপ ঘরে ঢুকে আবার দরজা ভেজিয়ে দিলো— তার পিঠে বাঁধা বন্দুক, হাতে রাম-দা!

প্রথমটা সে হতভম্বের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপর বিষম রাগে তার কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠলো।

দিলীপ কফিনটার দিকে তাকিয়ে দেখলো, নিঃসাড় মৃত্যুর আড়ষ্টতা নিয়ে প্রাচীন মিশরবাসী সেই সুদীর্ঘ মানবের মৃতদেহটা কফিনের ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কোটরগত চক্ষে আজ জাগ্রত দৃষ্টির এতোটুকু আভাস নেই, তার মাংসহীন বিবর্ণ চামড়া-ঢাকা অস্থিসার দেহের ওপরে শত শত শতাব্দীর কুৎসিত জীর্ণতা মাখানো, লম্বা হাত তু'খানা অনাবশ্যক উপসর্গের মতো একান্ত অসহায় ভাবে দেহের তুইদিকে ঝুলছে— যদিও তার কাঁকড়ার দাড়ার মতো বাঁকানো নিষ্ঠুর হাতের আঙুলগুলো দেখলে মন যেন দমে যায়। কিন্তু চার হাজার বছরের ঐ পুরোনো 'শুঁটকো মড়া যে আবার ঐ কফিন ছেড়ে পৃথিবীর সবুজ মাটির ওপরে পদচালনা করতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা শুনলে পাগলও বোধহয় অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠবে!

দিলীপ রীতিমতো গদিয়ানি চালে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে যেন নিজের মনেই বললো, 'দেখছি, ধুনুচিতে আজ ধুনোও পুড়ছে না, প্যাপিরাস-পুঁথির মন্ত্রও কেউ পড়ছে না, জন্তু-মুখো দেবতাদের পূজোর আয়োজন নেই, মমিরও ঘুম এখনো ভাঙে নি!'

ঠোঁট ফাঁক করে হিংস্র দাঁতগুলো দেখিয়ে ভৈরব বললো, 'দিলীপবাবুর বোধ হয় ভ্রম হয়েছে। এটা তাঁর নিজের ঘর নয়!'

দিলীপ বললো, 'দিলীপবাবুর ভ্রম হয় নি। তিনি যে একটা হত্যাকারীর আস্তানায় এসেছেন, এ জ্ঞান তাঁর আছে।'

ভৈরব বললো, 'আমি যদি এখন ফোন করে পুলিশ ডাকি, তাহলে ঘরে ঢুকে কী দেখবে তারা? শান্তিপ্রিয় গোবেচারা ভৈরবের হাতে রয়েছে মাত্র একটি ফাউণ্টেন পেন আর মহাবীর দিলীপবাবুর পৃষ্ঠদেশে বাঁধা দোনলা বন্দুক আর হাতে চক্‌চক্ করছে মস্ত খাঁড়া!'

দিলীপ গাত্রোত্থান করে বললো, 'পিঠের বন্দুক এই আমি হাতে নিলাম আর হাতের এই রাম-দা উপহার দিলাম তোমাকে। এইবার তুমিও সশস্ত্র হলে তো?'

টেবিলের ওপরে স্থাপিত রাম-দার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভৈরব বললো, 'তারপর? রাম-দার সঙ্গে কি বন্দুকের যুদ্ধ হবে?'

দিলীপ বুঝতে পারলো, ভৈরব মনের ভাব চাপবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু ভয়ে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠছে! সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'রাম-দা নিয়ে তুমিও উঠে দাঁড়াও! তারপর ঐ মমিটাকে কেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ফেলো!'

শুক্‌নো হাসি হেসে ভৈরব বললো, 'ওঃ খালি এই? মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা?'

— 'হ্যাঁ, খালি এই! শুনলাম, রাজার আইন তোমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু আমার নিজের একটা আইন আছে। তার কাছে তোমার মুক্তি নেই। তোমার ঘরের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো। বেলা আটটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। এই আমি বন্দুক তৈরি রাখলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি যদি ঐ মমিটাকে কেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে না ফেলো, বন্দুকের গুলিতে আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দেবো।'

— 'আপনি আমাকে খুন করবেন ?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'কি কারণে ?'

— 'তোমার শয়তানির জন্যে।...ভৈরব, এক মিনিট গেলো।'

— 'কিন্তু কী শয়তানি আমি করেছি ?'

— 'বলা বাহুল্য। তুমিও জানো, আমিও জানি।'

— 'এ হচ্ছে ধাপ্পা দিয়ে ভয় দেখানো।'

— 'দু' মিনিট কাটলো।'

— 'ধাপ্পায় আমি ভয় পাবো না। আপনি হচ্ছেন পাগল— বিপদ জনক পাগল। আপনার কথায় আমার নিজের সম্পত্তি নষ্ট করবো কেন ? ওটি মূল্যবান মমি।'

— 'তোমাকে ওটা কেটে খান্ খান্ করে আর পুড়িয়ে ফেলতে হবেই।'

— 'আমি ও-সব কিছুই করবো না।'

— 'চার মিনিট কাটলো।'

দিলীপ বন্দুক তুলে তার নলটা ফেরালো ভৈরবের দিকে। তার মুখে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ভাব।

— 'ভগবানের নামে শপথ করছি, আটটা বাজলেই আমি তোমাকে পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মারবো! এর জন্যে আমি ফাঁসি যেতেও রাজি! এখনো উঠলে না? ঘড়িতে আটটা বাজছে! তবে মরো'— দিলীপ ঘোড়ার ওপর আঙুল রাখলো।

ভৈরব উঠে পড়ে ভয়ার্ত মুখে বললো, 'রক্ষা করুন! আমি আপনার কথামতোই কাজ করবো!'— বলেই সে তাড়াতাড়ি রাম-দা তুলে মমির সরুঙ্গে গলার ওপরে এক কোপ বসিয়ে দিলো। কাটা

মুণ্ডটা খটাস করে মাটির ওপরে পড়ে গেলো! তারপর মড়ার ওপরে কোপের পর কোপ পড়তে লাগলো, ভৈরব এক-একবার কোপ বসায়, আর এক-একবার মহাভয়ে ফিরে দেখে, দিলীপ কি করছে! মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই সব শেষ— ঘরের মেঝের ওপরে শুকনো মড়ার খণ্ড-বিখণ্ড হাত, পা, বাহু, নাক, মুখ, চোখ, ধড় ও কুচি-কুচি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো।

দিলীপ বজ্রগম্ভীর স্বরে বললো, 'ওর ওপরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগাও!'

ভৈরব নীরবে তার হুকুম তামিল করলো। শুকনো মড়ার টুকরোগুলো কাগজের মতো সহজেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো— বিশ্রী দুর্গন্ধে ও আগুনের তাপে টেঁকা দায়!

কিন্তু দিলীপ তখনো বন্দুক তুলে স্থির মুখে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভৈরব ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো, 'কেমন, হয়েছে তো?'

— 'না। বার করো তোমার সেই মন্ত্র-লেখা প্যাপিরাস পাতার পুঁথি। সেটাও আগুনে ফেলে দাও।'

কাতর স্বরে ভৈরব বললো, 'না, না, তাথেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না! দিলীপবাবু, আপনি কি রত্ন নষ্ট করতে চাইছেন, জানেন না! সে পুঁথি জ্ঞানের আধার। তেমন পুঁথি পৃথিবীতে আর নেই!'

— 'ভৈরব, পোড়াও সেই পুঁথি!'

— 'দিলীপবাবু, আমার কথা শুনুন। পুঁথিখানা পোড়াতে বলবেন না। ও-পুঁথি আমাদের দু'জনের সম্পত্তি হয়ে থাক। ওর সব কথা আপনাকে আমি নিজে শিখিয়ে দেবো। তাহলে আমরা দু'জনে হবো বিশ্বজয়ী!'

টেবিলের কোন টানায় পুঁথিখানা আছে, দিলীপ তা জানতো। সে এগিয়ে গিয়ে সেখানা টেনে বার করলো।

ভৈরব হাউমাউ করে উঠে তার হাত থেকে সেখানা কেড়ে নিতে এলো। কিন্তু দিলীপ এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে পুঁথিখানা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করলো।

পুঁথিখানা যখন পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেলো, দিলীপ ফিরে হাসিমুখে বললো, 'ভৈরবচন্দ্র, এখন তুমি হলে নির্বিষ সাপের মতো। আর আমার এখানে কোনো কাজ নেই— বিদায়!'*

* বিদেশী কাহিনীর অনুসরণে

বন্দী-আত্মার কাহিনী

বিখ্যাত 'স্পিরিচুয়ালিষ্ট' অনন্তবাবুর বাড়িতে বসে এক সন্ধ্যায় আলাপ করছিলাম।

কথা হচ্ছিলো প্রেত-তত্ত্ব নিয়ে।

আমি ডাক্তার। কিঞ্চিৎ পসারও যে আছে, নিজের মুখে এ-কথা বললে গর্ব করা হবে না।

'আত্মা' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব যে আদৌ আছে, আমি আজ পর্যন্ত হাতে-নাতে এমন প্রমাণ কখনো পাইনি। জন্ম, মৃত্যু ও দেহগত সমস্ত রহস্য একেবারে আমার নখদর্পণে, এমন অভিমান আমার পুরোমাত্রায় আছে।

কিন্তু অনন্তবাবু আমার সেই অভিমানে আঘাত দিতে চান। তিনি বলেন, জন্ম ও মৃত্যু কথার কথা মাত্র, দেহটা সাময়িক খোলস ছাড়া আর কিছু না, জন্মের আগেও এবং মৃত্যুর পরেও আত্মা বেঁচে থাকে ইত্যাদি।

খুব জোরে তর্ক চালিয়েছি। আমিও বুঝবো না, অনন্তবাবুও না বুঝিয়ে ছাড়বেন না। তর্কটা যখন রীতিমতো জমে উঠেছে, হঠাৎ রাস্তায় উঠলো ভীষণ গোলমাল। সচমকে মুখ ফিরিয়ে আমরা জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি, পথের ওপাশের ফুটপাথের ওপরে সুরেনবাবুর বাড়ির সামনে মস্ত ভিড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলাম।

ফুটপাথের ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন সুরেনবাবু নিজেই। তিনি কেবল আমাদের প্রতিবেশীই নন, আমাদের দু'জনের বিশেষ বন্ধুও বটে।

ভিড়ের একজন লোক জিজ্ঞাসার উত্তরে বললো, 'বারান্দার ওপর থেকে উনি পড়ে গিয়েছেন।'

আমরা ধরাধরি করে সুরেনবাবুকে নিয়ে তাঁর বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। তারপর বৈঠকখানার তক্তপোশের ওপরে শুইয়ে রেখে তাঁকে পরীক্ষা করে বুঝলাম, তাঁর দেহের ভেতরের অবস্থা ভয়াবহ।

অনন্তবাবুকে বললাম, 'এঁর মৃত্যুর আর দেরি নেই।'

অনন্তবাবু বললেন, 'কি সর্বনাশ, তাহলে উপায়? সুরেনের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সবাই যে হরিদ্বারে তীর্থ করতে গিয়েছে! বাড়িতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। এখন তাহলে আমরা কি করবো? তাঁদেরও তো প্রয়োজন।'

বললাম, 'আমার পরীক্ষা ভুল হতে পারে। দাঁড়ান, ডাক্তার পি, ঘোষকে ডাকি।'

ডাক্তার পি, ঘোষ হচ্ছেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের অন্যতম। ফোনে খবর পেয়েই এসে হাজির হলেন। সুরেনবাবুকে পরীক্ষা করে বললেন, 'কোনো আশা নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ইনি মারা যাবেন।'

আমি বললাম, 'অনন্তবাবু, আপনার যদি ঠিকানা জানা থাকে, তবে সুরেনবাবুর স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদেরকে এক্ষুনি টেলিগ্রামে খবর দিন।'

— 'ঠিকানাও জানি, টেলিগ্রামও যেন করে দিচ্ছি। কিন্তু আপনারা বলছেন, সুরেন এখনি মারা যাবে! হরিদ্বার এখান থেকে একদিনের পথ নয়, সুরেনের আর কোনো আত্মীয় নেই। মৃতদেহ নিয়ে আমরা কি করবো। ডাঃ ঘোষ, দেখুন— আপনাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান যদি এঁকে কোনোরকমে আর দিন-তিনেক বাঁচিয়ে রাখতে পারে, ভালো হতো তাহলে।'

ডাক্তার ঘোষ মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এতোক্ষণে মৃত্যু ওঁর দেহের ভেতরে প্রবেশ করেছে। এ অসাধ্য সাধন অসম্ভব! উনি মারা পড়লেন বলে।'

অনন্তবাবু অত্যন্ত উত্তেজিতের মতো একবার ঘরের এদিক থেকে ওদিক ঘুরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'মত্যুর পরেও কি দেহের ভেতরে আত্মার সাড়া পাওয়া অসম্ভব, ডাক্তার ঘোষ?'

ডাক্তার ঘোষ সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি কী বলছেন?'

আমিও তখন হতভম্বের মতো অনন্তবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম।

আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'আপনারা 'হিপ্‌নটিজম্‌'-এর কথা নিশ্চয়ই জানেন? বাংলায় যাকে বলে সম্মোহন বিদ্যা বা যোগনিদ্রা?'

আমি বললাম, 'জানি। আর এও জানি যে, 'হিপ্‌নটিজম্‌'-এ আপনার দেশজোড়া খ্যাতি আছে, অনন্তবাবু। কিন্তু তার কথা এখন কেন?'

— আমি এখনি একবার সুরেনকে সম্মোহন-বিদ্যায় অভিভূত করতে চাই।'

— 'তাতে ফলে সুরেনবাবু কি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবেন?'

—'মৃত্যুর কবল থেকে কোনোদিন কোনো মানুষই কোনো মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। তবে যোগনিদ্রার একটা আশ্চর্য মহিমা আছে। তার দ্বারা নিশ্চয়ই একটা কিছু ফল পাওয়া যাবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। সেটা যে কি, তা অবশ্য আমি বলতে পারছি না, তবে— না, থাক! আর কথা বাড়াবার সময় নেই। সুরেনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ওর শেষ মূহূর্ত উপস্থিত!'

সুরেনবাবুর মুখ তখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভীষণ হয়ে উঠেছে, তাঁর দুই বিস্ফারিত চোখের তারা চারিদিকে ঘুরছিলো। অনন্তবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সুরেনবাবুর দেহের ওপরে বিশেষ কৌশলে হস্তচালনা করতে লাগলেন।

ডাক্তার ঘোষ গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। তাঁর চোখে নিদারুণ অবিশ্বাসের ছায়া।

কি আর করি, আমি অবাক হয়ে অনন্তবাবুর কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলাম।

কয়েক মুহূর্ত পরে তেমনিভাবে হস্তচালনা করতে করতেই অনন্তবাবু দৃঢ়স্বরে বারংবার ডাকতে লাগলেন, 'সুরেন! ও সুরেন!'

প্রথমটা সুরেনবাবুর কোনোরকম ভাবান্তরই হতে দেখা গেলো না। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর চোখের তারা স্থির ও স্বাভাবিক হয়ে এলো।

অনন্তবাবু বললেন, 'সুরেন, আমার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো।'

সুরেনবাবুর চোখ অনন্তবাবুর চোখের দিকে ফিরলো— সঙ্গে সঙ্গে তার সারা দেহ একবার শিউরে উঠলো।

— 'সুরেন !'

স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব হলো, 'কি ?'

— 'তোমার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে ?'

— 'না।'

— 'তবে ?'

জবাব নেই। আবার তিন-চারবার ডাকাডাকির পর সুরেনবাবু চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ ?'

— 'তুমি কি ঘুমোচ্ছো ?'

— 'হ্যাঁ। আর আমায় ডেকো না তোমরা, আমাকে ঘুমোতে ঘুমোতে মরতে দাও।'

— 'তবে তুমি ঘুমোও। কাল সকালে আমি তোমাকে ডাকবো। তোমাকে সাড়া দিতেই হবে।'

— 'সাড়া দেবো। এখন আমি মরছি। আমাকে ঘুমোতে দাও।' সুরেনবাবুর দুই চোখ মুদে গেলো।

ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'আপনি কি ভাবছেন, কাল সকালে ওঁর সাড়া পাওয়া যাবে ?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'অসম্ভব ! তাহলে তো চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

— 'বেশ, কাল সকালে এসে দেখবেন।'

পরদিনের সকাল। বহুকাল ধরে প্রেততত্ত্ব নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করে করে গোঁড়ামির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অনন্তবাবু বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, এই কথা বলাবলি করতে করতে

ডাঃ ঘোষের সঙ্গে আমি সুরেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, বৈঠকখানার সমস্ত জানলা বন্ধ করে আধো-অন্ধকার ঘরে সুরেন বাবুর দেহের পাশে অনন্তবাবু চুপ করে বসে আছেন। সমস্ত নিথর নিঝুম।

ডাক্তার ঘোষ সুরেনবাবুর দেহ পরীক্ষা করে বললেন, 'দেহ শীতল আর আড়ষ্ট। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্তব্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। কাল রাত্রেই এঁর মৃত্যু হয়েছে।' তারপর জিগ্যেস করলেন, 'অনন্তবাবু, এখনো কি আপনার সন্দেহ দূর হয়নি?'

অনন্তবাবু উত্তর দিলেন না।

সুরেনবাবুর গায়ের রং রীতিমতো হল্‌দেটে হয়ে গেছে। তাঁর দুই চোখ বোজা। মুখ হাঁ করা।

আমি বললাম, 'আর কেন অনন্তবাবু, এবার এঁর সৎকারের ব্যবস্থা করুন।'

— 'হরিদ্বারে তার করে দিয়েছি। আগে সুরেনের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা আসুক।'

— 'সে কি! ততোক্ষণে ওঁর দেহটার কি অবস্থা হবে, বুঝতে পারছেন, আপনি?'

— 'দেহের কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছি না। তবে সুরেনকে আর একবার ডেকে দেখা দরকার।'

ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আর কাকে ডাকবেন!'

— 'সুরেনকে।···সুরেন, সুরেন!'

কোনো সাড়া নেই।

ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'কি আশ্চর্য! মড়া কখনো কথা কয় নাকি আবার?'

— 'সুরেন, সুরেন! আমি অনন্ত, তোমাকে ডাকছি। সুরেন, একবার সাড়া দাও।'

স্তম্ভিত নেত্রে দেখলাম সুরেনবাবুর ফাঁক করা ওষ্ঠাধরের ওপাশে জিভখানা ছটফট করছে যেন!

— 'সুরেন, সুরেন!'

সুরেনবাবুর চোয়াল ও ওষ্ঠাধর একটুও নড়লো না, কিন্তু তাঁর হাঁ-করা মুখবিবর থেকে অদ্ভুত বিকৃত স্বরে এই কথাগুলো বেরোলো— 'আঃ, আবার কেন? আমার মৃত্যু হয়েছে। আমি এখন ঘুমোচ্ছি।'

সে কী স্বর! মনে হলো, সুরেনবাবুর মুখ যেন কথা কইছে না, সে-স্বর আসছে যেন বহুদূর থেকে— যেন গভীর কোনো গিরিগুহার অতলতার ভেতর থেকে।

একটা অজানা ভয়ে আমার গা কাঁপতে লাগলো। ডাক্তার ঘোষ যেন ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন দেয়ালে পিঠ রেখে। — তাঁর মুখ-চোখ উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

— 'সুরেন, তুমি কি এখনো ঘুমিয়ে আছো?'

— 'না না, আমি ঘুমোচ্ছিলাম বটে! কিন্তু এখন আমার মৃত্যু হয়েছে।'

— 'সুরেন, আবার তুমি ঘুমিয়ে পড়ো!...ডাক্তার ঘোষ, এখন আপনার কোনো বক্তব্য আছে?'

ডাক্তার ঘোষ ক্ষীণস্বরে বললেন, 'না।'

— 'সুরেনবাবুর কণ্ঠস্বর কি রকম মনে হলো?'

— 'ভয়ানক! মানুষের গলার ভেতর থেকে যে ওরকম বীভৎস আওয়াজ বেরোতে পারে, এটা ধারণারও অতীত। ও তো কণ্ঠস্বর নয়— যেন একটা অমানুষিক ধ্বনি মাত্র!'

— 'কিন্তু ও ধ্বনি তো অপর কারো নয়, ও ধ্বনি তো আসছে সুরেনেরই গলার ভেতর থেকে। সুরেনকে আজ আর ব্যস্ত করবো না, ও এখন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়েই থাক। বোধহয় পরশুদিনই সুরেনের স্ত্রী এসে পড়বেন, তখন আর একবার আপনাকে ডাকবো, নিশ্চয়ই আসবেন।'

আজ অনন্তবাবুর আহ্বানে আবার সুরেনবাবুর বাড়িতে চলেছি আমরা দু'জনে। সন্তানদের নিয়ে সুরেনবাবুর স্ত্রী কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁর নাম হৈমবতী।

ক্রন্দনধ্বনি শুনতে শুনতে সুরেনবাবুর বৈঠকখানার ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। সুরেনবাবুর আড়ষ্ট দেহ ঘিরে বসে আছেন হৈমবতী, তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়ে। সকলের চোখে জল, কণ্ঠে আর্তনাদ।

অনন্তবাবু বসে আছেন মৃতদেহের ডান পাশে। মুদিত নেত্রে তিনি মূর্তির মতো স্থির— যেন ধ্যানমগ্ন।

সুরেনবাবুর দেহ যেমনভাবে দেখে গিয়েছিলাম তেমনিভাবেই আছে। হৈমবতী গতকাল এসেছেন। হিসেব করে দেখলাম সুরেনবাবুর মৃত্যুর পর পাঁচদিন কেটে গিয়েছে। একে গ্রীষ্মকাল, তায় এ বছর আবার অতিরিক্ত গরম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সুরেনবাবুর গায়ের রং হলদে এবং দেহ মৃত্যু-শীতল ও কাঠ আড়ষ্ট হয়ে গেলেও একটুও পচেনি বা ফুলে ওঠেনি।

অনন্তবাবু চোখ খুলে বললেন, 'এই যে, আপনারা এসেছেন। হৈমবতী বড়োই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাহলে সুরেনকে আর একবার জাগাবার চেষ্টা করি?'

সকলের সম্মতি নিয়ে মৃতদেহের ওপরে খানিকক্ষণ হস্তচালনা করে অনন্তবাবু ডাকলেন, 'সুরেন! সুরেন! সুরেন!...'

প্রায় দশ-বারোবার নাম ধরে ডাকার পর মৃতদেহের আড়ষ্ট, হাঁ-করা মুখের ভেতরে জিভখানা হয়ে উঠলো আবার সেই রকম ভয়াবহরূপে চঞ্চল।

হৈমবতী স্বামীর বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রন্দনস্বরে বলে উঠলেন, 'ওগো, তাহলে তুমি সত্যিই বেঁচে আছো?'

ছেলে-মেয়েরাও 'বাবা, বাবা' বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো।

অনন্তবাবু বললেন, 'কথা কও সুরেন, কথা কও!'

আবার শোনা গেলো সেই বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর— যা আসছে যেন বাড়ির বাইরে পৃথিবীর অতল পাতালের ভেতর থেকে— 'আঃ, আবার কেন ডাকাডাকি? বলেছি তো, আমি বেঁচে নেই!'

হৈমবতী বললেন, 'ওগো, এই তো তুমি বেঁচে আছো— এই তো তুমি কথা কইছো! একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখো। আমরা সবাই এসেছি।'

অনন্তবাবু বললেন, 'হৈম, স্থির হও— শান্ত হও। সুরেন এখন আমি ছাড়া আর কারোর কথার জবাব দেবে না। সুরেন, হৈম তোমাকে ডাকছে।'

মৃতদেহ বললো, 'ডেকে লাভ নেই। আমার মৃত্যু হয়েছে।'

— 'তোমার যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে তুমি কথা কইছো কেমন করে?'

— 'আমি এখন আমার মৃতদেহের ভেতর বন্দী হয়ে আছি।'

— 'বন্দী! কেন?'

— 'তুমি যেতে দিচ্ছো না বলে।'

অনন্তবাবু এতোক্ষণ সমানে হস্তচালনা করছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি যে তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলভাবে নিযুক্ত করেছেন, সেটা বোঝা যায় তাঁর চেহারা দেখে। তাঁর কপালের ওপরে শিরাগুলো এবং কণ্ঠার ওপরে মাংসপেশীগুলো দ্বিগুণ ফুলে এবং মুখের রং রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ তিনি হস্তচালনা বন্ধ করে খানিকক্ষণ নীরবে অত্যন্ত হাঁপাতে লাগলেন। তারপর ফিরে বললেন, 'হৈম, আর কেন? তোমার জন্যেই সুরেনকে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলাম। এইবার ওর ঘুম ভাঙাই, ওর আত্মাকে মুক্তি দিই, তোমরা মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করো।'

হৈমবতী এমন তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন যে, আমাদের কান যেন ফেটে গেলো। তারপর তিনি মাটির ওপরে আছড়ে পড়ে বললেন, 'অনন্তবাবু— অনন্তবাবু, আমাকে দয়া করুন! উনি এ অবস্থাতে থাকলেও আমার সুখ। মনে করবো, আমি বিধবা হইনি।'

অনন্তবাবুর মুখে ফুটে উঠলো এক সঙ্গে ব্যথা, দয়া ও মমতার ভাব। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, তুমি শান্ত হও— সংযত হও। তারপর আমার যা করবার করবো— মনে রেখো মা, আমি হচ্ছি তুচ্ছ মানুষ। মৃত্যু হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা, তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আমারও সর্বনাশ হবে, আমিও বাঁচবো না।'

অনন্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এতোক্ষণ আমরা ছিলাম দুঃস্বপ্নে অভিভূতের মতো, অসাড় হয়ে। অনন্তবাবু উঠে দাঁড়াতেই সাড় হলো আমাদের।

আমি বললাম, 'আমারও। বাইরে বেরোতে পারলেই বাঁচি!'

মড়ার মৃত্যু

অনন্তবাবুও হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমারও ঐ ইচ্ছা। চলুন, আমরা বাড়ি যাই।'

তারপর কেটে গেছে ছ'মাস। সুরেনবাবুর দেহ পড়ে আছে বৈঠকখানার তক্তপোশে। তাতে তখনো পচ্ ধরেনি।

একদিন অনন্তবাবুর জরুরি আহ্বান এলো। তাঁর বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে শুনলাম সুরেনবাবুর বাড়ির ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ। অনন্তবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, একখানা চেয়ারের ওপরে বসে আছেন ডাক্তার ঘোষ। অনন্তবাবু ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর ভাবভঙ্গী ক্রুদ্ধ, বিরক্ত।

আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'কান্না শুনতে পাচ্ছেন?'

— 'হ্যাঁ, ব্যাপার কি?'

— 'আজ সুরেনের যোগনিদ্রা ভাঙবো, তাই ঐ কান্না। হৈমবতীর ইচ্ছা, সুরেনের দেহ ঐভাবেই থাকুক। কিন্তু তাও কি সম্ভব? আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার নিজের স্বাস্থ্য দিনে দিনে ভেঙে পড়ছে— এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা আর কতোদিন সহ্য হয়? প্রবল ইচ্ছা-শক্তিরও সীমা আছে।'

— 'এই জন্যেই আমাকে ডেকেছেন?'

— 'আপনাকেও, ডাক্তার ঘোষকেও। আর একটা কি কথা জানেন? নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, প্রকৃতির আইন ভঙ্গ করছি। ভগবান সুরেনের আত্মাকে যে অদৃশ্য পথে নিয়ে যেতে চান, আমি হয়েছি তার বাধার মতো। এ এক মস্ত অপরাধ, এজন্যে হয়তো আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। হয়তো একটা প্রাণহীন কুৎসিত দেহের কারাগারে বন্দী হয়ে সুরেনের আত্মাও অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করছে। না, আর নয়। আমি দৃঢ়

প্রতিজ্ঞা করেছি, এ ব্যাপারের ওপরে আজকেই যবনিকা ফেলে দেবো। কারোর মিনতি; কারোর অশ্রু আর আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আসুন. আপনারা। গোড়া থেকেই যখন সঙ্গে আছেন, তখন শেষ দৃশ্যটাও দেখুন।'

শেষ পর্যন্ত হৈমবতীকেও সম্মতি দিতে হলো।

অনন্তবাবু অনেক চেষ্টার পর তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই মৃতদেহের মধ্যে সুরেনবাবুর আত্মা বন্দী হয়ে আছে অভিশপ্তের মতো, দেহ থেকে বেরোতে না পারলে আত্মার গতি হবে না।

অনন্তবাবু দেহের পাশে বসে হস্তচালনা করতে করতে ডাকলেন, 'সুরেন, সুরেন, সুরেন!'

আমরা রোমাঞ্চিত দেহে, বিস্ফারিত নেত্রে রুদ্ধশ্বাসে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সাত-আট মিনিট কেটে গেলো, দেহ নিঃসাড়, নিস্পন্দ। অনন্তবাবুর কপাল থেকে দরদরধারে ঘাম ঝরতে লাগলো।'

— 'সুরেন, সুরেন! জাগো, সাড়া দাও। আমি অনন্ত, তোমাকে ডাকছি, সুরেন আমি কি ব্যর্থ হবো? সুরেনের আত্মা কি নেই? না না, তা তো হতে পারে না। যোগনিদ্রার প্রভাব না থাকলে দেহের অবস্থান হতো যে অন্যরকম! ···সুরেন, সুরেন, জাগো— তোমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হোক।'

এইবার উন্মুক্ত, দন্তকন্টকিত মুখবিবরের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে ছটফট করতে লাগলো জিভখানা।

— 'সুরেন!'

উত্তরে শোনা গেলো এক ভীষণ ও তীক্ষ্ণ আর্তধ্বনি! সে আর্তনাদ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, মানুষের কান কোনোদিন শোনেনি তেমন আর্তনাদ! ছেলে-মেয়েরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলো। হৈমবতী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। আমাদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো শোচনীয়!

— 'সুরেন, শান্ত হও ভাই, শান্ত হও!'

— 'শান্ত হবো? তোমরা জানো না, এই দেহের নরকে কি দুঃসহ যন্ত্রণা! নিশিদিন কাঁদছি আর ছটফট করছি— মৃত্যুর পরেও একি শাস্তি! আর কেন? আমাকে এবার মুক্তি দাও— মুক্তি দাও!' আজকের স্বর আরো বিকট ও ভয়াল এবং আসছে যেন আরো— আরো বেশি দূর থেকে।

অনন্তবাবু বললেন, 'তোমাকে মুক্তি দিলাম, সুরেন। ভেঙে যাক তোমার যোগনিদ্রা।'

পরমুহূর্তে অদ্ভুত একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্নের মতো দেখলাম, তক্তপোশের ওপর পড়ে রয়েছে সুরেনবাবুর দেহের বদলে একটা নর-কঙ্কাল এবং তার চারদিক ঘিরে গড়াচ্ছে বিগলিত মাংস-মেদ-মজ্জার তরল, বিবর্ণ ধারা। বিষম পুতিগন্ধে ঘরের বাতাস দুর্গন্ধ, বিষাক্ত!

···সভয়ে প্রাণপণে দৌড়ে বাইরে পালিয়ে এলাম।

মানুষের

প্রথম অ্যাডভেঞ্চার

১

হাঁহার ছেলে ধাঁধাঁর কাণ্ড

ঐতিহাসিকের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র! পৃথিবীর জীবন-কাহিনী কত বৃহৎ।

অগ্নিময় পৃথিবী কবে অপর গ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যপথে ছুটতে শুরু করলো, কোন ঐতিহাসিকই তার সঠিক তারিখ জানেন না। আন্দাজে হিসাব দেন ৩,০০০,০০০,০০০ বৎসর। সেই পৃথিবীর আগুন ধীরে ধীরে নিভে গেল শত শত যুগান্তরের পরে। পৃথিবীর বুকে হল সাগর সৃষ্টি এবং সেই সাগরে হল কোটি কোটি জীবাণুর সৃষ্টি! জীবাণুরা ক্রমেই বৃহত্তর আকার ধরতে লাগল, কেউ উঠল জল থেকে ডাঙায়, কেউ উড়ল ডাঙা থেকে শূন্যে! জীবেরা বাড়তে বাড়তে প্রায় চলন্ত পাহাড়ের মত হয়ে উঠল— যেমন ডাইনোসর! কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই সেদিন জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রকৃতি বারংবার পরীক্ষার পর বুঝলেন, মস্ত মস্ত জীব গড়া পণ্ডশ্রম, তারা পৃথিবীর উপযোগী নয়। তিনি একে একে অতিকায়, নির্বোধ ও হিংসুক জীবগুলোকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত করে দিতে লাগলেন। এবং নতুন গড়নের এক জীব তৈরি করে নিযুক্ত হলেন পরীক্ষায়। এই নতুন জীবেরা ডাইনোসরদের দেহের তুলনায় নগণ্য, কিন্তু মস্তিষ্ক হল তাদের অসাধারণ। তারা নিজেরাই নিজেদের নাম রাখলো, 'মানুষ'।

কবে যে তাদের প্রথম সৃষ্টি, মানুষরাই তা ঠিক জানে না। কেবল কেউ কেউ আন্দাজি হিসাবে বলে, দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বছর ধরে মানুষ পৃথিবীতে বাস করছে। এ-হিসাব মানলেও দেখি, আধুনিক মানুষের ইতিহাস অতি কষ্টে মাত্র ছয় হাজার বৎসর আগে গিয়ে পৌঁছোতে পেরেছে। বাকি দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার বৎসরের কোন হিসাবই নেই! অন্যান্য পণ্ডিতের মতে, মানুষ জন্মেছে আরও অনেক

— অনেক কাল আগে। যাঁর যা খুশি বলছেন, কারণ ভুল ধরবার মত নির্ভুল স্পষ্ট প্রমাণ কারুর হাতেই নেই!

কিন্তু পৃথিবী নিজে তার দেহের মাটি ও পাথরের স্তরে স্তরে লিখে রেখেছে মানুষের চমৎকার গল্প। মানুষ এতদিন পরে সেই সব গল্প আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমি তারই কতক-কতক শোনাব।

মিশর, বাবিলন, ভারত, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের সভ্যতা সবচেয়ে পুরানো— এ-কথা তোমরা জান। কিন্তু আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন কোন সভ্যতারই জন্ম হয়নি। সে যে কত হাজার বছর আগেকার কথা, তাও আমি বলতে পারব না।

ভারতবর্ষের তখন কোন নাম ছিল না। মানুষও তখন কোন দেশকে স্বদেশ বলে ভাবত না। তাদের সমাজও ছিল না। এক এক পরিবারভুক্ত মানুষেরা কিছুদিন ধরে এক এক জায়গায় বাস করত। তখন তারা চাষ-বাস করতে শেখেনি। বন থেকে ফল ও মূল কুড়িয়ে বা শিকার ধরে এনে তারা পেটের ক্ষুধাকে শান্ত করত। তারপর সেখানে ফল-মূলের বা শিকারের অভাব হলেই অন্য কোন দেশে গিয়ে হাজির হত। পৃথিবীতে তখন হিন্দু বা অন্য কোন ধর্ম বা জাতি বা ভাষারও সৃষ্টি হয়নি। মানুষ কথা কইত বটে, কিন্তু তার কথার ভাণ্ডারে বেশি শব্দ ছিল না, তাই বেশি কথাও সে বলতে পারত না, ঠারে-ঠোরে ইশারাতেই অনেক কথার কাজ সারত। কেউ লিখতে জানত না তখন শহর বা গ্রামের স্বপ্নও কেউ দেখেনি। যখন কেউ কোথাও স্থায়ী হয়ে বাস করেনা তখন শহর বা গ্রাম বসাবার দরকারই বা কি? ঐ কারণেই আজও বেদুইন প্রভৃতি জাতিদের দেশে শহর বা গ্রামের বিশেষ অভাব।

উত্তর-পূর্ব ভারতে হিমালয়ের নিকটবর্তী এক দেশ। এইখানেই উঁচু পাহাড়ের গুহায় একটি পরিবার বাস করে।

ROY

পরিবারের কর্তার নাম হাঁহাঁ। গিন্নির নাম হুয়া। তাদের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলে তিনটির বয়স যথাক্রমে চব্বিশ, কুড়ি ও আট বৎসর। বড় মেয়ের বয়স ষোল ও ছোট মেয়ের এক বৎসর। তাদের আরও ছেলে-মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু তারা বেঁচে নেই।

গুহার ধারে একখানে বড় পাথরের উপরে বসে হাঁহাঁ সবিস্ময়ে দূর অরণ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল।

হাঁহাঁ মানুষ বটে, কিন্তু তাকে দেখলে ভয়ে তোমাদের বুক কেঁপে উঠবে। তার মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল— তেল ও জলের অভাবে কটা। কেবল মাথায় নয় সর্বাঙ্গেই রাশি রাশি বড় বড় চুল বা লোম। রং কালো কুচ্‌কুচে। কপাল ভয়ানক ছোট, ভুরুর উপরকার অংশটা আবার সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দুই চোখে তীব্র বন্য ভাব। নাক থ্যাব্‌ড়া। শিকারী জানোয়ারের মত বা ছবির রাক্ষসের মত ধারালো ও ভীষণ দাঁত। চিবুক নেই বললেই হয়। বিষম চওড়া বুক। হাতে এবং বুকের পাশে ও তলায় লোহার মত কঠিন পেশীগুলো ঠেলে ঠেলে উঠছে। আজানুলম্বিত বাহু দেহের তুলনায় ছোট, মোটা মোটা পা-দু'খানা বাঁকা, তাই তাকে হেলে-দুলে হাঁটতে হয় এবং হাঁটবার সময়ে সে পায়ের চেটো সমানভাবে মাটির ওপরে ফেলতে পারে না। হাঁহাঁকে হঠাৎ দেখলে তোমরা গরিলা বলে মনে করবে, কিন্তু সে গরিলা নয়। লক্ষ্য করলেই দেখবে, সে কাপড় পরতে জানে— যদিও তার কাপড় হচ্ছে চামড়ার! আমরা যেমন করে গামছা পরি, হাঁহাঁও কাপড় পরে সেই ধরনে। হাঁহাঁ হাসতে জানে, কথা কইতে পারে। কাপড় পরা এবং হাসতে ও কথা কইতে পারা হচ্ছে মনুষ্যত্বের লক্ষণ। য়ুরোপের পণ্ডিতরা তখনকার মানুষদের নাম দিয়েছেন 'নিয়ান্‌ডের্টাল মানুষ।'

হাঁহাঁ সবিস্ময়ে যে দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল, সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে ভীষণ দাবানল— আকাশের একটা দিকে জুড়ে! লক্ষ লক্ষ শিখা বাহু বাড়িয়ে দাবানল যেন আকাশকেও গ্রাস করছে!

ঐ দাবানল জ্বলছে যে-বনে, ঐখানেই হাঁহাঁ, বউ আর তার সন্তানদের নিয়ে একটি গুহায় বাস করত। কিন্তু দাবানলের কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্য সে এই নতুন বাসায় পালিয়ে এসেছে।

হাঁহাঁ মাঝে মাঝে এইরকম দাবানল দেখে বটে, কিন্তু তার রহস্য বুঝতে পারে না। সে তাকে জীবন্ত, ক্ষুধার্ত ও ভয়াবহ কোন দেবতা বলে মনে করে। তার ভয়ও হয়, ভক্তিও হয়। দাবানলের অপূর্ব শক্তিও সে দেখেছে। যে-রাতের অন্ধকার তার জীবনের অভিশাপের মত, যে তার চোখ অন্ধ করে, বুকে বিভীষিকা জাগায়, একমাত্র দাবানলকে দেখলেই সে দূরে পালিয়ে যায়। অন্ধকারকে তাড়াবার কোন উপায় জানা নেই, কারণ সে আগুন সৃষ্টি করতে পারে না। তারপর, ম্যামথ-হাতি, রোমশ-গণ্ডার ও গুহা-ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র ভয়ঙ্কর জন্তুরা ঐ দাবানলের কোপে পড়লে কত সহজে ছট্‌ফটিয়ে মারা যায়, সেটাও সে স্বচক্ষে দেখেছে।

হাঁহাঁ তাই দাবানলকে দেখতে দেখতে ভাবছিল, ওর খানিকটা যদি আমার হাতে পাই, তাহলে রাতের অন্ধকারকে আর সমস্ত জীব-জন্তুকে আমি জব্দ করতে পারি!

হাঁহাঁ নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, পাহাড়ের তলা দিয়ে দলে দলে ম্যামথ-হাতি রোমশ-গণ্ডার, বন্য-বৃক্ষ, বুনো কুকুর, নেকড়ে বাঘ ও হরিণ দাবানলের ভয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে! সে চেঁচিয়ে বউকে ডাকল, হুয়া! হুয়া!

হুয়া গুহার ভিতরে বসে বসে রাতের খাবার তৈরি করছিল। কতকগুলো বুনো গাছের থেঁতো-করা শিকড়, গোটাকয়েক ফল আর পাঁচটা ইঁদুর। নতুন জায়গায় এসে হাঁহাঁ এখন শিকারের সন্ধান পায়নি, তাই আজ আর এর চেয়ে ভাল খাবার হয়ত জুটবে না। ইঁদুরগুলোকে হুয়া নিজেই গুহার ভিতরে ধরেছে।

স্বামীর ডাকে সে গুহার ভিতর থেকে ছোট মেয়েকে কোলে করে বেরিয়ে এল। তারও চেহারা অনেকটা হাঁহাঁর মতই দেখতে বটে,

কিন্তু আকারে আরও ছোট এবং তার মুখের ভাবও ততটা কঠোর নয়।

হাঁহাঁ শুধোলো, টুটু আর ঘটু কোথায়?

টুটু আর ঘটু হচ্ছে বড় ও মেজো ছেলের নাম।

হুয়া কোন উত্তর না দিয়ে বনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। হাঁহাঁ বুঝলো, তারা বনে শিকার খুঁজতে গিয়েছে। তার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল, কারণ বনে আজ দাবানলের ভয়ে অগুন্তি জন্তুর আমদানি হয়েছে, শিকারের পক্ষে সে-স্থান নিরাপদ নয়।

হুয়া হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। হাঁহাঁ চম্‌কে ফিরে দেখল, হুয়া সভয়ে পাহাড়ের উপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেইদিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল, একটা প্রকাণ্ড গুহা-ভল্লুক পাহাড়ের অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে তাদের দিকেই কট্‌মট্‌ করে চেয়ে আছে।

হাঁহাঁ তাড়াতাড়ি পায়ের তলা থেকে তার বর্শাটা তুলে নিলো। একটা বাঁশের ডগায় চক্‌মকি পাথরের ফলা বসিয়ে বর্শাটা তৈরি করা হয়েছে। তখন পৃথিবীতে কেউ লোহা আবিষ্কার করতে পারেনি, কাজেই চক্‌মকি-পাথর কেটেই অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা হত।

ঐ গুহা-ভল্লুকই ছিল তখনকার মানুষদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তখনকার মানুষদের মত সেকালের গুহা-ভল্লুকরাও এখনকার ভল্লুকের চেয়ে আকারে ঢের বেশি বড় হত এবং মানুষের মাংস তারা ভালবাসত। হাঁহাঁর দু'টি সন্তান ও বউ তাদেরই পেটে গিয়েছে।

হাঁহাঁ উদ্বিগ্ন স্বরে জিগ্যেস করল, ধাঁধাঁ কোথায়? ধাঁধাঁ তার ছোট খোকার নাম।

হুয়া বলল, ঝরণায়।

হাঁহাঁ ইশারায় হুয়াকে গুহার ভেতরে যেতে বলে নিজে চলল ধাঁধাঁর খোঁজে। বেশি দূরে নয়, ঝরণার কাছে বলেই হাঁহাঁ এই গুহাটিকে পছন্দ করেছিল।

হাঁহাঁ কিছুদূর অগ্রসর হয়েই শুনতে পেল, তার ছোট ছেলে খিল্ খিল্ করে সকৌতুকে হাসছে!

হাঁহাঁ অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল, ধাঁধাঁর এত হাসির ঘটা কেন?

কিন্তু পাহাড়ে-পথের মোড় ফিরতেই হাঁহাঁ যা দেখল, তা কেবল আশ্চর্য নয়— কল্পনাতীত! তার পা আর চলল না, সে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল!

ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ছে ঝরণার রুপোলী ধারা। তার পাশেই পাহাড়ের ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ধাঁধাঁ এবং তারও ওষ্ঠাধর দিয়ে ঝরে পড়ছে খুশিভরা কল-হাস্যের ধারা!

কিন্তু তার সামনেই ওটা কি ওটা কি?

হাঁহাঁ খুশি হবে কি, ভয় পাবে, বুঝতে পারছে না এবং নিজের চোখকেও সে বিশ্বাস করতে পারল না— হঠাৎ প্রচণ্ড স্বরে চেঁচিয়ে উঠে প্রকাণ্ড এক লম্ফ ত্যাগ করল!

২

খোকা-আগুনের আগমন

হাঁহাঁ যা দেখল, তা হচ্ছে, এই পাহাড়ের এক অংশ সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে! এবং সেই সব ধাপ দিয়ে লাফাতে লাফাতে ও ঝর্ঝর-গীত গাইতে গাইতে নেমে আসছে ছোট্ট একটি ঝরণা— শিশুর মত সকৌতুকে! অস্তোন্মুখ সূর্যের রঙীন আলো তার নাচের ভঙ্গীর সঙ্গে ঝল্মল্ করে উঠছে।

ডানপাশে পাহাড়ের কতক-সমতল একটা জায়গায় বসে আছে

ধাঁধাঁ, তার সামনেই একরাশ শুকনো ঘাস ও লতাপাতা— ঝড়ো বাতাসে উড়ে এসে সেখানে জড়ো হয়েছে।

সর্বপ্রথমে হাঁহাঁ দেখল, সেই শুকনো ঘাস লতাপাতাগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য একটা আগুনের ঢেউ! হাঁহাঁর মনে হল, দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ সে আকাশের কোল-জোড়া যে বিরাট দাবানল দেখছিল, এই ছোট্ট আগুনটা যেন তারই নিজের খোকা! ছুটোছুটি-খেলা খেলতে খেলতে সে যেন বাপের কাছ থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে!

কিন্তু সে দাবানলকেই দেখেছে— বিরাট রূপ ধরে যে আকাশকে গিলে ফেলতে চায়, বাতাসকে তাতিয়ে তোলে, ফল-মূলের লোভে বড় বড় অরণ্যকেই গ্রাস করে ফেলে, বনের জীব-জন্তুদের পিছনে পিছনে বিষম ধমক দিতে দিতে তাড়া করে আসে! একটুখানি জায়গায় এমন খোকা-আগুনকে হাঁহাঁ কোনদিন নাচতে দেখেনি!

একটু আগেই সে দাবানলকে দেখে ভেবেছিল, ওর খানিকটা যদি আমার হাতে পাই, তাহলে রাতের অন্ধকারকে আর সমস্ত জীব-জন্তুকে আমি জব্দ করে দিতে পারি!

এখন ভাবল, এই তো আগুন-খোকাকে হাতে পেয়েছি! এখন আমি যদি একে ধরে ফেলি! কিন্তু পর-মুহূর্তেই আর এক স্বপ্নাতীত দৃশ্য দেখে সে ভয়ানক চমকে উঠল।

তার ছেলে ধাঁধাঁ ওখানে দুই হাঁটু গেড়ে বসে কি করছে?

ধাঁধাঁর দুই হাতে দু'টি ছোট ছোট গাছের ডাল। সে মহা আনন্দে খিল্‌খিল্ করে হাসতে হাসতে ডালের উপরে ডাল রেখে ঘষছে, আর যে লতা-পাতা-ঘাসগুলো তখনও জ্বলেনি, সেগুলোও দপ্-দপ্ করে জ্বলে উঠছে!

হাঁহাঁর চোখ কি ভুল দেখছে? না, তা ত নয়! সত্যসত্যই ধাঁধাঁ নতুন নতুন খোকা-আগুন সৃষ্টি করছে যে! তার ছেলের এত শক্তি!

এই দেখেই হাঁহাঁ বিপুল উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে লম্ফ ত্যাগ করেছিল!

তার পরেই সে তীরবেগে দৌড়ে সেইখানে গিয়ে ধুপ্‌ করে বসে পড়ল এবং আগ্রহ ভরে আগুনকে দুই হাতে ধরতে গেল— এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে সেখান থেকে ছিট্‌কে দূরে সরে এল।

অ্যাঃ। এই খোকা-আগুনও এত জোর কামড়ে দেয়!

হাঁহাঁ খানিকক্ষণ সভয়ে জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ডাকল, ধাঁধাঁ!

— বাবা!

— খোকা-আগুনকে কোথায় পেলি?

ধাঁধাঁ তার হাতের ডাল দু'টি তুলে দেখাল। হাঁহাঁ তার কাছে গিয়ে অতি কৌতূহলে ডাল দু'টি নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। সে আগে যে দেশে ছিল সেখানে এ-জাতের গাছের ডাল দেখেনি। বুঝল, এ হচ্ছে, কোন গাছের ডাল।

শুধোলো, এ-ডাল কোথায় পেলি?

ধাঁধাঁ আঙুল দিয়ে পাহাড়ের একটা গাছ দেখিয়ে দিল।

সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে হাঁহাঁ বুঝল, হ্যাঁ, এ নতুন গাছই বটে!

তারপর ছেলের কাছ থেকে যে আশ্চর্য বিবরণ সংগ্রহ করলো সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই: ধাঁধাঁ নিজের মনে এখানে খেলা করছিল। হঠাৎ তার কি খেয়াল হয় ঐ গাছের দু'খানি ডাল ভেঙে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি ও ঘষাঘষি করতে থাকে, আর হঠাৎ অমনি আগুনের ফিন্‌কি দেখা দেয়।

হাঁহাঁ ছেলের কথা শুনতে শুনতে ফিরে দেখে, ঝরণার পাশে আর খোকা-আগুনের কোন চিহ্নই নেই! কোথায় পালাল সে?

দ্রুতপদে ছুটে এসে দেখে, সেখানে আগুনের বদলে পড়ে রয়েছে শুধু একরাশ ছাই!

হাতে পেয়েও আবার যাকে হারাল, তার শোকে হাঁহাঁ মাটির উপরে হতাশভাবে বসে পড়ল, কাঁদো-কাঁদো মুখ!

ধাঁধাঁ বাপের দুঃখের কারণ বুঝল। সে তখনি হাঁহাঁর হাত থেকে ডাল দু'টি নিয়ে মাটির উপরে বসে আবার ঠুকতে ও ঘষতে লাগল। খানিক পরেই আগুনের ফিন্‌কি দেখা দিল, কিন্তু পলাতক খোকা-আগুন আর ফিরে এল না। ধাঁধাঁ এর রহস্য ধরতে পারল না। সে জানে না যে একটু আগে দৈবগতিকে এখানে কতকগুলো শুক্‌নো ঘাস ও লতা-পাতা ছিল বলেই ফিন্‌কির ছোঁয়ায় আগুন সৃষ্টি করেছিল!

কিন্তু ধাঁধাঁর চেয়ে তার বাপ হাঁহাঁর বুদ্ধি বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। দুঃখিতভাবে বসে বসে ছেলের বিফল চেষ্টা দেখতে দেখতে ধাঁ করে তার মাথায় এক বুদ্ধি জাগল। তাড়াতাড়ি উঠে এদিক-ওদিক থেকে সে একরাশ শুকনো লতা-পাতা ও ঘাস কুড়িয়ে আনল। তারপর যেখানে তার ছেলে আগুনের ফিন্‌কি জাগাচ্ছে সেইখানেই সেইগুলি রেখে দিল। অল্পক্ষণ পরেই হল আবার খোকা-আগুনের আবির্ভাব!

আজ বিংশ-শতাব্দীর তোমরা হয়ত ভাবছ, আগুনের ফিন্‌কির মুখে শুক্‌নো লতা-পাতা রাখলে যে জ্বলে উঠবে, এ-সোজা বুদ্ধি তো খুব সহজেই সকলের মনে আসে। হাঁহাঁ তো আর মায়ের কোলের খোকা নয়, এটুকু সে আন্দাজ করতে পারবে না কেন?

কিন্তু এই উপন্যাস পড়তে পড়তে তোমরা সর্বদাই মনে রেখ, আমি আজানা অনেক হাজার বৎসর আগেকার গল্প বলছি। আজকের পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুরা যা জানে, তখনকার বুড়োমানুষদেরও সে জ্ঞান ছিল না। বিশেষ এক জাতের গাছের ডালে ডালে ঘষাঘষির ফলে আগুনের জাগরণ হয় এবং তার সাহায্যে শুকনো লত-পাতা-ঘাসে স্থায়ী আগুনের উৎপত্তি হয়, এ-জ্ঞান এখনকার বনমানুষ বা গরিলা প্রভৃতিরও নেই। বেশি কথা কী, তারা আজও আগুন ব্যবহার করতে শেখেনি, এখনও পৃথিবীর আদিম অন্ধকারেই বাস করছে।

আমাদের সুদূর অতীত যুগের পূর্বপুরুষদের জন্ম সেই আদিম অন্ধকারের গর্ভেই বটে, কিন্তু তারা মানুষ বলেই মস্তিষ্ক চালনা করে বুঝতে পেরেছিল যে আগুনের ফিন্‌কি শুকনো লতা-পাতাকে প্রজ্জলিত

করতে পারে। সেই অন্ধকার-যুগের এই আবিষ্কার এ-কালের যে কোন বড় আবিষ্কারের চেয়ে বড়! মানুষের মাথায় ঐ-শ্রেণীর মস্তিষ্ক যদি না থাকত, তাহলে আজ তোমাকে আমাকে গরিলা, ওরাং ও শিম্পাঞ্জীর মত গাছের ডালে-ডালেই নগ্নদেহে লাফালাফি করে বেড়াতে হত!

শুকনো লতা-পাতা-ঘাসে আবার সেই আগুনের শিখা নেচে নেচে উঠল, হাঁহাঁ অমনি প্রচণ্ড আনন্দে ধাঁধাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে নৃত্য করতে করতে চেঁচিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললো, ধাঁধাঁ, ধাঁধাঁ, ধাঁধাঁ! তুই দেবতা, আমার ঘরে শিশু হয়ে এসেছিস! তোর মন্ত্রেই খুশি হয়ে আগুন-ভগবান আজ আমাকে দয়া করলেন!

অনেকক্ষণ নৃত্য করে হাঁহাঁর সাধ যখন মিটল, তখন সে ধাঁধাঁকে কোল থেকে নামিয়ে আগে সেই গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াল! তারপর বেছে বেছে খুব ভাল দেখে গোছ কয়েক ডাল ভেঙে নিয়ে বলল, ধাঁধাঁ রে, এগুলো নিয়ে কি হবে বুঝেছিস?

ধাঁধাঁ বলল, উঁহু?

— এরা খোকা-আগুনকে ডেকে আনবে। খোকা-আগুন অন্ধকারকে বধ করবে।

আলো দিয়ে যে মানুষ অন্ধকার জয় করতে পারবে, সে-যুগে এও এক মস্তবড় কল্পনা! আজ বিদ্যুৎকে বন্দী করে রাতকে তোমরা দিন করে ফেলেছ, সে-কালের রাত্রি-বিভীষিকা তোমরা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না! শহর নেই, ঘর-বাড়ি নেই, পাড়া-প্রতিবেশীর সাড়া নেই, কোথাও কোনরকম আলোর চিহ্ন নেই, হু-হু করে কাঁদছে ভীরু বাতাস, মর্-মর্-মর্-মর্ করে ককিয়ে উঠছে মহা-অরণ্য, হুহুঙ্কার তুলে বিজন-বনের পথে-বিপথে হানা দিচ্ছে রক্তলোভী ভয়াবহ জন্তুরা— এবং তাদের সকলকে ঢেকে শব্দমাত্র সার করে রেখে চোখের সামনে বিরাজ করছে অনন্ত রহস্যময়, মৃত্যুর মতন ভীষণ, চিরমৌন, দয়ামায়াহীন পৃথিবীব্যাপী অন্ধকার— অন্ধকার— অন্ধকার! তারই মধ্যে শীতার্ত রাতে কাঁপতে কাঁপতে ও দুশ্চিন্তায় কুঁকড়ে পড়ে প্রতি মুহূর্তে সাক্ষাৎ-মরণের

স্বপ্ন দেখছে একটি অসহায় মানুষ-পরিবার! নিরেট আঁধারের কষ্টিপাথর ফুঁড়ে থেকে থেকে জ্বলে উঠছে আর নিভে যাচ্ছে কি ওগুলো? রোমশ-গণ্ডার, গুহা-ভল্লুক, নেকড়ে-বাঘের চোখ? শুকনো ঝরা-পাতার বিছানার উপর দিয়ে ক্রমাগত খড়্‌মড়্‌ খড়্‌মড়্‌ খড়্‌মড়্‌ শব্দ জাগিয়ে যেন এগিয়ে আর এগিয়ে, আরও এগিয়েই আসছে, কি ওটা রে? সর্পরাজ অজগর!

তখন বন্দুক জন্মায়নি, কোনরকম ধাতুতে গড়া অস্ত্রের কথাও কেউ জানেনা। মানুষের দুর্বল হাতের সম্বল কেবল লাঠি, পাথরের বর্শা, ছোরা-ছুরি! অন্ধকারের জন্য তাও ছুঁড়ে আত্মরক্ষা করবার উপায় নেই, কারণ কারুকেই চোখে দেখা যায় না! কেবল জ্বলন্ত চক্ষু, স্পষ্ট পদশব্দ—এবং প্রায়ই অতর্কিতে ভয়ঙ্কর দন্ত-নখরের সাংঘাতিক স্পর্শ।··· তারপরেই হয়ত শোনা গেল, কোলের খোকার কাতর চিৎকার! মা আকুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আঁধার-সমুদ্রের মধ্যে, কিন্তু খোকার বদলে হাতে পেল শক্ত মাটির বুক! তার অন্ধকারে অন্ধ-দৃষ্টি কিছুই খুঁজে পেল না—নীরব অন্ধকারের গর্ভে খোকার কণ্ঠ চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেল!···

আজকের আসন্ন সন্ধ্যায় পাহাড়ের উপরে সেই ভয়াল অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। বহুদূরের তাণ্ডব-নৃত্যশালা দৈত্যকে হত্যা করতে পারবে না, হাঁহাঁ তা জানত। কাজেই সে সময় থাকতে সাবধান হয়ে ছেলের হাত ধরে গুহার দিকে ফিরতে লাগল।

হাঁহাঁ আকাশের দিকে তাকিয়ে এই ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হচ্ছিল, ঐ সূর্য নিশ্চয়ই খুব ভাল ঠাকুর! মানুষকে ভালবাসেন তিনি। তার অন্ধকার-শত্রুকে নিপাত করবার জন্য তিনি রোজ সকালে পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই আবার পালিয়ে যান কেন?···

ঝরণার ঝির্‌-ঝিরে গান ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে। বাতাসও

ধীরে ধীরে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। অরণ্যও যেন মৌনব্রত অবলম্বন করবার চেষ্টা করছে।

পশ্চিমে রংমহলের আলো ক্রমে ক্রমে নিভে যাচ্ছে। পাহাড়ের আনাচ-কানাচ থেকে জাগছে নিশাচর পাখিদের নিদ্রাভঙ্গের সাড়া!

আচম্বিতে তীব্র এক আর্তরবে আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, ক্রুদ্ধ গুহা-ভল্লুকের ঘন ঘন গর্জন!

হাঁহাঁ তখনি বুঝতে পারল, এ হচ্ছে তার বউ হুয়ার কান্না! গুহা-ভল্লুক গর্জন করছে আর হুয়া কাঁদছে !

ধাঁধাঁ সভয়ে লাফ মেরে বাপের কাঁধের উপরে চড়ে বসল। চকমকি-পাথরের বর্শাটা প্রাণপণে চেপে ধরে হাঁহাঁ গুহার দিকে ছুটল, ঝড়ের মত।

৩

ভল্লুক আর ভল্লুক-বউ

কাঁধে খোকা-ধাঁধাঁ, এক হাতে চকমকি পাথরের বর্শা এবং আর এক হাতে আগুন-গাছের ডালের গোছা, হাঁহাঁ ধেয়ে চলেছে গুহার দিকে!

কী তার রুদ্র মূর্তি, কালভৈরবের কল্পনাও হার মানে! মাথার রুক্ষ কটা চুলগুলি ফণা-তোলা সাপের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছিটকে উঠছে, গায়ের বড় বড় লোমগুলি উত্তেজনায় সজারু-কাঁটার মতন থেকে থেকে খাড়া হয়ে উঠছে এবং স্বভাবত বন্য ড্যাবডেবে চোখ দু'টি আর বিকসিত হিংস্র দাঁতগুলি সাংঘাতিক ক্রোধে চকচকিয়ে উঠছে—পুরাণে যে-সব ভীষণ দৈত্য-দানবের গল্প পড়া যায়, হাঁহাঁ যেন তাদেরই একজন! দারুণ আক্রোশে হাঁহাঁর বিপুল বপু ফুলে ফুলে যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।

হুঁহুঁ। প্রাণপণে ছুটছে বটে, কিন্তু আধুনিক মানুষের মত দ্রুত ছোটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তার পায়ের চেটো সমানভাবে মাটিতে পড়ে না, তাই হেলে-দুলে টলে টলে ছুটতে হচ্ছে তাকে।

সূর্য-হারা অস্তাচলে মস্ত একখানা ব্যস্ত মেঘ এসে সমুজ্জ্বল রক্তাক্ত আকাশকে যেন কোঁৎ করে গিলে ফেলল। পৃথিবীর শেষ আলোর আভাটুকুও যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। দূরে বহু দূরে অরণ্যব্যাপী দাবানলের লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধ শিখা তখনও তাথৈ তাথৈ নৃত্য করছে বটে, কিন্তু সে-আলো এখানকার অন্ধকারকে তাড়াতে পারে না।

গুহার কাছ-বরাবর এসেই হুঁহুঁ দেখতে পেল, পাহাড়ের নিচের দিক থেকে তার বড় ও মেজো ছেলে টুটু আর ঘটু চিৎকার করতে করতে বর্শা উঁচিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসছে। হুঁহুঁ কতকটা নিশ্চিন্ত হল, তাহলে গুহা-ভল্লুকের সঙ্গে তাকে আর একা লড়াই করতে হবে না।

তারপরেই সে বিস্ফারিত চোখে দেখল, গুহার ঠিক সামনেই ভয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে হুয়া হাঁটু গেড়ে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে এবং তার গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আছে ছোট খুকি।... ওদিকে বেগে ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে তেড়ে আসছে ভয়াবহ গুহা-ভল্লুক— তার মস্ত-বড় দেহটা যেন পুরু অন্ধকার দিয়ে গড়া, আর তার অতি-তীব্র চক্ষু দু'টি যেন অগ্নি দিয়ে তৈরি। তীক্ষ্ণ লম্বা লম্বা দাঁত খিঁচিয়ে মাঝে মাঝে হেঁড়ে মুখ তুলে সে চিৎকার করে উঠছে, যেন কালো মেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ ডাকছে। ভল্লুক তখন হুয়ার কাছ থেকে মাত্র চৌদ্দ-পনের হাত দূরে।

হঠাৎ হুঁহুঁর আবির্ভাবে ভল্লুক থমকে দাঁড়িয়ে আরও তেড়ে গর্জন করে উঠল এবং তার উত্তরে হুঁহুঁর কণ্ঠেও জাগল আর এক বিষম গর্জন। হিংস্র জন্তুর সঙ্গে হিংস্র মানুষের গর্জনের পাল্লা। এবং সে-যুগে মানুষের গর্জনও জন্তুদের গর্জনের চেয়ে বড় কম-ভয়ানক ছিল না।

তুচ্ছ মানুষ তাকে চেঁচিয়ে ধমক দিতে চায় দেখে ভল্লুক ভারি খাপ্পা হয়ে উঠল। সে হুয়াকে ছেড়ে হাঁহাঁর দিকে এগোতে লাগল মনে-মনে এই ভাবতে ভাবতে— রোস্‌ হতভাগা, আগে মট্ করে তোর ঘাড় ভাঙি, তারপর তোর বউ আর মেয়েকে ধরে পেটে পুরতে কতক্ষণ!

হাঁহাঁ চট্ করে ধাঁধাঁকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল, যা, আমার পেছনে লুকিয়ে থাক্। তারপর সে ভল্লুকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, হাতের বর্শা মাথার উপরে জোর-মুঠোয় চেপে ধরে খুব সাবধানে পাঁয়তাড়া কষতে লাগল।

সে-কালের সেই অতিকায় গুহা-ভল্লুকের সুমুখে হাঁহাঁকে কি নগণ্যই দেখাচ্ছে! একালের ভল্লুকের সামনেও কোন আধুনিক মানুষই তুচ্ছ একটা চকমকি-পাথরের ভঙ্গুর বর্শা নিয়ে এমন বুক ফুলিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহস করত না। কিন্তু সে-যুগের মানুষকে বনে বনে সর্বদাই ঘুরে বেড়াতে হত বিশালকায় রোমশ হাতি, রোমশ গণ্ডার, ভল্লুক ও ভয়ানক সব বন্য-জন্তুর সঙ্গে। তাদের অধিকাংশই ছিল মানুষের চেয়ে আকারে ও বল-বিক্রমে অনেক বড়, কিন্তু ঐসব হিংস্র বন্য-জন্তুও ছিল তার খাদ্য। মানুষ তখন চাষ-বাস করতে শেখেনি, মাংস না খেতে পেলে তার জীবন ধারণ করাই চলত না। যদিও শিকার করতে গিয়ে মানুষদের প্রায়ই বন্য-জন্তুদের উদরে সশরীরে প্রবেশ করতে হত, তবু ভল্লুক প্রভৃতিকে দেখলে আজ নগরবাসী আমরা যতটা ভয় পাই, সেকালের বনবাসী মানুষরা ততটা ভয় পেত না। জানোয়ারদের তারা মনে করত, বিপদজনক খাবার মাত্র।

ভল্লুক পায়ে পায়ে এগোচ্ছে, হাঁহাঁর হাতের বর্শার দিকেই তার উদ্বিগ্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি। একবার আর একটা দুষ্ট মানুষ ঐরকম একটা জিনিস ছুঁড়ে তাকে মেরেছিল এবং পায়ে চোট খেয়ে তাকে যে দুই-তিন মাস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে ভল্লুকসমাজে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছিল, সেই গভীর লজ্জার কথা আজও সে ভুলতে পারে নি। ভল্লুক বুঝে নিল,

ঐ জিনিসটিকে সামলাতে পারলেই যুদ্ধে তার জয় অনিবার্য। নইলে মানুষ তো ছার! এক চড়েই কুপোকাৎ হয়!

হাঁহাঁ বর্শা তুলে ভাবছে, ভল্লুকটি আরও কাছে এলে তার কোন্‌-খানটায় আঘাত করা উচিত, এমন সময় হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়াল টুটু আর ঘটু! বয়স চব্বিশ ও বিশ— বিরাট-স্কন্ধ, বিরাট-বক্ষ, সিংহ-কটি, দীর্ঘ-বাহু, লৌহ-পেশী! শক্তিচঞ্চল যৌবনের নিখুঁত প্রতিমূর্তি— তারাও সুমুখের দিকে বাঁ পা বাড়িয়ে বুক চিতিয়ে চক্‌মকি বর্শা শূন্যে তুলল! পাহাড় ভেঙে এতখানি পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হয়ে এল, তবু তারা একটুও হাঁপাচ্ছে না— এমনি তাদের দম।

ভল্লুক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে গোঁয়ারও নয়, নির্বোধ নয়। ভাবতে লাগল শত্রুর সংখ্যা তিনজন, আর কি অগ্রসর হওয়া উচিত?

আচম্বিতে তার নাকের ডগায় ঠকাস করে এসে পড়ল একটা বড় পাথর। সে আর দাঁড়াল না, কোনদিকে তাকালও না, বিশ্রী একটা গর্জন করেই চট্‌পট্‌ দৌড়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল এই ভাবতে ভাবতে, পাথরটা ছুঁড়ল কোন বদমাইশ? ইস্‌ নাকটা থেবড়ে গেল নাকি?

পাথরটা ছুঁড়েছিল হুয়া। স্বামী আর ছেলেদের দেখে তার সাহস ফিরে এসেছে।

হাঁহাঁ হাঁপ ছেড়ে দেখল, ভল্লুকটি ক্রমেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ তার ওপর থেকে বেরিয়ে যেন আর একটা চলন্ত অন্ধকার নিচে নেমে আসছে! ভল্লুকী?

হাঁহাঁ সবাইকে ইশারা করল, গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকতে। পৃথিবীতে তখন আলোকের মৃত্যু হয়েছে। গাছে গাছে ভীত বাতাসের কান্না। বনে কোন জন্তুর নির্দয় শিকার-সঙ্গীত, কোন জন্তুর কাতর আর্তনাদ। ঝোপে ঝোপে জ্বলন্ত চক্ষু— দিকে দিকে আতঙ্কের আবছায়া।

হাঁহাঁ এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে নিজেও গুহার ভেতরে

প্রবেশ করল। এত বিবদেও বাঁ হাতে সে আগুন-কাঠের গোছা ঠিক চেপে ধরে আছে!

ওদিকে গুহার খানিক উপরে ভল্লুকের সঙ্গে দেখা হল ভল্লুকীর।

ভল্লুকী নিজে নাক দিয়ে ভল্লুকের আহত রক্তাক্ত নাক একবার শুঁকল। তার মুখ দিয়ে কি-একটা শব্দ বের হল— ভল্লুক-ভাষায় বোধ হয় জিগ্যেস করল, কি, এ কি কাণ্ড?

ভল্লুকও যেন লজ্জিতভাবে কি-একটা শব্দ করল। বোধ হয় বলল, গিন্নি, মানুষের হাতে মার খেয়েছি।

ভল্লুকী স্বামীর নাকের রক্ত চেটে দিতে লাগল, সস্নেহে।

খানিকক্ষণ কাটল, ভল্লুক অস্ফুট গর্জন করে যেন বলল, চল গিন্নি, আবার আমরা গুহার দিকে যাই। পাজি মানুষগুলো অন্ধকারে দেখতে পায় না। এই ফাঁকে প্রতিশোধ নিয়ে আসি। তারা আবার নিচে নামতে লাগল।

হাঁহাঁদের ওপরে তাদের রাগের আর একটা কারণ ছিল। দিন-তিনেক আগে হাঁহাঁদের গুহা ছিল ভল্লুকদেরই গুহা। ভল্লুকেরা দিন-দুয়েকের জন্য দূর-বনে শিকার করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, তাদের বাসা ঘৃণ্য মানুষদের হস্তগত হয়েছে! এমন অত্যাচার কে সইতে পারে?

আকাশ যখন কষ্টিপাথরের মতন কালো-কুচকুচে, সন্ধ্যাবেলায় সেই মেঘখানা যখন আরও নিবিড় হয়ে পাহাড়ের উপর ছুটে আসছে এবং সমস্ত অরণ্য যখন জানোয়ারদের বীভৎস চেঁচামেচি ও হানাহানিতে পরিপূর্ণ, ভল্লুক ও ভল্লুকী তখন পা টিপে টিপে গুহার দরজার কাছে এসে হাজির হল। চন্দ্রহীন রাত্রি বন-জঙ্গল পাহাড়কে নিজের কৃষ্ণাম্বরীর অঞ্চলে একেবারে ঢেকে ফেলেছিল বটে, কিন্তু জানোয়ারি চোখ আঁধার ফুঁড়েও দেখতে পায়।

ভল্লুক দু' পা এগিয়ে গিয়ে কান পেতে শুনল, মানুষগুলো কি করছে।

আরো দু' পা এগিয়ে গিয়েই সে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবারে যেন কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে— যেন কাঠে কাঠে ঘষাঘষির শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে গুহার অন্ধকার যেন থেকে থেকে আলো-হাসি হাসছে।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ! এমনি শব্দ করতে করতে গুহা-ভল্লুক বিপুল বিস্ময়ে আবার দু' পা পিছিয়ে এল! এতকাল ভল্লুকীকে নিয়ে সে এই গুহায় বাস করেছে, কিন্তু ওখানকার অন্ধকার তো কখনও এমন বেয়াড়া বেমক্কা হাসি হাসেনি।

স্বামীর রকম-সকম দেখে ভল্লুকীও এগিয়ে এসে 'থ' হয়ে গেল। এ-সব কি!

আচম্বিতে অন্ধকার অত্যন্ত অসম্ভব-রকম আলো-হাসি হাসতে শুরু করে দিল— এ-হাসি আর যেন থামতেই চায় না! গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে, ছাদের তলায়, মেঝের উপরে হাসি খালি নেচে নেচে খেলে বেড়াতে লাগল এবং ভল্লুক-শাস্ত্র-বহির্ভূত এমন আজগুবি ব্যাপার দেখে হতভম্ব স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কি যেন তারা করবে, ভেবেই পায় না!

তারপরেই চকিতে একরাশি আলো-হাসি শূন্যে অজস্র আগুন-ফুল ঝরিয়ে ফুলঝুরির মত ভল্লুক ও ভল্লুকীর সর্বাঙ্গে এসে পড়ল! এ-হাসি যে শত শত বিছার মত কামড়ে দেয়— গা, হাত, পা, মুখ জ্বলিয়ে দেয়! বিকট চিৎকারে চতুর্দিক কাঁপিয়ে তারা বিষম ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল!

গুহার ভিতরে তখন হাঁহাঁ। বউ-ছেলে-মেয়েদের হাত-ধরাধরি করে মহা উল্লাসে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছে!

মানুষের সঙ্গে আজ থেকে হল আগুনের মিতালি। আগুন বন্ধুর মত মানুষের হাতের খেলনা হয়ে তাকে বিশ্বজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কেবল কি বন্ধু? অগ্নি আজ থেকে হল মানুষের দেবতা।

হিন্দু ও পার্সিরা আজও অগ্নিদেবের পূজার মন্ত্র ভোলেনি।

খোকা-আগুনকে ঘরে পেয়ে হাঁহাঁর আনন্দের আর সীমা নেই! আজ তার মনে হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীকে সে শাসন করতে পারবে! গুহা-ভল্লুক শায়েস্তা হয়েছে, এইবারে খোকা-আগুনকে নিয়ে অন্যান্য শত্রুদেরও জব্দ করতে হবে।

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই খোকা-আগুনকে বরাবর বাঁচিয়ে রাখবার জন্য হাঁহাঁ বুদ্ধি খাটিয়ে একটা ফন্দি বার করে ফেলল।

তাদের গুহার মুখেই ছিল একটা দু'হাত গভীর ও ছ'-সাত হাত চওড়া গর্ত। হাঁহাঁ চারিদিক থেকে শুকনো ঘাস-পাতা ও কাঠ-কুটো এনে গর্তের অনেকখানি ভরিয়ে ফেলল এবং তার ভেতরেই করল আবার খোকা-আগুনের সৃষ্টি। দেখতে দেখতে খোকা-আগুন মস্ত বড় হয়ে উঠল!

হাঁহাঁ ছেলে-মেয়ে-বউকে হুকুম দিল যে, যখন গুহার ভেতরে থাকবে, মাঝে মাঝে যেন গর্তে দু'-একখানা কাঠ ফেলে দিতে ভুলে না যায়। এই উপায়ে গর্তের মধ্যে অগ্নি-দেবতাকে সে সর্বদাই বন্দী করে রেখে দিল।

সন্ধ্যার পরে গুহার ভেতরে-বাইরে জাগে আঁধার-দানব, তবু হাঁহাঁর আর ভয় হয় না। কারণ গুহার মধ্যে কুণ্ডে যখন অগ্নি-দেবতা নাচতে নাচতে রাঙা হাসি হাসতে থাকেন, আঁধার-দানব তখন বাইরে পালিয়ে যেতে পথ পায় না!

কেবল আঁধার-দানব নয়, দুষ্টু শীতও দস্তুরমত টিট্ হয়ে গেছে! একবার গুহায় ঢুকে কুণ্ডের পাশে এসে বসতে পারলেই হল— ব্যস্, শীতের কাঁপুনি অমনি বন্ধ! কী মজা! কী মজা! কী আরাম!

গুহাবাসী ভল্লুক-ভল্লুকী সেদিনের অপমান সহজে হজম করতে রাজি হয়নি। অতি ক্ষুদ্র মানুষের এত-বড় স্পর্ধার কথা ভল্লুক-সমাজে কে কবে শুনেছে? এর প্রতিশোধ না নিলেই নয়! বিশেষত সেইদিন থেকে ভল্লুকীও যেন তার স্বামীর প্রতি কিছুটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে শুরু করেছে! ভীষণ ভল্লুক-বংশে জন্মগ্রহণ করেও যে দুর্বল মানুষের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে লম্বা দেয়, সে স্বামী নামেরই যোগ্য নয়, ভল্লুকীর মনে বোধহয় এই ধরনের একটা ধারণা জন্মেছে; কারণ ভল্লুক ধমক দিলে ভল্লুকীও আজকাল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উল্টো-ধমক দিতে ছাড়ে না। এমন অবাধ্য বউ নিয়ে কি ঘর-সংসার করা চলে? চট্‌পট্‌ এর একটা প্রতিবিধান না করলেই নয়!

গুহা-ভল্লুক খুব একটা ঘুট্‌ঘুটে রাতে পা টিপে টিপে গুহার কাছে খবরাখবর নিতে এল। মনে মনে এঁচে এসেছিল, একটু যদি ফাঁক পায়, তাহলে গুটিকয় চপেটাঘাত করে একটা মানুষেরও মুণ্ড আর আস্ত রেখে আসবে না— হুঁ!

কিন্তু সেদিনও গুহার কাছে গিয়ে দেখল, ভেতরে অন্ধকার ঠিক সেদিনের মতই বিদ্‌ঘুটে হাসি হাসছে! খুব উঁচু হয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে ভল্লুক মহাবিস্মিতের মত দেখল, গুহার মুখেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে! বনের দাবানলের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, গুহার দরজায় এসে প্রহরী হয়েছে সেই-ই! ঐ-পাহারা ভেদ করে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব বুঝে ভল্লুক আবার সরে পড়ল মানে মানে। কি জানি বাবা, সেদিনের মত মানুষগুলো আবার যদি আগুনকে লেলিয়ে দেয়!

আরও কয়েকবার গুহার কাছে গিয়ে সে দেখে এল, সেই একই অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপার। ভল্লুক লুপ্ত গৌরবকে আর উদ্ধার করতে পারল না। ভল্লুকীর ধমক খেয়েও মুখ বুজে থাকে!

মানুষের কাছে বনের পশু সেই যে জব্দ হতে আরম্ভ হল, আজও তার সমাপ্তি হয়নি। তবে তখন জ্বলত কেবল কাঠের আগুন, আর এখনকার আগুন জ্বলে বন্দুকের মুখে।

আরও কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আর এক অপূর্ব আবিষ্কার এবং এবারেও আবিষ্কারের জন্য বাহাদুরি নিতে পারে, ধরতে গেলে হাঁহাঁর বউ হুয়াই। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি।

প্রথম পরিচ্ছেদেই বলেছি, হাঁহাঁ হচ্ছে 'নিয়ানডের্টাল' জাতের মানুষ এবং এ-জাতের মানুষরা চাষ-বাস করতে শেখেনি। তারা জীবনধারণ করত প্রধানত শিকার করে এবং যেদিন শিকার জুটল না, ক্ষুধা মেটাত ফল-মূল খেয়ে।

একদিন হাঁহাঁর বরাত খুব ভাল। টুটু আর ঘটু দুই ছেলের সঙ্গে বনে বেরিয়ে শিকার করে আনল মোটাসোটা মস্ত এক বুনো মহিষ। মহিষটাকে দেখেই হুয়া, তার মেয়ে নিনি ও ছোট ছেলে ধাঁধাঁ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। কারণ এমন একটা প্রকাণ্ড মহিষের মাংস তাদের পেটের ভাবনা ভুলিয়ে দেবে অন্তত দিন-কয়েকের জন্য। সেই আদিম যুগের মানুষরা মাংস কোন্ জন্তুর এবং তা পচা কি টাট্‌কা, এ-সব বাছ-বিচার করত না একটুও। বহু দুঃখে, বহু দিনের পর এক-একটা বড় শিকার মেলে। মাংস টাটকা রাখবার উপায় তখন কেউ জানত না এবং এমন দুর্লভ জিনিস পচা বলে ফেলে দেওয়াও ছিল অসম্ভব। সাত-আট দিনের পচা মাংসও তখন যে কেউ যেন খেত না, এমন নয়।

হুয়া আর নিনি মায়ে-ঝিয়ে চক্‌মকি পাথরের ছুরি নিয়ে মাংস কাটতে বসে গেল মহা-উৎসাহে এবং খোকা ধাঁধাঁ করতে লাগল তাদের সাহায্য। তখন থেকেই মেয়েরা গৃহস্থালীর এ-সব কাজ করে নিয়েছিল নিজস্ব।

সেদিন একটু শীত পড়েছিল। হাঁহাঁ অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে মেঝের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে কিঞ্চিৎ আরামের চেষ্টা করতে লাগল।

টুটু আর ঘটুর জোয়ান বয়স, তাদের এখনি বিশ্রামের দরকার হল না। তারা গুহার বাইরে গিয়ে চক্‌মকি পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে বসল। তখন লোহা বা অন্য কোন ধাতুর অস্তিত্বও কেউ জানত না। চক্‌মকি পাথরের সাহায্যেই চক্‌মকি পাথর কেটে বা ঘষে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি

করা হত। আজ কত হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর মাটি খুঁড়ে সেই-সব অস্ত্রশস্ত্র আবার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। যাদুঘরে গিয়ে তোমরা সে-সব দেখে আসতে পার স্বচক্ষে।

সংসারে কর্তাকে সব-চেয়ে ভাল খাবার দেবার রীতি প্রচলিত হয়েছিল তখন থেকেই। নইলে সে-যুগের অসভ্য কর্তারা স্ত্রীর মাথায় ডাণ্ডা মেরে, আর এ-যুগের কর্তারা মনের রাগ জানিয়ে দেন কেবল মুখভার করেই, নিতান্ত সভ্যতার অনুরোধেই।

খুব-বড় ও খুব-ভাল একখণ্ড মাংস নিয়ে হুয়া চলল স্বামীকে খেতে দিতে। মাংস না রেঁধেই খেতে দেওয়ার কথা শুনে তোমরা কেউ অবাক হয়ো না। মনে রেখ, [illegible] বশীভূত আগুনের সৃষ্টি হয়েছে তখন সবে। আগুন দিয়ে যে আবার রান্না হয়, এটা ছিল তখন কল্পনাতীত।

গুহা-মুখে অগ্নিকুণ্ডের পাশ দিয়ে যাতায়াতের পথ ছিল খুব সংকীর্ণ। সেইখান দিয়ে যেতে গিয়ে হুয়া হঠাৎ পড়ে গেল। নিজেকে কোন রকমে আগুনের কবল থেকে সামলে নিল বটে, কিন্তু তার হাত ফস্কে মাংসটা পড়ল গিয়ে একেবারে জ্বলন্ত কুণ্ডের মধ্যে।

হাঁহাঁ ধড়্মড়িয়ে উঠে বসল।

— করলি কি বৌ! অমন মাংসটা নষ্ট করলি?

হুয়া তাড়াতাড়ি উঠে বসে ভয়ে ভয়ে অপ্রতিভভাবে বলল, আমাকে মাপ্ কর! তারপর দুই খণ্ড কাঠ দিয়ে মাংসটা অগ্নিকুণ্ডের গর্ভ থেকে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

হাঁহাঁ বলল, থাক্, আর তুলে কাজ নেই। ও-মাংস নষ্ট হয়ে গেছে, আমি খাব না।

হুয়া বলল, হোক্-গে নষ্ট! ও-মাংস আমিই খাব, তোমাকে ভাল মাংস এনে দিচ্ছি।

হাঁহাঁ আবার শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর হুয়া মাংসটাকে আগুনের ভেতর থেকে উদ্ধার করল। তারপর সেটাকে সেইখানে রেখে স্বামীর জন্য নতুন মাংস আনতে ছুটল।

অল্পক্ষণ পরেই হাঁহা তার খাবার পেল। এবং হুয়াও স্বামীর পাশে বসে সেই আধ-পোড়া মাংসের ওপরে মারল এক কামড়।

দাঁত দিয়ে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে হুয়া বিস্মিত স্বরে বলল, ওগো!

হাঁহার বড় বড় দাঁতগুলো তখন মড়্-মড়্ শব্দে হাড় চিবোচ্ছিল। জড়িত স্বরে সে বলল, কি?

— এই মাংসটা একটু খাবে?

— ধ্যেৎ!

— না, একটু খেয়ে দেখ! কি চমৎকার লাগছে!

— বাজে কথা!

— এক টুক্‌রো চিবিয়ে দেখ! এমন্দ মাংস কখনও খাও নি!

হাঁহাও খাবে না, হুয়াও ছাড়বে না! স্ত্রীর আবদারে বাধ্য হয়ে সে অত্যন্ত নারাজের মত এক টুকরো আধ-পোড়া মাংস নিয়ে চেখে দেখল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ-চোখের ভাব হয়ে গেল অন্যরকম!

হুয়া বলল, কি?

— আশ্চর্য!

— চমৎকার নয়?

— আর একটু দে!

হুয়া দাঁত দিয়ে আর এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিজের হাতে স্বামীর মুখে পুরে দিল। হাঁহা তারিয়ে তারিয়ে চিবোতে চিবোতে অভিভূত স্বরে বলল, খাসা!

হুয়া বলল, কাল থেকে আমি এইরকম মাংসই খাব!

হাঁহা বলল, কাল থেকে কেন! আমার এই মাংসটা আজকেই ঐখানে ফেলে দে দেখি!

হুয়া আবার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে হাঁহার মাংস ফেলে দিল। কিছুক্ষণ পরে সেটাকে তুলে নিয়ে হাঁহার হাতে দিয়ে বলল, চেখে দেখ!

হাঁহা সেই মাংসের খানিকটা মুখে পুরে উত্তেজিত স্বরে বলল,

চমৎকার, চমৎকার! আগুন-ঠাকুরের জয় হোক্! হুয়া আয়, আমরা দেবতাকে গড় করি!

হাঁহাঁ এবং হুয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের সামনে মাটিতে মাথা রেখে সানন্দে প্রণাম করল। অগ্নিদেবতা কেবল শত্রুর কবল থেকে ভক্তকে রক্ষা করেন না, কেবল আঁধার-দানবকে দূরে তাড়িয়ে দেন না, সেই-সঙ্গে উদরের খোরাককেও সুধার মতন মধুর করে তোলেন। না-জানি দেবতার আরও কত গুণ আছে!

হাঁহাঁ সানন্দে চিৎকার করে ডাকল, ওরে টুটু, ঘটু, নিনি, ধাঁধাঁ! আয়রে তোরা সবাই! নতুন খাবার খাবি আয়!

সেইদিন হল মানুষের গৃহস্থালিতে রন্ধন-শিল্পের আবিষ্কার! সাধারণ জানোয়ারদের শ্রেণী থেকে মানুষ উঠল আর-এক ধাপ উঁচুতে।

হাঁহাঁ আর হুয়ার বড় আদরের মেয়ে নিনি, বয়স তার ষোল বৎসর। বাপ-মা বলে, নিনির চেয়ে সুন্দর মেয়ে দুনিয়ায় আর জন্মায় নি। কিন্তু তোমরা তাকে দেখলে ও-কথা মানতে রাজি হতে না নিশ্চয়ই। প্রথম পরিচ্ছেদেই হাঁহাঁর চেহারার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নিনি সেই বাপেরই মেয়ে তো, বাপের চেহারার বর্ণনা পড়লেই মেয়ের চেহারা খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে। নিনি হচ্ছে আদিম যুগের বনের মেয়ে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে দুর্দান্ত বলিষ্ঠতা ও বন্য স্বাস্থ্যের ভাব ফুটে উঠেছে। তোমাদের একালের দু'-তিনজন যুবা একসঙ্গে চেষ্টা করেও গায়ের জোরে নিনিকে বশ মানাতে পারত না।

বনবালা নিনি আজকাল ভারি বিপদে পড়েছে। ঝরণার ধারে যখন জল আনতে যায়, রোজই দেখতে পায়, পাথরের উপরে পা ছড়িয়ে বসে থাকে এক ছোকরা। বনে-জঙ্গলে যখন কাঠ বা ফল-মূল কুড়োতে যায়, আনাচে-কানাচে দেখা যায় সেই ছোকরাকেই।

ছোকরাকে দেখতে তার ভালই লাগে। সে যে তাকে বিয়ে করতে চায়, এটাও নিনি বুঝতে পেরে। তবু বিয়ের নামেই তার ভয়

হয়। সেকালের বিয়ে— বর তাকে জোর করে ধরে কোথায় নিয়ে যাবে, বাপ-মা, ভাই-বোনকে ছেড়ে সে থাকবে কেমন করে? তাই ছোকরাটিকে দেখলেই ভীরু হরিণীর মত ছুটে পালিয়ে আসে সে।

তোমরা জাননা বোধহয়, সেকালের বিয়েতে বাপ-মা বা ঘটক-ঠাকুরের হাত থাকত না প্রায়ই। কোন মেয়েকে পছন্দ হলে বর জোর করে তাকে ধরে বা চুরি করে নিয়ে সরে পড়ত। আজও কোন কোন অসভ্য-সমাজে এই নিয়ম বজায় আছে। মহাভারত প্রভৃতি কাব্য পড়লে দেখবে, ভারতবর্ষ যখন সভ্য তখনও বিবাহের জন্য কন্যাহরণ নিষিদ্ধ ছিল না। মহাবীর অর্জুনও করেছিলেন সুভদ্রাকে হরণ এবং রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

সেদিন বিকালে হাঁহাঁ সকলকে নিয়ে কুণ্ডের চারিপাশে বসে আগুন পোহাচ্ছে, কেবল নিনি গেছে ঝরণায় জল আনতে।

হঠাৎ নিনি একরাশ এলোচুল উড়িয়ে বেগে ছুটতে ছুটতে গুহার ভেতরে ঢুকে বাপের পায়ের কাছে বসে পড়ে অত্যন্ত হাঁপাতে লাগল।

হাঁহাঁ সবিস্ময়ে বলল, কি রে নিনি!

— তারা আমাকে ধরতে আসছে!

— তারা? কারা?

— যারা আমাকে বিয়ে করবে।

— হাঁহাঁর চোখ জ্বলে উঠল। সগর্জনে বলল, কি করবে! বিয়ে!

— হ্যাঁ বাবা! সে রোজ একলা আসে। আজ অনেক লোক নিয়ে এসেছে।

— কোথায় তারা?

— বাইরে। বোধহয় এইখানেই আসছে।

হাঁহাঁ, টুটু, ঘটু, একসঙ্গে এক এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল, এক একটা পাথরের ফলা পরানো বর্শা হাতে করে। যদিও এইভাবেই তখনকার অধিকাংশ বরই বউ সংগ্রহ করত, তবু কোন বাপই সহজে নিজের মেয়েকে পরের হাতে বিলিয়ে দিতে রাজি হত না। এই জন্য আদিম

যুগের বিবাহের সময়ে প্রায়ই রক্তারক্তি ও খুনোখুনি কাণ্ডের অবতারণা হত। অনেক সময় বরও মারা পড়ত এবং কন্যাপক্ষের আক্রমণে করত প্রাণপণে পলায়ন।

হাঁহাঁ তার দুই ছেলেকে নিয়ে প্রচণ্ড স্বরে চিৎকার করতে করতে মাথার উপরে বর্শা নাচাতে নাচাতে এবং বড় বড় লাফ মারতে মারতে বাইরে বেরিয়ে গেল। হুয়া তার মেয়েকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে ভয়ে-দুঃখে কান্না শুরু করে দিল। মেয়ের বিয়েতে মায়ের প্রাণ আজও কাঁদে— কত যুগ-যুগান্তরের বেদনা সেখানে সঞ্চিত আছে।

গুহার বাইরে গিয়ে হাঁহাঁ দেখে, ব্যাপার বড় গুরুতর। আঠার-বিশজন লোক, কেউ লাঠি কেউ বর্শা হাতে আস্ফালন করতে করতে হৈ-হৈ রবে পাহাড়ের ওপরে তাদের দিকে উঠে আসছে!

তারা তিনজনে, এই দলে-ভারি বরযাত্রীদের ঠেকাবে কিভাবে?

৫

কুসমন্তর

সবার আগে আসছে সেই ছোকরা, নিনিকে যে বিয়ে করতে চায়!

আগেই বলেছি, নিনিরও পছন্দ হয়েছে এই ছোকরাকে। কিন্তু কি দেখে যে পছন্দ হয়েছে, আমরা একালের লোক তা বলতে পারব না। নিনির পছন্দসই এই বরটির প্রায় গরিলার মত মুখ, জঙ্গলের ক্ষুদ্র সংস্করণের মত রাশীকৃত গোঁফ-দাড়ি এবং সর্বাঙ্গে বন্য জন্তুর মত বড় বড় লোম দেখলে একালের যে-কোন মহা-কুৎসিত মেয়েও 'মাগো' বলে লম্বা দৌড় মেরে দেশছাড়া হয়ে পালাবে।

তবে এইটুকু মনে রেখ, নিনি জীবনে যত মানুষ দেখেছে তাদের সকলেরই চেহারা ঐ-রকম। একালেও ভারতের কোন বউই আফ্রিকার

কাফ্রি বা হটেন্‌টট্ বরকে বিয়ে করতে চাইবে না। কিন্তু কাফ্রি বা হটেন্‌টট্‌দের মুলুকে সেই বরকেই হয়ত অপরূপ কার্ত্তিক বলে মনে করা হয়।

নিনির বরের নামটি বেশ। টুঁটু।

রূপের কথা ছেড়ে দিই, কিন্তু টুঁটুঁর দেহের দিকে তাকালে তারিফ করে বলতে হয়— হ্যাঁ, সত্যকার পুরুষের চেহারা বটে! ইয়া চওড়া বুকের পাটা, তার ওপর আজানুলম্বিত বাহু, তাদের লোহার মত কঠিন পেশীগুলো থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছে!

বরযাত্রীদের পল্টন দেখে রীতিমত ভড়কে গিয়ে হাঁহাঁ, টুটু আর ঘটু পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারা সবাই বুঝল, ওদের বাধা দিতে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা। শেষ-পর্যন্ত নিনিকে ওরা ধরে নিয়ে যাবেই।

কিন্তু বিনাবাক্যব্যয়ে এতদিনের পালন-করা মেয়েকে কি হাতছাড়া করা যায়? অতএব হাঁহাঁ মুখ-সাবাসি দেখিয়ে খুব চিৎকার করে বলে উঠল, হো! কে রে তোরা?

টুঁটু বলল, আমরা আসছি বাঘ-বন থেকে, সেই যেখানে খাঁড়া-দেঁতোরা থাকে।

— কি চাস্‌রে?

— তোর জামাই হব রে!

— আমার জামাই হবি? হা হা হা হা!

— অত হাসছিস্ যে?

— তুই হবি নিনির বর? ও হো হো হো হো!

— কেন হব না, রে? আমার হাতের এই ডাণ্ডাটা দেখছিস্ তো?

— কি রে, ভয় দেখাচ্ছিস্ নাকি? ডাণ্ডা বুঝি আমাদের নেই?

ততক্ষণে বরযাত্রীরা আরও কাছে এসে পড়েছে। হঠাৎ তাদের ভেতর থেকে একজন খুব লম্বা-চওড়া লোক সব-চেয়ে বেশি এগিয়ে

এল। তার কাঁচা-পাকা চুলের ওপরে রঙিন পালকের চুড়ো; তার গলায় দুলছে সাদা ধব্-ধবে হাড়ের মালা; তার এক হাতে পাথরের কুঠার; ভাবভঙ্গী ভারিক্কে— দলের সর্দারের মত।

হাঁহাঁ শুধোল, তুই আবার কে রে বুড়ো?

— আমি টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ রে।

— তোর মতলব কি?

— আমি ব্যাটার বউকে নিয়ে যেতে এসেছি।

— আব্দার নাকি?

— আব্দার নয় রে, দাবী। দে, বউকে শীগ্গির বার করে।

হাঁহাঁ রাগ সামলাতে না পেরে ধাঁ করে একখানা পাথর ছুঁড়ল। কিন্তু টুঁটুঁর বাপ হুঁহু সাঁৎ করে সরে গিয়ে পাথরখানা ব্যর্থ করে দিল। বরযাত্রীরা হৈ-হৈ করে উঠল, তারপর খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগল এবং এগিয়ে আসতে-আসতেই পাহাড় থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ক্রমাগত।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে করে হাঁহাঁ হো-হো রবে চেঁচাতে ও তড়াক্ তড়াক্ করে লাফাতে লাগল। এক-একটা লাফ তিন-তিন ফুট উঁচু! একখানা বড়-সড় পাথর তার পায়ে এসে লাগল, তবু তার চেঁচানি আর নাচ বন্ধ হয় না।

টুটু আর ঘটু বঝল, তাদের বাপ হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে।

টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ আশ্চর্য হয়ে বলল, ওটা অত চেঁচায় আর লাফায় কেন রে?

টুঁটুঁ বলল, বোধ হয় তুক্তাক্ করছে!

হুঁহুঁ বলল, ডাণ্ডার চোটে সব তুক্তাক্ ঠাণ্ডা করে দেব! এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্!

টুটু বাপের বাঁ হাত জোরে চেপে ধরে বলল, ও বাবা, তোর ঘাড়ে কি ভূত চাপল?

ঘটু বাপের ডান হাতটা ধরে বলল, আর নাচিস্ নে রে বাবা!

হাঁহাঁর দুই হাত ধরে ঝুলছে দুই ছেলে, সে কিন্তু সেই অবস্থাতেও লাফাবার চেষ্টা করতে লাগল।

— বাবা, বাবা, ওরা যে এসে পড়ল।

— আসুক্ রে আসুক্।

— সে কি বাবা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচবি, আর ওরা এসে আমাদের মেরে ফেলবে?

— তারপর নিনিকে নিয়ে পালাবে?

হঠাৎ হাঁহাঁ নাচ থামিয়ে গম্ভীর-স্বরে বলল, চল্, আমরা নিনির কাছে যাই।

— লড়াই করবি না?

— না।

— নিনিকে ওদের হাতে তুলে দিবি?

— না।

— তবে?

হাঁহাঁ গুহার দিকে দৌড় মারল।

বাপের কাপুরুষতায় বিস্মিত ও মর্মাহত হয়ে টুটু বলল, ঘটু!

— কি রে টুটু?

— স্ত্রীলোকের মত গর্তে গিয়ে ঢুকবি, না এইখানে দাঁড়িয়ে মরদের মত লড়বি?

— মরদের মত লড়ব।

— হ্যাঁ, মরব— তবু নড়ব না।

— আমার হাতে বর্শা—

— আমার হাতে কুড়ুল।

তারা বর্শা আর কুঠার নিয়ে পাঁয়তাড়া শুরু করল, এমন সময়ে গুহার ভেতর থেকে হাঁহাঁর ডাক এল— টুটু! ঘটু!

— বাবা!

— শীগ্‌গির এইখানে আয়!

— যাব না।

বজ্রকঠোর কণ্ঠে হাঁহাঁ বলল, আমার হুকুম। এদিকে আয়!

মান্ধাতার আমলেরও আগেকার কথা। তখনও ছেলেরা বাপের অবাধ্য হতে শেখেনি।

টুটু বলল, ঘটু!

— কি রে টুটু?

— বাপ ডাকে।

— হুঁ। না গেলে মারবে।

আবার হাঁহাঁর স্বর— টুটু! ঘটু! এখনও এলি না?

— যাই বাবা!

— দৌড়ে আয়!

টুটু আর ঘটু গুহার দিকে দৌড়তে লাগল।

বরযাত্রীরা এসে পড়ল।

চুঁচুঁ বলল, ভীতুগুলো লড়বে না। পালাল।

হুঁহুঁ বলল, কিন্তু পালিয়েই কি বাঁচবে?

— এখন আমরা কি করব রে?

— গুহায় ঢুকব।

— যদি সেখানে ওরা লড়ে?

— ওরা তিনজন, আমরা আঠারজন। টিপে মেরে ফেলব।

— চল্ তবে।

মহা হট্টগোল তুলে সবাই গুহার দিকে ছুটল। চুঁচুঁ আর হুঁহুঁ সকলের আগে গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে নিজেদের লোক-জনদের ডেকে বলল, আয় রে, তোরা ছুটে আয়! তারপর গুহার দিকে ফিরে চুঁচুঁ বলল, ওরে বুড়ো শ্বশুর! আমার বউ দে!

হুঁহুঁ বলল, বউ দে রে, আমার ব্যাটার বউ দে!

গুহার ভেতর থেকে হাঁহাঁ জবাব দিল, এই নে রে, এই নে!

পর-মুহূর্তে, দু'খানা জলন্ত চ্যালা-কাঠ গুহার ভেতর থেকে সাঁ সাঁ

করে উড়ে এল— একখানা পড়ল চুঁচুঁর চ্যাটাল বুকের ওপরে এবং আর একখানা লাগল গিয়ে হুঁহুঁর মস্ত মুখের ওপরে!

এবং তার পর-মুহূর্তে গুহামধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত জ্বলন্ত কাঠের পর জ্বলন্ত কাঠ! হাঁহাঁ, টুটু, ঘটু, ধাঁধাঁ, ছয়া আর নিনি— এই আগুন-খেলায় যোগ দিয়েছে প্রত্যেকেই। নিনির বিশেষ লক্ষ্য চুঁচুঁর দিকেই! তার ছোঁড়া একখানা কাঠের আগুনে চুঁচুঁর গোঁফ-দাড়ির ভেতরে সৃষ্টি করল ফিন্‌কির ফুলঝুরি!

খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে সকৌতুকে হাততালি দিয়ে নিনি বলে উঠল, পালিয়ে যা রে বর, পালিয়ে যা!

পালিয়েই গেল। খালি নিনির বর নয়, সবাই। আর সে কি যে-সে পালন? এত চটপট মানুষ যে পালাতে পারে, নিনি তা জানত না। তাদের কান্নায় আর সভয় চিৎকারে উপর-পাহাড়ে গুহা-ভল্লুকের ঘুম গেল ভেঙে। ব্যাপার কী, দেখবার জন্য সে পাহাড়ের ধারে এসে মুখ বাড়াল। দেখল, একদল মানুষ পাগলের মত দৌড় মারছে এবং তাদের পিছনে পিছনে ছুটছে হাঁহাঁ, টুটু আর ঘটু— প্রত্যেকেরই হু'হাতে হু'খানা করে জ্বলন্ত কাঠ!

বুদ্ধিমান ভল্লুক ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিল। হাঁহাঁদের কেউ পাছে তাকেও দেখে ফেলে, সেই ভয়ে সে চট্‌ করে পাহাড়ের ধার থেকে সরে এল। সুমুখের হুই পায়ে ভর দিয়ে থেব্‌ড়ি খেয়ে বসে ভাবতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। ভেবে ভেবে শেষটা স্থির করল, এই অভিশপ্ত পাহাড় যে-কোন ভদ্র-ভল্লুকের বাসের অযোগ্য! এখানে যে-সব কাণ্ড ঘটতে শুরু হয়েছে, তার একটুও মানে হয় না। কালই অন্য দেশে যাত্রা করতে হবে।

একটা পাহাড়ি-গাছের ছায়ায় বসে ভল্লুকী তখন চোখ বুজে থাবা দিয়ে চুল আঁচ্‌ড়াচ্ছিল পরম আরামে। স্বামীর পায়ের শব্দে কুঁতকুঁতে চোখ হু'টি খুলল।

ভল্লুকীর নাকে নিজের নাক লাগিয়ে ভল্লুক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল।

আমরা— অর্থাৎ মানুষরা— বড়-জোর অন্যের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বলি। কিন্তু ভল্লুক বউয়ের নাসিকায় নিজের নাসিকা সংলগ্ন করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল কেন, বলতে পারি না। হয়ত এই উপায়ে তাদের কথা কইবার সুবিধা হয়।

স্বামীর ঘোঁৎঘোঁতানি শুনে ভল্লুকীও করল ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। বোধহয় বলল, ওমা, তাই নাকি?

এবার ভল্লুকের ঘোঁৎ ঘোঁৎ। বোধহয় বলল, হ্যাঁ, গিন্নি। এ-পাহাড় আর নিরাপদ নয়। মানুষের সঙ্গে আগুনের ভাব হয়েছে। চল পালাই।

ভল্লুকীর আপত্তি হল না। এ-পাহাড়ে যত মৌচাক লুঠে সব মধু শেষ করেছে। এখন নতুন দেশের খবর নেওয়াই ভাল।

গুহা-ভল্লুক বউ আর দু'টি বাচ্চা নিয়ে যখন দেশত্যাগী হল, ঠিক সেই সময়ে ঢুঁঢুঁর বাপ হুঁহুঁ দলবল নিয়ে একটা মস্তবড় বুড়ো বটগাছের তলায় গিয়ে বসল। তাদের কারুরই হাতে আর একটা অস্ত্রও নেই। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তারা হাহাঁদের গুহার সুমুখে ফেলে পালিয়ে এসেছে।

হুঁহুঁ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে বলল, ওরে ঢুঁঢুঁ! আমরা কি স্বপ্ন দেখলুম?

— স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যি। স্বপ্ন কামড়ে দিলে কি গোঁফ-দাড়ি পুড়ে যায়? গায়ে ফোস্কা হয়?

— কেন তোর বউ আনতে এলুম রে ঢুঁঢুঁ, জ্বলে-পুড়ে মলুম যে!

— আগুন দেবতা যার হাতের মুঠোয়, সে যে এইবারে-পৃথিবী জয় করবে! আর আমাদের রক্ষে নেই।

— ঢুঁঢুঁ, তখন তুই ঠিকই বলেছিলি রে! তখন ও-বেটা পাগ্‌লার মতন লাফিয়ে তুক্ করছিল।

— ওর ফুসমন্তরে আগুন-ঠাকুর বশ মেনেছে।

— হুঁ। কিন্তু ও-মন্তরটা আমরাও কি শিখতে পারি না?

— কেমন করে শিখবি বাবা? ফুসমন্তর কি কেউ কারুকে শেখায়?

— ওর বেটিকে তুই যেমন করে পারিস্ বিয়ে করে ফেল্। ওর বেটিও নিশ্চয়ই বাপের কাছ থেকে মন্তর-তন্তর শিখেছে।

— গড় করি বাবা, আর আমি ও-মুখো হই ?…ঐ দেখ্ বাপ, আবার ওরা আসছে!

ছেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে হুঁহুঁ সচমকে দেখল, তাদের খুব কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে হাঁহাঁ, দুই পাশে টুটু আর ঘটুকে নিয়ে। কখন যে তারা নীল অরণ্যের যবনিকা ভেদ করে এত কাছে এসে আবির্ভূত হয়েছে, হুঁহুঁর দলের কেউই তা টের পায় নি। কেবল তাই নয়, তাদের তিনজনেরই বাঁ-হাতে একখানা করে জ্বলন্ত কাঠ এবং ডান হাতে একগাছা করে বর্শা। প্রত্যেকের কোমরে ঝুলছে কুঠার।

একে হুঁহুঁদের সবাই অস্ত্রহীন, তার ওপরে আবার এই অগ্নি-বিভীষিকা। তারা সবাই প্রাণের আশা ছেড়ে দিল, কারণ পালাবার আগেই ওরা আক্রমণ করবে!

হাঁহাঁ মুখে টিপে টিপে বিজয়-হাসি হাসছিল। হাসতে-হাসতেই বলল, কি রে চুঁচুঁর বাপ হুঁহুঁ! আমার মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যাবি তো এগিয়ে আয়!

চুঁচুঁ বলল, রক্ষে কর্ আমার বিয়ের শখ নেই!

হুঁহুঁ হাত জোড় করে বলল, আমি মাপ চাইছি রে!

— কি শর্তে মাপ করব, বল্।

— আজ থেকে তুই হলি আমাদের প্রভু রে, আর আমরা হলুম তোর দাস।

আজ থেকে আমি যা বলব, শুনবি ?

— শুনব।

— আমি যদি মরতে বলি ?

— মরব।

— সূয্যি-ঠাকুরের নাম নিয়ে দিব্যি গাল্।

পশ্চিম গগনের প্রদীপ্ত রক্ত-গোলকের দিকে দৃষ্টিপাত করে হুঁহুঁ

বলল, ঐ সূয্যি-ঠাকুর সাক্ষী রইল, তুই প্রভু— আমরা দাস! আমরা বিপদে পড়লে তোকে কিন্তু আগুন-মন্তরে রক্ষা করতে হবে!

— রক্ষা করব।

— বিপদ আমাদের শিয়রে জেগেই আছে। আমাদের বাঘ-বনে খাঁড়া-দেঁতোদের বিষম উপদ্রব। তুই তাদের তাড়াতে পারবি?

— পারব।

— আমাদের পাশের বনে অনেক রকম ভয় আছে। তুই তাদের দূর করতে পারবি?

— কেন পারব না রে? গুহা-ভল্লুক, খাঁড়া-দেঁতো-বাঘ, ভূত-প্রেত সকল রকম ভয় দূর হয়ে যায় আমার এই আগুন-মন্তরে! এই মন্তরে অন্ধকারকে মেরে রাতকে আমি দিন করতে পারি! আজ থেকে আমি রইলুম তোদের শিয়রে দাঁড়িয়ে, কোন শত্রুই আর তোদের কাছে আসবে না!

এই কথা শুনেই হুঁহুঁর দলবল গায়ের সব জ্বালা ভুলে গেল, তারা এক এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল জয়, জয়! হাঁহাঁ সর্দারের জয়! তারপর তেমনি চেঁচাতে চেঁচাতে হাঁহাঁকে বেষ্টন করে সবাই মণ্ডলাকারে তাণ্ডব-নৃত্য করতে লাগল, বিপুল উল্লাসে!

সেই আদিম যুগের আদিম মানুষদের আদিম আনন্দের নৃত্যছন্দ আজকে আমাদের বুকে আর বাজে না, সুতরাং তার গভীরতাও আমরা আর বুঝতে পারব না।

সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দের শিহরণ গিয়ে লাগল গহন-বনের গাছে গাছে, পাতায় পাতায় এবং সেই আনন্দের অনাহত ভাষা মুখে নিয়ে আদিম প্রতিধ্বনি কৌতুক-লীলায় ছুটে গেল পাহাড়ের শিখরে শিখরে, দূরে দূরান্তরে!

পশ্চিম আকাশের রঙিন প্রাসাদের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন আলোক-সম্রাট সূর্যদেব। সন্ধ্যা আসন্ন। এখনি জাগবে অন্ধকার এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগবে তার শত শত অনুচর, শত শত বিভীষিকা,

অশরীরী দুঃস্বপ্ন! কিন্তু ওদের নাচ তবু থামল না, তার মত্ততা ক্রমে ক্রমে আরও বেড়ে উঠল!

আজ আর অন্ধকার ও বনবাসী শত্রুর ভয় নেই। মানুষ যে বিশ্ব-জয়ের প্রধান অস্ত্র অগ্নিকে লাভ করেছে! হো হো! চালাও নাচ! জোরে চালাও— আরও, আরও দূন্-তালে!

৬

বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতো

হাঁহাদের পাহাড় থেকে মাইল-খানেক তফাতে আর-একটা ছোট পাহাড়, তারই উপরে দুটো বড় বড় গুহার মধ্যে হুঁহুঁদের আস্তানা।

সেই পাহাড়ের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে বাঘ-বন! দুর্গম ও নির্জন বন, কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবজন্তুর পক্ষেই ভয়াবহ। সে বনের ভিতরে অন্য কোন জীব ঢোকে না, এবং আলোও ঢোকবার পথ খুঁজে পায় না। আমাদের সেই মধু-লোভী গুহা-ভল্লুকী একবার সেই বনে মৌচাক খুঁজতে গিয়ে বাঘের এমন বিষম চড় খেয়ে পালিয়ে এসেছিল যে, আর কোনদিন ও-মুখ হবার ভরসা করে নি!

আলোর অভাবে বাঘ-বনের ভিতরে সর্বদাই বিরাজ করে সন্ধ্যার কালো ছায়া। দেহে লতা-গুল্মের জাল জড়িয়ে অনেক বড়-বড় বনস্পতি আকাশ-ছোঁয়া ঝাঁকড়া মাথাগুলো শূন্যে দুলিয়ে মর্মর-চিৎকারে সবাইকে যেন সর্বদাই সাবধান করে দিচ্ছে— সাবধান, সাবধান! এ-বনে ভুলেও কেউ এস না!

সেখানকার চিরস্থায়ী কালো ছায়ার উপরে ভীষণা রাত্রি এসে যখন আরও পুরু কালিমা মাখিয়ে দেয়, বিশ্বব্যাপী নিশীথিনীর লক্ষ লক্ষ জোনাকি-চক্ষুগুলো যখন পিট্-পিট্ করতে থাকে অশ্রান্ত ভাবে, বাঘ-

বনের ঝোপে ঝোপে জাগে তখন শুক্‌নো পাতার উপরে অদৃশ্য মৃত্যুর পদধ্বনি এবং হিংস্র, রক্তলোভী কণ্ঠের গর্জনের পর গর্জন!

আমরা এ-কেলে বাঘ দেখি, আর তাকেই ভয় করি যমের মত! কিন্তু তাদের যে-সব পূর্বপুরুষ এই বাঘ-বনের ছায়ায় ও অন্ধকারে বিচরণ করত, তারা যে কেবল আকারেই আরও বড় ছিল, তা নয়, চেহারায় ও স্বভাবেও ছিল আরও-ভয়ঙ্কর! সব চেয়ে করাল ছিল তাদের চোয়ালের তুইপাশে ঝুলে-পড়া বাঁকা তলোয়ারের মত তুটো সুদীর্ঘ দন্ত! তারা মুখ বন্ধ করলেও দাঁত তুটো হাতির দাঁতের মত বাইরে বেরিয়েই থাকত। এই জন্যই তাদের খাঁড়া-দেঁতো বাঘ বলা হয়। আধুনিক মানুষের সৌভাগ্য যে, খাঁড়া-দেঁতোদের বংশ অনেক কাল আগেই লোপ পেয়েছে। নইলে কেবল মানুষ প্রভৃতি জীব নয়, আজকের সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' ও আফ্রিকার বিখ্যাত সিংহ পর্যন্ত খাঁড়া-দেঁতোদের জলখাবারে পরিণত হত।

খাঁড়া-দেঁতোদের ভয়ে বাঘ-বন থেকে অতিকায় ম্যামথ-হাতিরাও দল বেঁধে সরে পড়েছিল। বাঘ-বনে বাস করত কেবল হায়েনা প্রভৃতি তু'-চারটি ছোট ছোট জীব। খুব-সাবধানী ও অতি-দ্রুতগামী বলে খাঁড়া-দেঁতোদের দন্ত-নখরকে ফাঁকি দিয়ে তারা নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়তে পারত।

বাঘ-বনে রাজার মত ছিল একটা বাঘ, হুঁহুঁ যার নাম রেখেছিল 'বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতো'। অন্যান্য বাঘরা নিজেদের বন ছেড়ে রোজ রাতে বেরিয়ে নানা দিকে যেত, নানা জীব শিকার করবার জন্য। কিন্তু ঐ বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতোর ভারি শখের খাবার ছিল,— মানুষ। সে প্রায়ই এসে হানা দিত হুঁহুঁদের আস্তানায়, আর বাগে পেলেই প্রায়ই এক-একজন মানুষকে ধরে মুখে তুলে নিয়ে ফিরে যেত নিজেদের আড্ডায়। হুঁহুঁ আগে অনেক লোকের উপরে সর্দারি করত, কিন্তু বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতোর শখ মিটিয়ে তার দল এখন যথেষ্ট হাল্‌কা হয়ে পড়েছে! তাদের চক্‌মকি-পাথরের বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ঐ বুড়োকে মোটেই ব্যতিব্যস্ত

করতে পারত না, কারণ একে সে এত চট্‌পটে যে কেউ অস্ত্র তোলবার সময় পর্যন্ত পেত না, তার উপরে পাথরের বর্শার পক্ষে বুড়োর চামড়া ছিল যথেষ্ট পুরু। তবে হ্যাঁ, একবার হুঁহুঁর ছেলে চুঁচুঁ এমন একটা মস্ত পাথর তার হেঁড়ে মাথায় ধড়াস্ করে ছুঁড়ে মেরেছিল, যার ফলে বুড়োকে বেশ কিছুদিন ভুগতে হয়েছিল দারুণ মাথা-ধরা রোগে।

সেই সময়ে তার সুয়োরানী বাঘ-বৌ (বুড়োর দুই বিয়ে কিনা) বলেছিল, ওগো কর্তা, বুড়ো বয়সে রোগে ধরল, এখন কাচ্চা-বাচ্চাদের মানুষ করি কি করে, বল দেখি?

বুড়ো রেগে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে খাঁড়া-দাঁত উঁচিয়ে বলল, হালুম! কে বলে রে, আমি বুড়ো? পাজি মানুষ-জন্তুগুলো আমাকে বুড়ো বলে ডাকে বলে তুই বুড়িও আমাকে বুড়ো বলে ডাকতে চাস্ নাকি?

চালাক দুয়োরানী বাঘ-বৌ তাড়াতাড়ি বুড়োর গায়ে গা ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে আদর-মাখান স্বরে বলল, হুম্-হুম্, ঘ্যাঁক-ঘ্যাঁক, গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ!' অর্থাৎ— কে বলে গো তোমায়, বুড়ো! বড় গিন্নি যেন কী! কিন্তু তোমার মাথাটা অমন ফুললো কেন, কর্তা?

বুড়ো বলল, মাথা ধরলেই মাথা ফোলে! তুচ্ছ মানুষের হাতে মার খেয়ে যে মাথার অমন দুরবস্থা, এ-কথাটা চেপে গেল সে।

কিন্তু সেইদিন থেকে বুড়ো হল আরও বেশি সাবধান! এমন চুপিসাড়ে সে মানুষ চুরি করে যে, হুঁহুঁর দল তার টিকি পর্যন্ত দেখতে পায় না। হয়ত ভাবছ, বাঘের আবার টিকি কি? কিন্তু বাঘের টিকি হচ্ছে, লেজ। বিশেষত সেকালের খাঁড়া-দেঁতোদের লেজ ছিল এত খাটো যে, টিকি ছাড়া অন্য কোন নামে তাকে না ডাকাই উচিত।

হুঁহুঁ এই বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতোকে টিট্ করবার জন্যই হাঁহাঁর কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়েছে।

কিন্তু হাঁহাঁর কিঞ্চিৎ অসুবিধা হচ্ছে!

সে বিলক্ষণ জানে, একমাত্র অগ্নিদেবের মহিমাই তার মান-সম্ভ্রম বাড়িয়ে তুলেছে এতখানি। এরা বশ মেনেছে ভালবেসে নয়, ভয়ে।

এই ভয় যেদিন দূর হবে, এরা তাকে কীট-পতঙ্গের মত টিপে মেরে ফেলতে ইতস্তত করবে না। সুতরাং এদের এই ভয়কে জাগিয়ে রাখা দরকার অষ্টপ্রহর।

তাকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে, হুঁহুঁরা যাতে কিছুতেই আগুন সৃষ্টি করবার গুপ্ত-রহস্য জানতে না পারে।

আসল গুপ্ত কথা হাঁহাঁ কাউকে বলেনি— ছেলেদেরও না, বউকেও না। সে যে শুকনো পাতার গাদায় ডালে ডালে ঘষে আগুন তৈরি করে, তার পরিবারবর্গ বড়-জোর এইটুকুই দেখেছে। কিন্তু বিশেষ এক জাতের ডাল না হলে যে অগ্নি উৎপাদন করা অসম্ভব, এটুকু বুদ্ধি নেই তাদের কারুর ঘটেই, তারা অবাক হয়ে ভাবে, এ-সব ফুসমন্তরের লীলাখেলা!

হাঁহাঁও সব কথা চেপে গিয়েছে চালাকের মত। প্রতিজ্ঞা করেছে, আসল ব্যাপার কারুর কাছেই ভাঙবে না। যতদিন সবাই থাকবে অন্ধকারে, ততদিনই তার জয়-জয়কার!

কিন্তু সকলের সঙ্গে বাঘ-বনে গিয়ে প্রকাশ্যে আগুন জ্বালবে সে কেমন করে? সেইটেই হয়েছে তার সমস্যা!

অবশেষে ভেবে ভেবে একটা উপায় বার করল। ছেলেদের ডেকে বলল, ওরে টুটু, ওরে ঘটু! বাঘ-বনে তোরা আমার সঙ্গে যাবি রে! শোন্, কেমন করে আমার কাছে খোকা-আগুন আসে, সে-কথা কারুকে বলিস্ নে!

তারা বলল, বলব না রে বাপ্!

অবশ্য বললেও খুব বেশি ক্ষতি ছিল না। কারণ টুটু-ঘটু তো জানে না, তাদের বাপের হাতের ডাল দুটো কোন্ গাছের! এমন কি তারা নিজেরাও যা তা গাছের ডাল নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছে, আগুন জ্বলে না। তবু হাঁহাঁ সব ব্যাপারটাই রহস্যের মত রাখতে চায় কারণ সাবধানের মার নেই।

পরদিন দুপুরেই হুঁহুঁ আর টুঁটুঁ তাদের দলবল নিয়ে এসে হাজির।

হুঁহুঁ এগিয়ে এসে হাঁহাঁর সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, চল্ রে সর্দার! বাঘ-বন জয় করবি চল্!

হাঁহাঁ তার বর্শাটা মাটিতে ঠুকে সদম্ভে বলল, যাবই তো! বাঘ-বন জয় করে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে আসব রে!

— বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতো ভারি ধড়িবাজ! মানুষ দেখলেই ঘাড়ে ঝাঁপ খায়!

— রাখ্ রে রাখ্! বুড়ো ঝাঁপ খায় তোদের ঘাড়ে! তাকে দেখলে আমারই ফুসমন্তর ঝাঁপ খাবে তার ঘাড়ে! চল, দেখ্‌বি চল্!

দেবতার পানে লোকে যেমনভাবে তাকায়, হাঁহাঁর গর্বিত মুখের দিকে সদলবলে হুঁহুঁ তাকিয়ে রইল তেমনি ভক্তিভরে— না, শুধু ভক্তি নয়, তার মধ্যে ভয়ের ভাবও ছিল বৈকি!

চলল সবাই বাঘ-বনের দিকে। যে-পথ ধরে তারা অগ্রসর হল, তোমরা যদি সেখানে থাকতে, তাহলে নিশ্চয়ই বলতে, আহা, আহা, কী চমৎকার!

সত্যি, চমৎকারই বটে! অতুল! সেকালের জীব-জন্তুদের চেয়ে একালের জীবজন্তুদের আকৃতি প্রকৃতি হয়ত উন্নত হয়েছে, কিন্তু তখনকার নিসর্গ-দৃশ্য এখনকার তুলনায় শ্রেষ্ঠতার দাবি করতে পারে নিশ্চয়ই! আকাশের নিবিড় নীলিমাকে তখন শহর আর কল-কারখানার কালো ধোঁয়া ময়লা করে দিতে পারত না, নদীর বুকে ছুটত না তখন কর্কশ পোঁ বাজিয়ে বিশ্রী ইষ্টিমার এবং ঘনশ্যামল ক্ষেতের বুক চিরে ভীষণ চিৎকারে কান ফাটিয়ে ও বিষম শব্দে মাটির প্রাণ কাঁপিয়ে ধেয়ে চলত না ভয়াবহ লৌহ-অজগরের মত সুদীর্ঘ রেলের গাড়ি!

চারিদিকে সুন্দর শান্তির রাজ্য! সোনা-রোদের আলোয় নীলাম্বর করছে ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ এবং গাঢ়-সবুজ বনে বনে ফল-ফুল লতা-পাতার সভায় গিয়ে আলো আর ছায়ায় মিলে খেলছে মনোরম ঝিল্‌মিল্-ঝিলমিল্ খেলা! কোথাও মেঘের সঙ্গে ভাব করবার জন্য বিপুল শূন্যে

মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিরাট পর্বত এবং তার কালো বুকে দুলছে কল-কৌতুক-হাসিতে ভরা ঝরণার রুপোলি হার, কোথাও ঘাসের সবুজ সাটিনে নরম বিছানা পেতেও ঘুমোতে না চেয়ে ছুটে চলেছে দুষ্ট নদী-মেয়ে কুল্‌কুল্‌ গান গেয়ে ! হরিণ চরছে, পাখি ডাকছে, নামহীন ফুলেরা মৌমাছি-প্রজাপতিদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে মন-মাতানো গন্ধ দূতদের !

কিন্তু হাঁহাঁ, হুঁহুঁ প্রভৃতি সেকালের আদিম মানুষরা এ-সবের মাধুর্য নিজেদের অজান্তেই প্রাণে-প্রাণে অনুভব করলেও, এদের সৌন্দর্য নিয়ে হয়ত আজকালকার কবিদের মত ভাষায় আলোচনা করতে শেখেনি। শিখলেও সে-আলোচনার সময় সেদিন ছিল না।

কারণ পথ চলতে চলতে টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ সেদিন কেবলই ভাবছে, হাঁহাঁ-সর্দারের ফুসমন্তর যদি ফস্কে যায়, বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতো তাহলে আগে তার দিকেই নজর দেবে, না, আগে আমাকেই গপ্‌ করে গিলে ফেলতে আসবে ?

আর হাঁহাঁ ভাবছে ক্রমাগত, বাঘ-বনে বাঘ আছে অগুন্তি, একা খোকা-আগুন যদি তাদের সবাইকে সাম্‌লাতে না পারে, তাহলে ফিরে এসে আর সর্দারি করতে পারব কি ?

আরও খানিকটা এগিয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে হুঁহুঁ বলল, ঐ ছাখ্‌ রে সর্দার, ঐ বাঘ-বন !

হাঁহাঁ এদিক ওদিক তাকিয়ে, পাশের একটা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, খবর্দার, তোরা কেউ আমার সঙ্গে আসিস্‌ নে।

— কেন সর্দার ?

— আমি ফুসমন্তর ঝাড়তে যাচ্ছি।

— তো আমরা যাব না কেন ?

— আমি এখন মন্তর পড়ে অগ্নিদেবকে ডাকব। সে-সময় অন্য কেউ কাছে থাকলে দেবতার কোপে মারা পড়বে !

এ যুক্তির উপর কথা চলে না। হুঁহুঁ তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল !···

হাঁহাঁ সেই যে বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকল, আর বেরুবার নাম নেই। এই আসে, এই আসে করে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুঁহুঁদের পা করতে লাগল টন্ টন্।

হুঁহুঁ শেষটা হাঁড়িপানা মুখ করে টুটুকে ডেকে বলল, এই! তোর বাপটা লম্বা দিল নাকি?

টুটু বুক ফুলিয়ে বলল, কী বলিস রে ঢুঢু-র বাপ! তোদের মত আমাদের বাপ পালায় না রে!

— তবে গেল কোথা?

— বাবা ফুসমন্তর আউড়ে পূজো করছে!

— ছাই করছে!

হঠাৎ ঢুঁঢুঁ উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, বাবা!

— কি রে, কি রে?

— অগ্নিদেব! ঢুঁঢুঁ জঙ্গলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

হুঁহুঁ চমৎকৃত হয়ে দেখল, জঙ্গলের উপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলি এবং ভেতরে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দাউ-দাউ আগুন!

তার পরেই দেখা গেল, জঙ্গলের ভেতর থেকে সদর্পে পা ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসছে হাসিমুখে হাঁহাঁ-সর্দার, তার দু'হাতে দু'খানা জ্বলন্ত কাঠ! হাঁহাঁ কাছে এসেই বলল, যা রে তোরা সবাই, ঐ জঙ্গলে যা! ওখানে এমনি আগুন-কাঠ অনেক আছে, তোরা সবাই দু'খানা করে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে বাঘ-বনে ছুটে চল্! যা যা, দেরি করিস্ নে, অগ্নি-দেব তাহলে পালিয়ে যাবেন!

হাঁহাঁর ফুসমন্তরের প্রভাব দেখে টুটু-ঘটু ছাড়া বাকি সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অগ্নি-দেবের পালাবার সম্ভাবনা আছে শুনে তাদের চমক ভাঙল এবং সবাই এক ছুটে জঙ্গলের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

ছুয়োরানী বাঘ-বৌয়ের দুই খোকা আর এক খুকি হয়েছিল, সে তাদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে। খুকিকে দুই থাবা দিয়ে চেপে ধরে গা চেটে দিচ্ছে এবং টিকির মত ছোট্ট লেজটা নেড়ে নেড়ে খোকা-বাচ্চা দুটোর সঙ্গে খেলা করছে।

সুয়োরানী প্রতিদিন যা করে, সেদিনও তাই করছিল, অর্থাৎ বরের সঙ্গে ঝগড়া, দু'দিন আজ শিকারে যাওনি, সংসারে যে খাবার বাড়ন্ত, সে হুঁশ আছে?

ছায়া যেখানে প্রায় অন্ধকারের মত ঘন, সেইখানে একরাশ শুক্‌নো পাতার বিছানায় কুঁক্‌ড়ে-সুক্‌ড়ে পরম আরামে শুয়ে বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতো একটি দীর্ঘ নিদ্রা দেবার আয়োজন করছিল। সেই অবস্থাতেই অস্পষ্ট স্বরে সে বলল, ঘ্যানর ঘ্যানর করিস্ নে বলছি! কেন, থাবা খেয়ে মরবি!

ছুয়োরানী খুকির গা-চাটা থামিয়ে স্বামীর পক্ষ নিয়ে বলল, খিদে যদি পেয়ে থাকে দিদি, নিজে গিয়েই পাহাড় থেকে একটা মানুষ ধরে নিয়ে এস না, কর্তাকে আর জ্বালাও কেন?

বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতো হঠাৎ মাথাটা একটু তুলে বলল, ছোটগিন্নি, তুই মানুষের নাম করতেই নাকে যেন মানুষের গন্ধ পাই!

সুয়োরানী খাঁড়া-দাঁত খিঁচিয়ে বলল, বুড়োর ভীমরতি হয়েছে! বাঘ-বনে মানুষের গন্ধ? কী যে বলে।

সে-কথা কানে না তুলে বুড়ো তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। একদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বনের ও-খানটা নড়ছে কেন?

সুয়োরানী চট্‌পট্ বরের একপাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, শুক্‌নো পাতার ওপরে খড়্-মড়্ শব্দ হচ্ছে কেন?

ছুয়োরানী চট্‌পট্ স্বামীর আর একপাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, বনের ভেতর ধোঁয়া উঠছে কেন?

বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতো হা হা করে হেসে বলল, দেখতে পেয়েছি। বড় গিন্নির ভারি বরাত-জোর, বাঘ-বনে খাবার নিজেই এসে হাজির

হয়েছে! আরে আরে, একটা নয়— দুটো নয়, অনেকগুলো খাবার যে! হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ! ভীষণ গর্জনে বাঘ-বনের গাছ-পাতা কাঁপিয়ে সে প্রকাণ্ড এক লম্ফ ত্যাগ করল!

প্রথম লাফের পর দ্বিতীয় লাফ, তারপর সে যখন তৃতীয় লাফ মারবার উপক্রম করছে, জঙ্গল ভেদ করে হল হাঁহাঁর আবির্ভাব এবং পর-মুহূর্তেই সে বুড়োকে একে একে দু'খানা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারল!

বুড়ো চট্ করে সরে প্রথম কাঠখানা এড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় কাঠখানা ফটাং করে তার পিঠের উপরে এসে পড়ল বটে, কিন্তু তার গতি রোধ করতে পারল না, অগ্নিদাহের যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে মহাক্রোধে সে তৃতীয় লাফ মেরে একেবারে হাঁহাঁর সামনে গিয়ে তুলল তার প্রচণ্ড থাবা!

হাঁহাঁর সর্দারি সেইখানেই ফুরিয়ে যেত, কিন্তু চকিতে হুঁহুঁর বেটা টুঁটুঁ পিছন থেকে সুমুখে এসে, বুড়োর মুখের উপরে ভয়ানক জোরে বসিয়ে দিল জ্বলন্ত কাঠের আর এক ঘা— আবার এক ঘা!

অসহ্য যন্ত্রণায় পাগলের মত বুড়ো চারিদিকে ছুটোছুটি করে গাঁ-গাঁ রবে, আর থেকে থেকে নিজের মুখ-চোখের উপরে দুই থাবা ঘষে। তার এলোমেলো দৌড় দেখে কারুরই আর বুঝতে বাকি রইল না যে, টুঁটুঁর কাঠের আগুনে পুড়ে খাঁড়া-দেঁতোর দুই চক্ষুই এতক্ষণে হয়েছে অন্ধ!

তখন চারিদিক থেকে তার উপরে জ্বলন্ত কাঠ বৃষ্টি হতে লাগল— সেই সঙ্গে বড় বড় পাথরও! দেখতে দেখতে তার ছট্‌ফটানি স্থির হয়ে এল এবং ক্ষীণ হয়ে এল তার গর্জন ও আর্তনাদ! তারপর খাঁড়া-দেঁতোর দেহ একেবারে নিস্তব্ধ!

সুয়োরানী, দুয়োরানী প্রভৃতি এই কল্পনাতীত অগ্নিকাণ্ড দেখে ভড়্‌কে গিয়ে অনেকক্ষণ আগেই টিকির মত ছোট লেজ তুলে দিয়ে লম্বা ভোঁ-দৌড়!

হুঁহুঁ আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাঁহাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে

তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে বলল, ওরে আমাদের হাঁহাঁ-সর্দার! তোকে আমরা পুজো করব রে!

হাঁহাঁ বলল, আরে ছাড়্ ছাড়্, এখনও কাজ বাকি আছে!

হাঁহাঁকে নামিয়ে দিয়ে হুঁহুঁ বলল, বুড়ো তো অক্কা পেয়েছে রে, আবার কী কাজ বাকি?

— বুড়ো মরেছে বটে, কিন্তু বাঘ-বনে আর কি বাঘ নেই?

হুঁহুঁ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, তা আছে বৈকি!

— আজ তাদের সবাইকে হয় মারব, নয় তাড়াব!

— দূর সর্দার অসম্ভব!

— অগ্নি-দেবতার দয়া হলে কিছুই অসম্ভব নয়!...ভাই সব, বনের তলাটা শুকনো পাতায় ছেয়ে আছে, কাঠের আগুনে ধরিয়ে দে পাতাগুলো!

হাঁহাঁর ফন্দি ব্যর্থ হল না। ঘণ্টা কয়েক পরে দেখা গেল, বাঘ-বনের মধ্যে বহুদূরব্যাপী দাবানলের তাণ্ডব-নাচ শুরু হয়েছে এবং তার লক্ষ লক্ষ লক্লকে রক্তশিখা যেন মহা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে চিৎকার করতে করতে!

এবং বনের মধ্যে সর্বত্র জেগে উঠেছে খড়্গদন্ত ব্যাঘ্রদের আর্তধ্বনি! আগুনের বেড়াজালে ধরা পড়ে কত বাঘ যে মাটিতে আছড়ে-পিছড়ে মারা পড়ল তার আর সংখ্যা নেই। বাকি বাঘগুলো সে-বন ছেড়ে কোথায় যে সরে পড়ল, তা কেউ বলতে পারে না। তখন থেকে ব্যাঘ্র-বনে হল ব্যাঘ্রের অভাব! মানুষরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

হাঁহাঁ একগাল হেসে বলল, কি রে, হুঁহুঁ! আমার বাহাদুরিটা দেখলি ত?

হুঁহুঁ কৃতজ্ঞ-স্বরে বলল, কি আর বলব, সর্দার! দে, তোর পায়ের ধুলো নিই!

হুঁহুঁর দলবল একসঙ্গে চিৎকার করে বলল, জয়, জয় হাঁহাঁ-সর্দারের জয় !

হাঁহাঁ নিজের নামে জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর ফিরে ডাকল, টুঁটুঁ।

— সর্দার !

— আজ তুই না থাকলে মারা পড়তুম। না রে ?

টুঁটুঁ চুপ করে রইল।

— সাবাস জোয়ান তুই।

— সর্দার, আমি তোর ছেলের মত।

— তুই আমার নিনিকে বিয়ে করতে চাস্ ?

টুঁটুঁ ঘাড় নেড়ে সায় দিল। গুরুজনদের সামনে সেকালের বর বা বউ কারুরই সঙ্কোচ ছিল না।

— শোন্ হুঁহুঁ ! তোর বেটা আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তাই নিনিকে আমি তার হাতে দেব। আজ রাতেই এদের বিয়ে হবে।

— আজ রাতে ? অন্ধকারে ?

— দূর বোকা ! আমার ঘরে অগ্নিদেব আছেন যে ! গুহা-ভল্লুক আর খাঁড়া-দেঁতোর মত অন্ধকারকেও আমি যে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি ! নে, এখন চল্ ! বুড়ো-খাঁড়া-দেঁতোর লাসটাকেও নিয়ে চল, বিয়ের ভোজে কাজে লাগবে !

— ঠিক বলেছিস্ সর্দার ! খাঁড়া-দেঁতো রোজ আমাদের খেত, আজ আমরা ওকেই খাব। ওহো, কি মজা !

বাঘ-বনের বিরাট অগ্নি-উৎসবের লাল আভায় রঞ্জিত পথ দিয়ে সকলে হাসি মুখে ফিরল, বিয়ের ভোজের কথা ভাবতে ভাবতে।

আদিম মানুষের কথা

মানুষের পুরোনো কাহিনী বলতে বলতে এইবারে গল্প থামিয়ে ছোট্ট একটি আলোচনা করব।

তোমরা হয়ত ভাবছ, এতক্ষণ ধরে মানুষের যে ইতিহাস বললুম, তা কাল্পনিক, কিন্তু তা কাল্পনিক কথা মোটেই নয়। নৃতত্ত্ববিদ অর্থাৎ নরবিদ্যায় যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরা ঠিক সুচতুর ডিটেক্‌টিভের মতই নানা প্রমাণ দেখে মানুষের সত্যকার ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। এ-সব বিষয় নিয়ে আজীবন নাড়াচাড়া করে তাঁরা এতটা পাকা হয়ে উঠেছেন যে, প্রাচীন মানুষদের মাথার খুলির বা চোয়ালের ভগ্নাংশ দেখেই বলে দিতে পারেন, সম্পূর্ণ অবস্থায় তাদের মুখের গড়ন ছিল কী-রকম।

তাদের আচার ব্যবহারও নানা উপায়ে জানা গিয়েছে। একটা উপায়ের কথা বলছি। ধর, আদিম মানুষদের দ্বারা ব্যবহৃত একটা গুহা আবিষ্কৃত হল। সে গুহায় ঢুকে প্রথমটা কিছুই হয়ত দেখা যাবে না; কারণ দশ-পনের-বিশ হাজার বৎসরের পুঞ্জীভূত ধূলা-জঞ্জাল কঠিন মাটিতে পরিণত হয়ে গুহার ভেতরের সমস্ত দ্রষ্টব্যকেই কবর দিয়েছে। পণ্ডিতরা তখন গুহার মাঝ খুঁড়তে আরম্ভ করলেন। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল মানুষের খুলি বা কঙ্কালের সঙ্গে ম্যামথ-হাতির দাঁত বা কঙ্কালাবশেষ এবং বল্গা হরিণ, রোমশ গণ্ডার, ভল্লুক ও ষাঁড় প্রভৃতি জন্তুর হাড়, চকমকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য জিনিস।

পণ্ডিতরা মানুষের খুলি বা কঙ্কালের কাঠামোর উপরে প্লাষ্টার চাপিয়ে আগে তার চেহারা আবিষ্কার করলেন। তারপর চিন্তা করে বুঝলেন, ঐ-সব অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্তর তারা ব্যবহার করত এবং

যে-সব জন্তুর মাংস তারা ভক্ষণ করত ঐ হাড়গুলো হচ্ছে তাদেরই। মাংস খাবার পর হাড়গুলো তারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। হাড়গুলো দেখে আরও বোঝা গেল, ঐ জাতের মানুষদের যুগে কোন্ কোন্ জীব পৃথিবীতে বিচরণ করত।

নর-বিদ্যায় এখনকার সব-চেয়ে বড় পণ্ডিত স্যর আর্থার কিথ্ বলেন, মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে বানর। কিন্তু অন্যান্য অনেক পণ্ডিতের মতে, মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে এমন কোন জীব, যে ঠিক বানরও নয়, ঠিক মানুষও নয়। কিন্তু সে যে কী-রকম জীব তা কেউ জানে না, কারণ তার কোন কঙ্কাল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি!

পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস লেখা আছে পৃথিবীর বুকের ভিতরেই। আজ পর্যন্ত যত জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জন্মে আবার চিরবিদায় নিয়েছে, পৃথিবীর মাটির স্তরে স্তরে তাদের অধিকাংশেরই চিহ্ন লুকান আছে। এক-একটি বিশেষ স্তরে পাওয়া যায় এক-একটি বিশেষ জাতের জীব-জন্তু বা উদ্ভিদের চিহ্ন। সকলের আগে যারা জীবজগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া যায় তাদেরই চিহ্ন। এই সকল এক-একটি স্তরকে এক-একটি বিশেষ যুগ বলে ধরা হয়। এক-একটি স্তর পড়তে কত কাল লাগে, ভূতত্ত্ববিদ্‌রা তারও একটা মোটামুটি হিসেব করে ফেলেছেন। এই হিসাবের উপর নির্ভর করেই বলা হয়, কত হাজার বৎসর হয়েছে কোন্ কোন্ জীবনের আবির্ভাব।

পৃথিবীতে এক সময়ে ছিল তুষার-যুগ। খুব সম্ভব সেই সময়েই হয় মানুষের প্রথম আবির্ভাব। মানুষের সব-চেয়ে-পুরোনো কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ যবদ্বীপে বা জাভায়। কঙ্কাল পরীক্ষা করবার পর তার আকৃতি-প্রকৃতির অনেক কথাই জানা গিয়েছে। তাকে বানর-মানুষ বলে ডাকা হয়। তার মাথার খুলির গড়ন গিবন-বানরের মত। কিন্তু সে মানুষের মত দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটত, ছুটত এবং মুঠোয় লাঠি ধরতে পারত, তবে কাপড়-চোপড় পরত না। খুব সম্ভব, সে কথাবার্তা কইতেও জানত না। আর তার

মস্তিষ্কের শক্তি বন-মানুষের তুলনায় উন্নত হলেও আধুনিক মানুষের তুলনায় বিশেষ উন্নত ছিল না। পণ্ডিতদের মতে, এই সময়েই অন্যান্য জন্তুদের সঙ্গে ভয়াবহ খাঁড়া-দেঁতো বাঘরা ছিল মানুষের সহচর। আমরা যে-যুগে খাঁড়া-দেঁতোদের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ দেখিয়েছি, সে-যুগে হয়ত তাদের অস্তিত্ব ছিল না। তবে কোন একটা জন্তু এক-যুগেই নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। খাঁড়া-দেঁতোদের শেষ বংশধররা দলে হালকা হলেও পরবর্তী যুগেও যে পৃথিবীর দু'-এক জায়গায় বিচরণ করত না, এ-কথা কে জোর করে বলতে পারে? যেমন ভারতীয় সিংহদের যুগ আর নেই, তবু তাদের কয়েকটি জীবন্ত নমুনা আজও দক্ষিণ ভারতে বিদ্যমান।

সেই নির্দয় তুষার-যুগে পশ্চিম ও মধ্য-য়ুরোপে, উত্তর-আফ্রিকায় ও ও উত্তর-ভারতে যে মানুষের অস্তিত্ব ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেকের মতে, মানুষের প্রথম জন্ম হয় মধ্য-এশিয়ায়। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন, আদিম যুগে ও-জায়গার উপরে প্রকৃতির দৃষ্টি ছিল এমন কঠোর যে, মানুষ সেখানে টিঁকতেই পারত না। এঁদের মতে উত্তর-আফ্রিকা থেকে পারস্যের মধ্যবর্তী কোন স্থান মানুষের আদি জন্মভূমি।

মানুষের আদি জন্মভূমি যেখানেই হোক্, আদিম মানুষদের আত্মরক্ষার জন্য যে কঠিন জীবন-যুদ্ধে নিযুক্ত হতে হয়েছিল, আজকে আমাদের কাছে তা অমানুষিক বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। ভীষণ ভীষণ জানোয়ারের ও তুষার-যুগের কল্পনাতীত শীতের সঙ্গে দুর্বল বানর-মানুষরা অবিরাম যুদ্ধ করেছে— দেহ তাদের ক্ষুদ্র ও নগ্ন এবং তারা অগ্নির ব্যবহারও জানত না! আর পাথরের অস্ত্র পর্যন্ত তখনও তৈরি করতে শেখেনি!

তখনকার শীত এমন ভয়ানক ছিল যে, বহু অতিকায় ও মহা-বলিষ্ঠ জীবও তা সহ্য করতে পারেনি বলে তাদের বংশ একেবারে লোপ পেয়েছে! কিন্তু সেই তুষার-মরু পার হয়ে ক্ষুদ্র হয়েও মানুষ বর্তমানের

দিকে বিজয়ীর বেশে এগিয়ে আসতে পেরেছে, কেবলমাত্র মস্তিষ্কের জোরে। এই মস্তিষ্কেরই অভাবে মানুষের আগে আর কোন জীব বস্ত্র ও অগ্নি ব্যবহার করতে শেখেনি।

বানর-মানুষদের পরে আমাদের যে-সব পূর্বপুরুষ পৃথিবীতে বিচরণ করেছে, তাদের পিকিং, রোডেশিয়ান, পিল্টডাউন, হিডেলবার্গ, প্রি-চেলান, চেলান মানুষ প্রভৃতি বলে ডাকা হয়। এরই মধ্যে আরও নানা জাতের মানুষ পৃথিবীতে এসে স্বজাতিকে ক্রমোন্নতির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু এখনও তাদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নি!

পূর্বোক্ত কিথ্ সাহেবের মত হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয়, আনুমানিক দশ লক্ষ বৎসর আগে, কিন্তু নিশ্চয়ই প্রথম যুগে এবং তারও কয়েক লক্ষ বৎসর পরেও মানুষ ছিল বানরের নামান্তর মাত্র। জাভায় প্রাপ্ত মানুষের কঙ্কালাবশেষের বয়স হচ্ছে পাঁচ লক্ষ বৎসর, অথচ তখনও সে বানরের চেয়ে বিশেষ উন্নত হতে পারে নি। পিকিং-মানুষের বয়স ধরা হয়েছে আড়াই লক্ষ বৎসর —রোডেশিয়ান-মানুষদেরও ঐ বয়স। হিডেলবার্গ-মানুষরা দেড় লক্ষ দু'লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীতে বিচরণ করত। কিন্তু এদের মস্তিষ্ক অপরিণত। সুতরাং বুঝতেই পারছ, মানুষের মস্তিষ্ক বর্তমান আকার লাভ করেছে কল্পনাতীত কত যুগব্যাপী চর্চার পর!

তারপর 'নিয়ান্‌ডের্টাল' মানুষের আগমন— এতক্ষণ ধরে যাদের গল্প তোমাদের কাছে বলেছি। ঐ 'নিয়ানডের্টাল'দের দেহাবশেষ য়ুরোপেই পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু ও-জাতের বা ওদেরই মত মানুষ যে তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। কেউ কেউ হিসাব করে বলেছেন, 'নিয়ান্‌ডের্টাল'রা পৃথিবীতে এসেছে পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে। এদের যুগের চিরস্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে মানুষের অগ্নিলাভ। এই এক আবিষ্কারেই মানুষ যে কী করে অপরাজেয় ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে উঠল, গল্পের মধ্যেই তার অল্প-বিস্তর আভাস তোমরা পেয়েছ।

আমরা যে-সময়ে হাঁহাঁর অগ্নিলাভ করার উল্লেখ করেছি, অন্যান্য জায়গার মানুষদের সঙ্গে অগ্নির বন্ধুত্ব হয়েছে, তার ঢের আগেই। কিন্তু এতে আমাদের ভুল হয়নি। কারণ আদিম কালে নানা দেশের মানুষদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়েই আদান-প্রদানের সুযোগ ছিল না। কাজেই অগ্নি ব্যবহার করতে শিখেছে কোন দেশের মানুষ অনেক আগে, কোন দেশের মানুষ অনেক পরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন আদিম জাতি আজও আগুন জ্বালাতে জানে না।

কিন্তু পণ্ডিতদের মতে, 'নিয়ানডের্টাল'রাও আমাদের মত মানুষ নয়, কারণ তাদের দেহেও এমন সব লক্ষণ ছিল, যা বানর বা বন-মানুষদের দেহেই দেখা যায়।

আনুমানিক পনের হাজার বছর আগে থেকে 'নিয়ান্‌ডের্টাল'রা বিলুপ্ত হতে শুরু করে। তারা একেবারে লুপ্ত হবার আগে আবার যে-সব নতুন জাতির আবির্ভাব হল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত হচ্ছে 'ক্রো-ম্যাগ্নন্' মানুষরা। এদেরই আধুনিক মানুষ বলে ডাকা হয় এবং কোন দেশে এদের প্রথম জন্ম বা আবির্ভাব তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে য়ুরোপে গিয়েছিল তারা বোধ হয় উত্তর-আফ্রিকা থেকে। তাদের মুখে-চোখে ছিল কিছু কিছু মঙ্গোলীয় ও ও আমেরিকার 'রেড-ইণ্ডিয়ান' ছাপ্‌।

আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি, এই রকম আধুনিক মানুষরা ভারতবর্ষেও আবির্ভূত হয়েছিল, কেননা ভারতীয় সভ্যতার বয়স য়ুরোপের চেয়ে অনেক বেশি। পরের পরিচ্ছেদে এই নতুন আধুনিক মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহারের কথা তোমরা জানতে পারবে।

নতুন মানুষ

ভারি চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে! সখ করে বেড়াতে বেরিয়েছে নতুন বর ঢুঁঢুঁর সঙ্গে নতুন বউ নিনি।

বনে বনে গাছের দোল, সেইসঙ্গে সবুজ ঘাসের বিছানার উপরে দুলছে আলো, দুলছে ছায়া।

সেদিনও কোকিল ডাকত শ্যামলতার অন্তঃপুর থেকে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ভাষা অনেক বদলেছে, কিন্তু কোকিলের ভাষা ছিল ঐ রকম। অর্থাৎ— কুহু, কুহু, কুহু!

কোকিলের গান শুনতে শুনতে তারা নদীর ধারে গিয়ে হাজির হল। মস্ত নদী— তার দু'ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে পাহাড়রা দিচ্ছে পাহারা। নদী যে কতদূর গিয়েছে, কেউ তা জানেনা।

ঢুঁঢুঁ হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে বউ, তোর বাপ আমাকে তোদের ঘরে ঢুকতে দেয় না, কেন রে?

ঘর, অর্থাৎ গুহা। তার মধ্যে আছে অগ্নিদেবকে জাগিয়ে রাখবার গুপ্ত-রহস্য এবং হাঁহাঁ তার জামাইকেও বিশ্বাস করে না। তার পক্ষে এটা অবশ্য অন্যায় নয়। কারণ সেই আদিযুগের জামাইরা শ্বশুরদেরও খাতির টাতির রাখত না।

নিনি তা জানে আর এটাও তার অজানা নেই যে, একবার অগ্নি-রহস্য আবিষ্কার করতে পারলেই ঢুঁঢুঁর হাতে হাঁহাঁর প্রাণ যাওয়াও আশ্চর্য নয়। বাপের বিপদ কোন্ মেয়ে চায়?

অতএব ঢুঁঢুঁর প্রশ্ন চাপা দেবার জন্য সে বলল, বাপের মনের কথা আমি কি জানি? ও-কথা চুলোয় যাক্, তুই ঐ ফুলগুলো

তাড়াতাড়ি পেড়ে দে দেখি! বলে সে সামনের একটা ছোট পাহাড়ের উপরকার একটা গাছের দিকে অঙুলি নির্দেশ করল।

— ফুল নিয়ে কি করবি?

— গন্ধ শুঁকব রে বর! ফুল দিয়ে যে মালা গাঁথা যায়, নিনিদের সমাজের মেয়েরা তা জানত না।

টুঁটু হাতের প্রচণ্ড পাথুরে মুগুরটার উপর ভর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। নিনি ঘাসের উপরে তুই পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

উঁচু গাছের ডালে উঠে টুঁটু কিন্তু ফুল পাড়বার নামও করল না, নদীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বসে রইল চিত্রার্পিতের মত!

নিনি নিচে থেকে ধমক দিল, এই কুঁড়ে বর, ফুল পাড় না!

টুঁটুঁর মুখে রা নেই! নিনি বলল, হাঁ করে ওদিকে কি দেখছিস্ রে বর? কখনও কি নদী দেখিস নি?

— নদী ঢের দেখেছি রে বউ, কিন্তু নদীতে অমন সব জানোয়ারকে কখনও সাঁতার কাটতে দেখি নি ত!

— জানোয়ার? কী জানোয়ার? হাতি-টাতি?

— উহু! বেয়াড়া জানোয়ার! তু'দিকে ঝপাং ঝপাং করে হাত ফেলে সাঁতার কাটছে! আর ওদের পিঠের ওপরে বসে পাঁচ-ছ'জন করে মানুষ!

— দূর, বোকা বর! জলে জানোয়ারের পিঠে চড়ে মানুষ কখন বেড়াতে পারে?

— বেড়াতে পারে কি, বেড়াচ্ছে! বিশ্বাস না হয়, উঠে দেখ্!

বিষম কৌতূহলে নিনি চঞ্চল হরিণীর মত দ্রুত পায়ে পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠল। সবিস্ময়ে দেখল, টুঁটুঁর কথা ত মিথ্যা নয়! একটা নয়, তুটো নয়, পরে পরে বিশ-পঁচিশটা অদ্ভুত জানোয়ার! তাদের প্রত্যেকের পিঠে রয়েছে পাঁচ-সাতজন করে মানুষ!

নিনি সভয়ে বলল, ওরে বর, জানোয়ারগুলো যে একে একে আমাদের কাছেই তীরে এসে দাঁড়াচ্ছে! ঐ দেখ্, মানুষগুলোও ওদের পিঠ থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ছে! চল্, পালাই চল্!

টুঁটুঁ বলল, না রে, ওরা আমাদের দেখতে পায়নি! এইখানে লুকিয়ে থেকে ওরা কি করে দেখ্ না!

সে-যুগে মানুষের মন ছিল অনেকটা জন্তুর মত। পথে একটা কুকুরের সঙ্গে আর একটা অচেনা কুকুরের দেখা হলেই মারামারি কাম্ড়া-কাম্ড়ি হয়। তখনও চেনাশুনা না থাকলেই এক মানুষ করত আর মানুষকে আক্রমণ বিনাবাক্যব্যয়ে। আজ হাজার হাজার বৎসর পরেও মানুষ-শিশুর মনে এই ভাবেরই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অচেনা লোক দেখলেই শিশু ভয়ে কেঁদে ফেলে। কাজেই অন্তত পনেরো হাজার বছর আগেকার বুনো মেয়ে নিনির মনে অপরিচিতকে দেখে ভয়ের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক।

হঠাৎ টুঁটুঁ সচকিত কণ্ঠে বলল, ও বউ, দেখ্ দেখ্, ওদের সঙ্গে বড় বড় কুকুর রয়েছে! কুকুরগুলো আবার ওদের সঙ্গে লেজ নেড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছে! মানুষের সঙ্গে কুকুরের ভাব! আজব কাণ্ড!

হাঁহাঁ, হুঁহুঁ, টুঁটুঁ প্রভৃতি যে-সমাজে মানুষ হয়ে জন্মেছে, সে-সমাজের কেউ কখনও গৃহপালিত জন্তুর কথাও শোনে নি। জন্তু দেখলেই মাংস খাবার জন্য তারা বধ করত, তাদের পোষ মানিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা কেউ করত না।

নিনি বলল, দেখ্ বর, দেখ্! একটা মানুষ আমাদের খুব কাছে এসেছে! এ কোন্ দেশের নতুন মানুষ?

— হ্যাঁ রে বউ, তাইত! ওর গায়ের রং আমাদের মত কালো কুচ্কুচে নয়, সাদা সাদা, বিচ্ছিরি! ওর মাথার চুলগুলো আমাদের মত উস্কোখুস্কো নয়— সাজান-গোছান, চক্চকে!

নিনি দুই চোখ পাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল, ছি ছি, ও কি, কুচ্ছিৎ চেহারা! তোর নাকটি যেমন খাসা থ্যাব্ড়া, আর ওর নাকটা উঁচু, লম্বা! লোকটার গায়ে বড় বড় লোম পর্যন্ত নেই! গড়নও ছিপ্ছিপে, তোর মতন বুক ওর চওড়া নয়! মাথাতেও বেমানান, লম্বা! তুই কেমন বেঁটে সেঁটে!

টুঁটুঁ বলল, আমরা চলি হেলেদুলে, আর ওরা চলছে সিধে হয়ে গট্‌গট্ করে! আবার দেখ্, ওরা আমাদের মত চামড়ার কাপড় পরতে জানে না। ওরা কী দিয়ে কাপড় তৈরি করেছে, বল্ দেখি!

নিনি তাচ্ছিল্য-ভরে বলল, কে জানে! আরে ছ্যাঃ, ও-গুলো কি মানুষ, না টিক্‌টিকি? তুই একলা এক-এক চড়ে ওদের পাঁচ-সাতজনকে মেরে ফেলতে পারিস্!

— চুপ বউ, কথা কোস্ নে! লোকটা পাহাড়ের ওপরে উঠছে! দাঁড়া, ওকে একটু মজা দেখাই!

লোকটা চারিদিকে তাকাতে তাকাতে পাহাড়ের উপরে উঠছে ধীরে ধীরে, শিয়রে যে কত-বড় বিপদ ওঁৎ পেতে আছে, সেটা টেরও পেল না। টুঁটুঁ পাহাড়ের গা থেকে বেছে বেছে মস্ত একখানা পাথর তুলে নিল। তারপর বেশ টিপ্ করে পাথরখানা ছুঁড়ল।

লোকটা বেজায় জোরে আর্তনাদ করে একেবারে ঠিকরে সটান পড়ে গেল, তারপর পাহাড়ের চালু গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নিচের দিকে। তার চিৎকার শোনামাত্র নদীর ধার থেকে দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগল— সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো প্রকাণ্ড কুকুর!

নিনি গুহার পথে ছুটতে ছুটতে বলল, ও বর, পালিয়ে আয় রে!

কিন্তু তার কথা শোনবার আগেই টুঁটুঁ পালাতে শুরু করেছে!

বন-জঙ্গল ভেঙে, খানা-ডোবা ডিঙিয়ে, পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে টুঁটুঁ ও নিনি যখন গুহার কাছে গিয়ে পড়ল, হাঁহাঁ তখন সপরিবারে গুহার সামনে ভোজে বসেছে। ভোজ ত ভারি! কতকগুলো গাছের শিকড় ও বন্য কুকুরের আধ-পোড়া মাংস।

হাঁহাঁ কুকুরের একটা আস্ত ঠ্যাং তুলে নিয়ে, তার রাং-এ মস্ত কামড় মেরে খুব খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বলল, আরে আরে, জামাইটার সঙ্গে আমার বেটি অমন ছুটে আসছে কেন রে?

হুয়া বলল, তাইত কর্তা! তোর প্রতাপে দেশ ত এখন ঠাণ্ডা! তবু ওরা ভয় পেয়েছে কেন?

সত্য, আশ্চর্য হবার কথাই বটে! হাঁহাঁর খোকা-আগুনের গুণ দেখে কেবল যে গুহা-ভল্লুকেরা ও খাঁড়া-দেঁতোরাই সেখান থেকে পালিয়েছে, তা নয়; হুঁহুঁ-সর্দারের মত আরও কয়েকজন ছোট-বড় সর্দার ভক্তের মতন এসে তার দল খুব ভারি করে তুলেছে। সে-অঞ্চলে হাঁহাঁর শত্রু কেউ নেই, সকলেরই মুখে তার জয়ধ্বনি! সকলেই জানে এখন হাঁহাঁ-সর্দারের আশ্রয়ে থাকার মানেই হচ্ছে, পর্বতের আড়ালে থাকা। এদেশে তার মেয়ে-জামাইকে ভয় দেখাবে, এত-বড় বুকের পাটা কার? টুঁটুঁ কাছে এসেই বলল, ওরে শ্বশুর, নতুন মানুষ এসেছে!

হাঁহাঁ আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি জানিনা, আমার মুল্লুকে নতুন মানুষ এসেছে!

নিনি বলল, হ্যাঁ রে বাপ্। তারা জানোয়ারের পিঠে চড়ে নদীর জলে বেড়ায়, তাদের রং সাদা, গায়ে লোম নেই, নাক থ্যাঁদা নয়! হাড়-কুচ্ছিৎ!

টুঁটুঁ বলল, গতরেও তারা আমাদের আধখানা! আমাদের চেয়ে মাথায় তারা লম্বা হতে পারে, কিন্তু চওড়ায় তারা একদম বাজে! তুই ফুঁ দিলে তারা উড়ে যায় রে, সর্দার!

— ফুঁ দেব না রে, হুঁহুঁর বেটা, খোকা-আগুনকে লেলিয়ে দেব? আমার মুল্লুকে নতুন মানুষ! দলে তারা পুরু নাকি রে?

— হ্যাঁ, সর্দার!

— আমাদের চেয়েও?

— তা হবে না বোধ হয়।

— কোথায় তারা?

— কল্‌কল্‌-নদীর ধারে।

হাঁহাঁ একবার আকাশের দিকে তাকাল। চারিদিকে গোধূলির আলো জ্বলছে, পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসছে বাসার পানে।

টুটু বলল, কল্‌কল্‌-নদীর ধারে এখন যেতে-যেতেই আঁধার নামবে রে, বাপ্!'

হাঁহাঁ বলল, হ্যাঁ। আচ্ছা, আজকের রাতটা চুপচাপ থাকা যাক্, কি বলিস্ রে?

— সেই ভাল।

— তারপর কাল সকালে দলবল নিয়ে নতুন মানুষদের ঘাড় ভাঙতে যাব। বলেই হাঁহাঁ আবার কুকুরের আধ-পোড়া ঠ্যাংখানা হাতে তুলে নিল।

৯

হারা আলো

কল্‌কল্‌-নদীর অশ্রান্ত কল্লোলে সেখানে সঙ্গীতের অভাব হয় নি কোনদিন, এক মুহূর্তের জন্য।

কোকিল আছে, পাপিয়া আছে, ময়ূর আছে— আরও কত রং-বেরঙের পাখি আছে, সকলের নাম কে করে? চুটকি সুর শোনাবার জন্য আছে ভোমর, আছে মৌমাছি। তারা সবাই হচ্ছে বনভূমির বাঁধা গাইয়ে। মাইনে পায় যত খুশি পাকা ফল, ফুলের মৌ!

অরসিক পাখিগুলোও ছিল তখন। কাক, চিল, চড়াই, প্যাঁচা। কা-কা-কা-কা, চিঁহি-চিঁহি, কিচির-মিচির, চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে তারা ভাবে, জবর ওস্তাদি গান গাইছি।

মর্মরিত বনভূমি রাগ করে বলে মর্ মর্, কিন্তু অরসিকরা মরতে কিম্বা চুপ করতে রাজি নয়। তারা আজও মরে নি বা চুপ করে নি। অসাধারণ ধৈর্য। এই সঙ্গীতের সুরে-বেসুরে মুখরিত নদীর ধারে একটা উঁচু জমির উপরে নতুন মানুষদের তাঁবু পড়েছে সারে সারে।

হাঁহাঁদের সঙ্গে এদের চেহারার কত তফাৎ। হাঁহাঁদের কপাল, নাক, চিবুক, গলা এবং চলন ছিল বন-মানুষের মত, কিন্তু এদের দেখলে

তোমরা মনে করতে, হ্যাঁ, এরা আমাদেরই জাত বটে। এই নতুন মানুষদের বংশধররা আজও ভারতের নানা স্থানে বাস করে বলে বিশ্বাস হয়! হয়ত অন্য জাতির সঙ্গে মিশে এরাই পরে দক্ষিণ-ভারতের বিখ্যাত দ্রাবিড়ী সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় যে পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার রাজ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সঙ্গেও নতুন মানুষদের সম্পর্ক ছিল, এমন অনুমানও করা যেতে পারে!

ইতিহাস বলে, আর্যরা যখন মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন উত্তর-ভারতে যারা বাস করত, তাদের সঙ্গে তারা অনেক-কাল ধরে যুদ্ধ করেছিল।

তারা কারা? আমরা যাদের কথা এখন বলছি তারাই যে বিদেশী আর্যদের কবল থেকে স্বদেশকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, এমন অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। বহু যুগব্যাপী সেই যুদ্ধে বার বার হেরে তারা ক্রমশ বিন্ধ্যাচল পার হয়ে ভারতের দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করে। আর্যরা তাদের নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামান নি এবং মাঝে মাঝে মাথা ঘামিয়েও আর তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন নি। এমন-কি মুসলমান-প্রভাব স্বীকার করে সমগ্র আর্যাবর্তের আর্যরা যখন ম্রিয়মান, দক্ষিণ ভারত তখন এবং তারপরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বাধীনতা রেখেছিল অক্ষুণ্ণ।

আর্যরা তাদের 'অমানুষ' বলতেন না বটে, কিন্তু তারা আর্য-জাতীয় নয় বলে ঘৃণাভরে তাদের 'অনার্য' নামে ডাকতেন। 'অনার্য' বলতে অসভ্য বোঝায় না। কারণ তারাই জ্বেলেছিল ভারতবর্ষের প্রথম সভ্যতার প্রদীপ। আর্যরা যখন প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন সেই সভ্যতার প্রদীপ-শিখা বড় অল্প-উজ্জ্বল ছিল না।

আর্যদের মত এই নতুন মানুষরাও বাইরে থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। পৃথিবী তখন আজকের মত জনবহুল ছিল না, তার অধিকাংশই ছিল নির্জন। কোথাও যখন খাবারের অভাব হত বা অধিকতর পরাক্রান্ত জাতির কাছে আর এক জাতি পরাজিত হত, তখন এক দেশের লোক চলে যেত দলে দলে অন্য দেশে।

এইরকম সব কারণে একদল নতুন (বা 'ক্রো-ম্যাগ্নন্' জাতীয়) মানুষ য়ুরোপে প্রবেশ করে। কারুর মতে— তারা এসেছিল উত্তর-আফ্রিকা থেকে। কেউ বলে— এশিয়া থেকে। তারপর সেখানে হাঁহাঁদের জাত-ভাইদের হারিয়ে আস্তানা স্থাপন করে। এবং মেসোপটেমিয়া বা পারস্য অঞ্চল বা অন্য কোথাও থেকে আর একদল ঢোকে ভারতবর্ষে। হাঁহাঁদের জাতের চেয়ে সভ্যতায় ও চেহারায় তারা ছিল অনেক উন্নত। পণ্ডিতরা তাদের পৃথিবীর প্রথম সত্যকার মানুষ বলেন এবং তারাও হাঁহাঁদের জাতকে মানুষের জাত বলে মনে করত না। অনেকের মত হচ্ছে, পৃথিবীর সব দেশেরই পুরোনো রূপকথার যে-সব ভীষণদর্শন রাক্ষস-খোক্কসের বর্ণনা পাওয়া যায়, হাঁহাঁদের জাতের মানুষ থেকেই তাদের উৎপত্তি। কিন্তু এখন আর ঐ জাতের কোন মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে নেই। প্রাচীন মিশরী ও ইতালীর আদিম বাসিন্দা ইত্রাস্কান প্রভৃতি জাতিদের মত তারাও লুপ্ত হয়ে গেছে। সম্ভবত এ-কালের কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে খুঁজলে তাদের রক্ত পাওয়া যাবে।

আর্যদেরও নানা দল পরে নানা কারণে মধ্য-এশিয়া ছাড়তে বাধ্য হয়। একদল আসে ভারতবর্ষে, আর একদল যায় পারস্যে, আর একদল ঢোকে য়ুরোপে। এই তিন দেশেই তখন প্রথম সত্যকার মানুষরা বাস করত। তিন দেশেই যুদ্ধে তারা আর্যদের কাছে হেরে যায়। হেরে কতক এদিকে-ওদিকে সরে পড়ে এবং কতক মিলে-মিশে যায় আর্যদেরই সঙ্গে। য়ুরোপে যেমন আর্যদের সঙ্গে মিশেছে অনার্যদের রক্ত, ভারতেও তেমনি মারাঠি, বাঙালি, বিহারি ও যুক্ত প্রদেশের হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে অনার্য রক্ত আছে।

গল্প শুনতে শুনতে এ-সব কথা হয়ত তোমাদের শুক্‌নো বলে মনে হচ্ছে! বেশ তবে গল্পই শোনো।

বলছিলাম কি, কল্‌কল্‌-নদীর ধারে একটা উঁচু জমির উপরে পড়েছে নতুন মানুষদের তাঁবু। তাঁবুগুলো জানোয়ারদের শুক্‌নো চামড়া শেলাই করে তৈরি।

কিন্তু হাঁহাঁদের মত তারাও চামড়া পরে না। তারা পরে গাছের ছালে তৈরি পোশাক— ভারতে যা বলক বা বাক্‌ক নামে বিখ্যাত।

নিনির মত শুনেছ ত? তারা নাকি ফর্সা! হ্যাঁ তারা নিনিদের চেয়ে ফর্সা নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের বর্ণ গৌর বলা যায় না। আর্যদের চোখে তারা কালোই ছিল। যেমন কাফ্রিদের চোখে আমরা ফর্সা হলেও সাহেবদের চোখে কালো।

নতুন মানুষদের অনেকগুলো দল উত্তর-ভারতের নানা দিকে গিয়েছে। একটা দল এসেছে এইখানে। ছেলে-বুড়ো মেয়ে বাদ দিলেও দলে দলে সক্ষম যোদ্ধা আছে তিনশোর কম নয়!

সেদিন সকালে আলোর সঙ্গে পাখিরা জেগে উঠেই দেখল, নতুন মানুষদের দলে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে। তাঁবুতে বসে মেয়েরা জিনিস-পত্তর গুছিয়ে রাখছে, কেউ শিকারে মারা জানোয়ারের রোমশ ছালে তৈরি বিছানা তুলে নিয়ে রোদে শুকোতে দিচ্ছে, কেউ নদী থেকে মাটির কলসী ভরে জল নিয়ে আসছে, কেউ মাটির বাসন-কোসন মাজছে, কেউ উনান ধরাচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও তখন কোন ধাতু আবিষ্কৃত হয় নি, মাটির বাসনই ছিল অতি-বড় সভ্যের ব্যবহার্য। দলের সর্দার ও হোম্‌রা চোম্‌রারা বড়-জোর পাথরের ঘটি-বাটি-থালা ব্যবহার করে বিলাসিতার পরিচয় দিতে পারতেন।

এ-দলের সর্দারের নাম সূর্য। দলের মধ্যে সব-চেয়ে তেজী, বলী ও বুদ্ধিমান বলেই তিনি সর্দারির পদ পেয়েছেন। সে-যুগে সর্দারের ছেলে বা ভাই হলেই কেউ সর্দারি পেত না। দলের লোকরা যাকে যোগ্য ও বুদ্ধিমান মনে করত, সর্দারি দিত তাকেই।

সূর্য-সর্দারের দুই ছেলে— অগ্নি ও বায়ু! এক মেয়ে, নাম আলো।

প্রথম যুগের মানুষরা সকলেই ছিল প্রকৃতির ভক্ত। সূর্য-চন্দ্রের উদায়াস্ত লীলা, ঝঞ্ঝা-পবনের বিরাট শক্তি। মহাসাগরের নৃত্যশীল অসীম উচ্ছ্বাস, অনাহত আকাশের অনন্ত নীলিমা প্রভৃতি দেখে তাদের মন হত বিস্মিত, অভিভূত। ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষরা

প্রাকৃতিক প্রত্যেক বিশেষত্বের এক-একটা নাম রাখল এবং সেই সব নামেই নিজেদেরও ডাকতে শুরু করল। এ-প্রথা আজও চলিত আছে।

সূর্য-সর্দার বলছিলেন, ওরে অগ্নি, নতুন দেশে এসেছি, কোথায় কি পাওয়া যায়, জানিনা ত! খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?

অগ্নির বয়স বছর চব্বিশ, বায়ুর চেয়ে তিন বছরের বড় সে। ছিপ্‌ছিপে অথচ বলিষ্ঠ দেহ, তার চোখ, হাত, পা সর্বক্ষণই চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে! সে বলল, কেন বাবা, কাল আসতে আসতে বনে তো অনেক হরিণ দেখেছি! বায়ুকে নিয়ে আমি শিকারে চললাম।

— কিন্তু শিকার যদি-না পাস্?

শিকার না পাওয়া তখন বড় ভাবনার বিষয় ছিল। কারণ মানুষ তখনও চাষ করতে শেখেনি। ভাত, ডাল, রুটি প্রভৃতি নিয়ে উদর পূরণ করবার উপায় ছিল না। শাক-সব্‌জির ব্যবহারও ছিল না। বড়-জোর বনে কোন কোন রকম ফল-মূল পাওয়া যেত। কিন্তু মাংসই ছিল প্রায় একমাত্র আহার্য।

এমন সময়ে এক কোণ থেকে কোঁকড়ান চুল দুলিয়ে আলো ছুটে এল। বয়স ষোল। দাদা অগ্নির মতই চঞ্চল। মুখে-চোখে উছ্‌লে উঠছে কৌতুক-হাসি। এসেই বলল, বাবা, বাবা! দাদা বনে হরিণ দেখেছে, আর আমি দেখেছি ঐ নদীতে বড় বড় মাছ!

সূর্য-সর্দার সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, ভাল খবর দিলি। চল, তোকে নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যাই। আমার আজ শিকারে যাবার বা এখান থেকে নড়বার উপায় নেই— নতুন জায়গায় এসেছি, সবাই কথায় কথায় পরামর্শ করতে আর উপদেশ নিতে আসছে!···বায়ু, নিয়ে আয় ত, আমার হাত-সুতো!

বায়ু এনে দিল। তখনও ছিপের বা জালের আবিষ্কার হয় নি, বেশি-সভ্য মানুষরা চামড়ার যন্ত্র দিয়ে তৈরি হাত-সুতোয় পাথর বা হাড় দিয়ে প্রস্তুত বঁড়শি পরিয়ে মাছ ধরত। কিন্তু মাছ ধরবার এ-কৌশলও তখন হাঁহাঁ-হুঁহুঁদের জগতে ছিল স্বপ্নেরও অগোচর।

বাবার সঙ্গে প্রায় নাচতে নাচতে আলো বেরিয়ে গেল তাঁবুর ভিতর থেকে।

অগ্নি তখন নিজের এবং ভাইয়ের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র বার করছে। চক্‌মকি পাথরের কুঠার, ছুরি, বর্শা। আরও দু'টি অস্ত্র বার করল— সে-যুগের যা অশ্রুতপূর্ব মহা-আবিষ্কার! ধনুক! বাঁশের ধনুক, কঞ্চির বাণ। বাণের ফলা পাথরের। তখনও তূণ গড়তে কেউ শেখেনি, তাই বাণগুলোকে গোছা করে দড়িতে বেঁধে দেহের পাশে ঝুলিয়ে রাখত।

অগ্নি ব্যবহার করতে শিখে জীব-রাজ্যে মানুষ প্রথমে হয়েছিল সব-চেয়ে বেশি শক্তিধর। তার পরের প্রধান আবিষ্কাররূপে ধনুক-বাণের নাম করলে ভুল হবে না। শিকারী মানুষদের পক্ষে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আদিম পৃথিবীতে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। কেবল আদিম পৃথিবীতে কেন, মধ্য যুগের সভ্য পৃথিবীও যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুক-বাণকেই মনে করত সব চেয়ে বড় অস্ত্র। আধুনিক যুগেও যে-সব পশ্চাৎপদ জাতি বনে-জঙ্গলে বসতি বাঁধে, ধনুক-বাণই হচ্ছে তাদের আত্মরক্ষার ও শিকার সংগ্রহের প্রথম উপায়। এই সেদিনও তিব্বতীরা ধনুক-বাণ নিয়ে পাল্লা দিতে চেয়েছিল ইংরেজদের বন্দুকের সঙ্গে। একশো বছর আগে জাপানীরাও ব্যবহার করত ধনুক ও বাণ।

অগ্নি ও বায়ু তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখল, দলের অন্যান্য লোকেরা এখান-ওখানে নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ পাথরের ছেনি মুগুর দিয়ে চক্‌মকি কেটে অস্ত্র তৈরি করছে, কেউ ভোঁতা অস্ত্র ঘসে ঘসে ধারাল করছে, কেউ ফলগাছে উঠে ফললাভের চেষ্টায় নিযুক্ত হয়ে আছে।

অগ্নি চেঁচিয়ে বলল, আমার সঙ্গে কে শিকারে যাবে, এস।

জন-ছয়েক লোক তাদের সঙ্গী হল। গোটাচারেক কুকুরও পিছু নিল। বায়ু বলল, বাঃ, আর কেউ যে এল না! ওরা কি আজ উপোস করবে?

উত্তরে একজন বলল, হুঁঃ, ওরা উপোস করার পাত্রই!

— তবে? ওরা কি হাওয়া খেয়েই উপবাস ভঙ্গ করবে?

— ক'দিন হেঁটে হেঁটে ওরা ভারি শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এখানকার নদীতে অনেক মাছ আর গাছে অনেক পাখি দেখে ওরা স্থির করেছে, আজ বনে-জঙ্গলে না ঢুকে মারবে গাছের পাখি, ধরবে নদীর মাছ।

অগ্নি বলল, আমাদের দল বড় অল্পেই কাবু হয়ে পড়তে শুরু করেছে। পনেরো দিনে একশো ক্রোশ পথ হেঁটে যাদের পায়ে ব্যথা হয়, তাদের আমি পুরুষ বলে গণ্য করি না।

এমনি সব কথা কইতে কইতে আটজন শিকারী প্রথমে অনিবিড় জঙ্গল ও তারপর গভীর অরণ্যের ভেতর গিয়ে পড়ল। সে-জঙ্গল এমনি নিরেট, স্তব্ধ ও স্থির যে, তার বহু স্থানেই যেন বায়ু চলাচল পর্যন্ত নেই! পাখিরা পর্যন্ত সে-সব জায়গায় ঢুকতে বোধ হয় ভয় পায়, কারণ গান না গেয়ে যারা থাকতে পারে না, সেখানে তারা একেবারেই নীরব। মাঝে পথ ও একটু-আধটু খোলা জমি, বাকি সর্বত্রই মস্ত মস্ত গাছ—পরস্পরকে জড়াজড়ি করে লতাগুল্মে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের তলায় অন্ধকারের সঙ্গে যেন সন্ধ্যার ম্লান আলো আলাপ করছে মৌন ভাষায়। চারিদিকেই কী যেন একটা বুক-চাপা ভয় দম বন্ধ করে বসে আছে, চারিদিকেই কারা যেন অদৃশ্য পা ফেলে জীবনকে হত্যা করবার পরামর্শ করছে নির্বাক মুখে, অজানা ইঙ্গিতে!

পাছে কোন পশু মানুষের পায়ের শব্দ শুনে সাবধান হয়ে পালিয়ে যায়, সেই ভয়ে শিকারীরা পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। নতুন মানুষরা প্রথম সভ্যতার আস্বাদ পেলেও তখনও তারা বন্য প্রকৃতির আদিম সন্তান। তারা যেমন নিঃশব্দে অরণ্যের সঙ্গে মিশিয়ে থাকতে পারত, এ-কালের কোন অর্ধ-সভ্য মানুষও তা পারে না।

এমন সময়ে এক কাণ্ড হল। কথাটা খুলেই বলি। তোমরা সেই গুহাবাসী ভল্লুক ও ভল্লুকীকে নিশ্চয়ই ভোলো নি। তারা পুরোনো বাসা ছেড়ে এই অরণ্যেরই নিকটবর্তী এক গিরি-গুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ভেবেছিল, মানুষের মুখ আর দেখবে না। অপয়া মুখ!

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভল্লুকী জানাল যে, মৌচাকের সন্ধানে

সে বনের ভিতরে একবার টহল মেরে আসতে চায়। ভল্লুকও মত প্রকাশ করল, এ-প্রস্তাব মন্দ নয়। সেও যাবে।

দু'জনেই ঊর্ধ্বমুখে এগিয়ে আসতে আসতে দেখছিল, কোন্ গাছের ডালে আছে মৌমাছিদের বাসা!

হঠাৎ একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে প্রথমে বেরিয়েই ভল্লুক চম্‌কে ও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল! হাত বিশ তফাতেই ক'জন মানুষ!

মানুষরাও তাকে দেখেছিল, তারাও বড় কম চম্‌কে উঠল না। জঙ্গলের ভিতর থেকে ভল্লুক-জায়ার আওয়াজ এল— ঘুক্ ঘুক্? অর্থাৎ ব্যাপার কি?

দারুণ ঘৃণায় ও ক্রোধে ভল্লুক বলল, ঘোৎ ঘোৎ, ঘোঁৎউম্, ঘোঁৎউম্!— অর্থাৎ দু'চোখের বালি গিন্নি, মানুষ— মানুষ!

গিন্নি বলল, ঘোঁৎকু, ঘোঁৎকু— অর্থাৎ 'বল কি, বল কি' বলতে বলতে সেই ঝোপ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে অগ্নি বলল, হুঁশিয়ার! চট্‌পট্ সব ধনুকে বাণ লাগাও!

সকলেই চোখের নিমিষে ধনুকে জুড়ল বাণ!

কিন্তু ভল্লুক ভয় পেলনা, ভল্লুকীও নয়। কারণ তারা এরই মধ্যে চট করে দেখে নিয়েছিল যে, এই ধড়িবাজ মানুষগুলোর হাতে সেই দাউ-দাউ জ্বল্-জ্বল্-করা ভয়ানক জিনিসগুলো নেই।

উঁচু হয়ে, হেঁট হয়ে, ঘাড় কাৎ করে, একটু এপাশে একটু ওপাশে গিয়ে ধনুক বাণগুলো ভাল করে দেখে নিয়ে ভল্লুক বলল, গিন্নি, হেসেই মরি। এই মানুষগুলো গোটাকয় কাঠি নিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে এসেছে!

ভল্লুকী বলল, কর্তা, মধু নয়, অনেকদিন পরে আজ আবার মানুষ খাব। চল, ওদের ঘাড় ভাঙি। ভল্লুক ও ভল্লুকী তেড়ে এল।

অগ্নি বলল, ছাড়ো বাণ!

বন্-বন্ করে এক ঝাঁক তীর ছুটে এল। পাথরের তীর হলেও ঘষে ঘষে তাদের ফলাগুলো এমন সুচালো করে তোলা হয়েছে যে,

গণ্ডার ছাড়া আর সব জীবেরই চামড়া ভেদ করতে পারে অনায়াসেই। ভল্লুকের পিঠের উপরে ও সামনের ডান পায়ের উপরে এসে বিঁধল দুটো বাণ। ভল্লুকীর বিশেষ কিছু হল না বটে, কিন্তু একটা বাণে তার এক কান হয়ে গেল এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়!

ভল্লুক গাঁক্-গাঁক্ করে চেঁচিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বলল, পালাও গিন্নি, পালাও! আমি পালালুম!

ভল্লুকী কর্তার উপদেশ শোনবার জন্য অপেক্ষা করে নি, আগেই অদৃশ্য হয়েছে।

বন পেরিয়ে, পাহাড়ে উঠে, গুহায় ঢুকে জিভ বার করে শুয়ে পড়ে ভল্লুক দেখল, ভল্লুকী আগেই সেখানে হাজির হয়ে ফোঁড়া কানটা ক্রমাগত নাড়ছে! ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে ভল্লুক বলল, কী দেখলুম! কাঠি ছুঁড়ে কাবু করল!

ভল্লুকী ছটফট করতে করতে বলল, জ্বলে মরি গো, জ্বলে মরি! এ-কানে শুনতে পাব না!

ভল্লুক বলল, এ-বনও ছাড়তে হল, গিন্নি। চল, আমরা হিমালয়ে গিয়ে উঠি, মানুষ যেখানে যাবে না।

ভল্লুকী বলল, তাই ভাল, কর্তা! মানুষগুলো কাপুরুষ। তারা আমাদের কাছে আসে না। দূর থেকে কী সব ছোঁড়ে, কিচ্ছু মানে না। ওদের দেখলে ঘেন্না হয়। ওদের কাছে থাকা অসম্ভব।

তারা তখন হিমালয়ে প্রস্থান করল। আজও তাদের বংশধররা হিমালয়ে বাস করছে।

...ওদিকে সূর্য-সর্দার কল্‌কল্-নদীর ধারে বসে মাছ ধরছেন। এরই মধ্যে মস্ত-একটা মহাশের মাছ ধরে আবার তিনি জলে হাত-সুতো ফেলেছেন।

মাছ ধরতে ধরতে মাঝে মাঝে তিনি মুখ তুলে দেখছেন, নদীর ওপারে অনেক দূরে নীলাকাশের তলায় সাদা নিরেট মেঘের মত স্থির হয়ে আছে চির-তুষারের চাদর গায়ে দিয়ে মহাগিরি হিমালয়।

তার পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে অগণ্য শিখর-কণ্টকিত বহুদূরব্যাপী ধূসর পর্বত সাম্রাজ্য। তারও নিচে রয়েছে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে সীমাহীন নীল-অরণ্যের দেশ। বন যেখানে আরও কাছে নদীর ওপারের দিকে এগিয়ে এসেছে, সেখানে তার রং হয়ে উঠেছে গাঢ়-শ্যামল থেকে ক্রমেই কচি-সবুজ। বানর আগেই এবং নদীর বালুরেখার পরেই দেখা যাচ্ছে দুর্বাঘাসে-মোড়া প্রান্তর, তার বুকে চরছে হরিণ ও বন্য মহিষের দল। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ম্যামথ-হাতিরা দল বেঁধে নদীর ধারে আসছে জলপান করবার জন্য। তাদের আগা-বাঁকান লম্বা লম্বা দাঁতগুলোর উপরে জ্বলে জ্বলে উঠছে সূর্যকর।

সূর্য-সর্দার নিজের মনেই বললেন, থাকবার জন্যে খুব ভাল জায়গাই নির্বাচন করা হয়েছে। এখানে জলাভাব হবে না, নদীতে আছে মাছ, গাছে আছে ফল আর পাখি, বনে আছে অগুন্তি শিকারের পশু! দীর্ঘকালের জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

আলো খানিকক্ষণ নদীর ধারে বসে বালি দিয়ে ছোট একটা কিম্ভূত-কিমাকার জন্তুর মূর্তি গড়বার চেষ্টা করল। তারপর কিছুক্ষণ ধরে একটা মুখর কোকিলের ডাক নকল করতে লাগল। তারপর সুন্দর একটি প্রজাপতি দেখে ছুটল তারই পিছনে পিছনে। প্রজাপতিও ধরা দেবে না, সেও ছাড়বে না। ছুটতে ছুটতে সেই পাহাড়ের কাছে গিয়ে পড়ল, যার উপরে ফুলগাছ দেখে নিনি কাল আবদার ধরেছিল।

সূর্য-সর্দারের হাত-সুতোয় তখন আর একটা মাছ টান মেরেছে, তিনি সুতো গুটিয়ে তাকে ডাঙায় আনতেই ব্যস্ত।

আচম্বিতে দূর থেকে আলোর ভীত ও আর্তস্বর জাগল, বাবা, বাবা! রাক্ষস, রাক্ষস!

সচমকে ফিরে দেখেই সূর্য-সর্দারের চক্ষুস্থির! বিকটদর্শন বিপুলবপু এক ভয়াবহ মূর্তির কবলে পড়ে আলো ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে প্রাণপণে এবং পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে সেই রকম দেখতে আরও পাঁচ-পাঁচটা মূর্তি। তারা সকলে হচ্ছে হাঁহাঁ, হুঁহুঁ, চুঁচুঁ, টুটু, ঘটু।

প্রথমটা সূর্য-সর্দার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! এইমাত্র তিনি ভাবছিলেন— এখানে এসে নিশ্চিন্ত হবেন, তাহলে এখানেও রাক্ষসের দল আছে? অবশ্য এরা তাঁর অপরিচিত নয়, কারণ যে-দেশ থেকে নতুন মানুষরা এসেছে, সেখানেও এই রকম রাক্ষসরা তাদের উপরে অত্যাচার করে! এরা মানুষদের মেয়ে ধরে নিয়ে যায় এবং পুরুষদের নিয়ে গিয়ে মেরে মাংস খায়। তাহলে কাল তাঁর দলের একজন লোককে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল এরাই?

আলো কাতর স্বরে আবার ডাকল, বাবা, বাবা, বাবা—!

কী বিপদ! তিনি যে নির্বোধের মত কোন অস্ত্র না নিয়েই মাছ ধরতে এসেছেন! তবু শুধু হাতেই মেয়ের দিকে ছুটলেন।

ওদিকে দলের অন্যান্যরাও আলোর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল! চারিদিক থেকে হৈ হৈ রব তুলে তারাও ছুটে আসতে লাগল।

কিন্তু কেউ কাছে আসবার আগেই রাক্ষসরা আলোকে নিয়ে পাহাড় আর জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য-সর্দার দলবল নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠলেন। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। আলোর কান্নাও আর শোনা যায় না।

সূর্য-সর্দার পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠে বললেন, ওরে, আলো যে মা-মরা মেয়ে! আমিই যে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি! খোঁজ্, খোঁজ্, চারিদিকে খোঁজ্, সারা পৃথিবী খোঁজ্! রাক্ষসদের হত্যা কর্! আলোকে আমার কোলে ফিরিয়ে আন্!

আলোর খোঁজে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দলে দলে নতুন মানুষ।

সূর্য-সর্দার ভূমিতলে জানু পেতে বসে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সাশ্রুনেত্রে বললেন, সৃষ্টির প্রথম দেবতা, হে সূর্যদেব! অন্ধকার পৃথিবীতে আলো আনাই তোমার একমাত্র কর্তব্য। আমার অন্ধকার মনে আমার হারা-আলো আবার ফিরিয়ে আনো প্রভু! হে সূর্যদেব!

হাঁহাঁর বিপুল স্কন্ধের উপরে আলোর অজ্ঞান দেহ। তার পিছনে পিছনে আসছে হুঁহুঁ, টুঁটুঁ, টুটু ও ঘটু।

প্রথম অনেকখানি পথ তারা দ্রুতবেগে ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হয়ে এল। এখানকার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সমস্ত পথই তাদের নখদর্পণে এবং কোন্ পথ দিয়ে সরে পড়লে এ-প্রদেশে নব-আগন্তুক অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেওয়া সহজ হবে, এ-কথা তারা ভাল রকমই জানত।

কখনও নিবিড় জঙ্গলের মধ্যবর্তী ঘুটঘুটে শুঁড়ীপথ দিয়ে, কখনও দুই পাহাড়ের মাঝখানকার খাদ লাফ মেরে পার হয়ে এবং কাঁটা তাদের রোমশ দেহের বিশেষ ক্ষতি করতে পারত না বলে কণ্টকবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে তারা অবশেষে এসে পড়ল নিজেদের গুহার অনতিদূরে এক সবুজ-রং-মাখান উপত্যকায়।

তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁহাঁ কথা কইবার ফাঁক পেল। হুঁহুঁকে ডেকে বলল, হ্যাঁরে, ও লোকগুলো কোন্ মুল্লুক থেকে এল, জানিস্?

হুঁহুঁ বলল, উহুঁ! ও-গুলো কি মানুষ, না ক্ষুদে পোকার বাচ্চা!

— হ্যাঁ, আমাদের এক এক চড়ে ওদের মাথা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে! ওরা দলে ভারি না হলে আমরা কখনই পালাতুম না।

— কিন্তু ওদের মাংস ভারি নরম বলেই মনে হল!

— যা বলেছিস্, ওদের দেখে আমার জিভে জল আস্‌ছিল রে!

টুঁটুঁ বলল, চল্‌না রে শ্বশুর, আমরাও একদিন দল বেঁধে গিয়ে ওদের সব-ক'টাকে ধরে নিয়ে আসি!

হাঁহাঁ সায় দিয়ে বলল, তাই যাব একদিন। অমন কচি মাংস হাত-ছাড়া করা হবে না।

হুঁহুঁ বলল, কিন্তু ওদের গায়ে জোর কম হলেও হাতে অস্তর আছে, এটা ভুলিস্ না রে, সর্দার!

হাঁহাঁ বড়াই করে বলল, আমার কাছেও খোকা-আগুন আছে, এটা ভুলিস্ না রে, হুঁহুঁ!

টুটু বলল, যাতে ভল্লুক পালায়—

ঘটু বলল, আর খাঁড়া-দেঁতো মরে!

হাঁহাঁ বলল, ঐ আগুনে পুড়িয়ে আমি ওদের মাংস খাব।

হুঁহুঁ বলল, হয়ত ওরাও অন্য কোন ফুসমন্তর জানে। নইলে এখানে আসতে সাহস করে?

টুঁটুঁ বাপের কথায় সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁরে শ্বশুর, আমি নিজের চোখে ওদের তিনটে ফুসমন্তর দেখেছি।

— কি কি, শুনি।

— কাল দেখেছি, ওরা অনেকগুলো হাতওয়ালা জানোয়ারের পিঠে চড়ে জলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে!

নতুন মানুষরা এসেছিল নৌকা ভাসিয়ে, দাঁড় ফেলে! এ-মুল্লুকে নৌকা কেউ দেখেনি, তাই টুঁটুঁ সেই দাঁড়সুদ্ধ নৌকাগুলোকেই হাতওয়ালা জানোয়ার বলে মনে করেছে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি কেটে, তাদের মাঝখানকার অংশ বার করে ফেলে নতুন মানুষরা সেকেলে নৌকা তৈরি করত। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে এখনও এই উপায়েই কোন কোন শ্রেণীর নৌকা প্রস্তুত করা হয়।

হাঁহাঁ বলল, তুই আর কি দেখেছিস্ রে, জামাই?

— আজ দেখলুম, ওদের তিন-চারজন কল্‌কল্‌-নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেসে ওপারে গিয়ে উঠল।

বানরদের মত হাঁহাঁদের জাতের মানুষরাও নদীকে বড় ভয় করত, কারণ তারা সাঁতার কাটতে জানত না, বানর ও মানুষ জাতীয় কোন জীবই অন্যান্য অধিকাংশ পশুর মত সাঁতার কাটবার শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে না। সাঁতার তাদের শিখতে হয়।

নতুন মানুষরা মাথা খাটিয়ে সাঁতার কাটবার কায়দা আবিষ্কার করেছিল।

এইবারে হাঁহাঁ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বলল, অ্যাঁ বলিস্ কি রে? মানুষ জলে চলে! বলিস্ কি রে?

টুঁটুঁ বলল, জলে গেলে তোর খোকা-আগুনও তো মরে যায়! ওরা জলে ঝাঁপ খেলে কি করবি তুই?

— ওদের ঝাঁপ খেতে দেব কেন রে বোকা? সে কথা যাক্, আর কি দেখেছিস্ তুই?

— ওরা কি-একটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দেয়, আর জলের মাছ ওঠে ডাঙায়। খাবারের ভাবনা নেই রে!

হুঁহুঁ সভয়ে বলল, কে জানে, ওদের আর কত ফুসমন্তর আছে? ওরাও যে আগুন-মন্তর জানে না, তাই বা কে বলতে পারে!

আসলে নতুন মানুষরা আগুনকে আরও বেশি বশ করতে পেরেছিল। তারা কেবল অগ্নি-কুণ্ডেই আগুন রাখত না, অন্ধকার দূর করবার জন্য প্রদীপ তৈরি করে তার গর্ভে চর্বি ও সলিতা রেখে আলো জ্বালাতে পারত এবং মশালের ব্যবহারও তাদের অজানা ছিল না।

কিন্তু টুঁটুঁর এ-সব দেখবার সুযোগ হয় নি। কাজেই বলল, ইস্, আগুন-মন্তর জানবে ঐ মানুষ-পোকাগুলো? আরে ছ্যাঃ, অসম্ভব!

এমন সময়ে আলোর জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমটা সে কিছুই মনে করতে পারে নি। তারপর অনুভব করল, তার সর্বাঙ্গে রাশি রাশি কর্কশ লোমের মত কী ফুটছে! তার নাকেও লাগল কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ, আলিপুরের পশুশালায় গেলে এখন আমরা যে-রকম দুর্গন্ধ পেয়ে নাকে কাপড়-চাপা দিই।— তখন তার সব মনে পড়ল। নিজের অবস্থা বুঝেই আবার সে চেঁচিয়ে কাঁদতে ও হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করে দিল।

হাঁহাঁ তাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে গর্জে উঠতেই ভয়ে তার চিৎকার ও হাত-পা ছোঁড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল!

সবাই তখন হাঁহাঁদের গুহার সামনে এসে পড়েছে।

ছেলে-মেয়ে নিয়ে হুয়া গুহা-পথের মুখে দাঁড়িয়েছিল। অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখল, তার স্বামীর বাহুতে ঝুলছে এক অদ্ভুত মেয়ে-দেহ! তার মাথায় এক মাথা ঢেউ খেলানো রেশমি চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের দু'পাশ দিয়ে। দেহে বল্কলের বস্ত্র ; তার রং কালো নয়, নাক থ্যাবড়া নয়, গলা খাটো নয় ; তার মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত নেই, গায়ে লম্বা লম্বা লোম নেই, আঙুলে বড় বড় ধারাল নখ নেই! ওমা, এ আবার কেমন মেয়ে!

হুঁহুঁ আর ঢুঁঢুঁ গুহার বাইরে এক জায়গায় থেব্ড়ি খেয়ে বসে পড়ল, কারণ ভিতরে যে তাদের প্রবেশ নিষেধ, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে।

হাঁহাঁ গম্ভীর বদনে গুহার ভিতর প্রবেশ করল, কৌতূহলী হুয়াও চলল পিছনে পিছনে।

হাঁহাঁ ভিতরে গিয়ে আগে আলোকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল। একে বাপের কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে, তার উপরে যারা তাকে কেড়ে এনেছে, তাদের সে মানুষ বলেও ভাবতে পারছে না, তার চোখে এরা রাক্ষস ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এরা যে তাকে কুচি কুচি করে কেটে খেয়ে ফেলবে, এই ভেবেই সে প্রায় মর-মর হয়ে পড়েছে। কাজেই আলো দু'পায়ে ভর দিয়ে আর মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, ধপাস্ করে বসে পড়ে নতমুখে অশ্রুপাত করতে লাগল, নীরবে।

হাঁহাঁ বলল, হুয়া, দেখিস্ এ যেন না পালায়!

হুয়া বলল, কোথাকার একটা ছুঁড়িকে ধরে আন্‌লি রে?

— যেখানকারই হোক্, কিন্তু এটা যেন পালাতে না পারে!

— কেন, তুই একে নিয়ে করবি কি? মেরে খাবি?

— না।

— তবে? সংসারে আবার একটা পেট বাড়াবি কেন?

— সে কথা এখুনি নাই বা শুনলি ?

— না, আমি শুনবই।

— আমি একে বিয়ে করব।

হাঁহাঁদের মুল্লুকে পুরুষেরা দুটো কেন, সময়ে সময়ে পাঁচটা-দশটাও বিয়ে করত। খালি হাঁহাঁদের মুল্লুক কেন, সে-সময়ে পৃথিবীর সব দেশেই পুরুষেরা মোটে একটা বউ নিয়ে খুশি হতে পারত না। এ-প্রথা আজও পৃথিবীর বহু দেশেই— এমন কি বাংলাদেশেও আছে। খালি সেকেলে পুরুষ নয়, সেকালের মেয়েরাও সময়ে সময়ে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করত। দেখনা, পরে ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠেছে, তখনও দ্রৌপদীর ছিল একটি-দু'টি নয়, পাঁচ-পাঁচটি বর!

কিন্তু কোন যুগেই কোন স্বামী যেমন চাইত না যে, তার বউ একসঙ্গে অনেকগুলো বিয়ে করুক, তেমনি সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে শুনলে, কোন স্ত্রীও কোনদিনই খুশি হতে পারে নি। হুয়াও খুশি হল না তাই।

আলোর দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করে হুয়া বলল, এই এক ফোঁটা মেয়েকে তুই বউ করতে চাস্ নাকি রে ?

— চাই।

— কেন, আমি কি মরেছি ?

— তুই এখনও মরিস্ নি বটে, কিন্তু বেশি কথা কইলে এইবারে মরবি। হাঁহাঁ হাতের মুগুরটা কাঁধের উপরে তুলল। আবার নামিয়ে মাটির উপরে সশব্দে রাখল।

হুয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। বুঝল, অত-মোটা মুগুরের উপরে যুক্তি বা প্রতিবাদ চলে না। তার মুখ বোবা হয়ে গেল।

হঠাৎ বাইরে থেকে টুটুর ব্যস্ত ডাক শোনা গেল— বাবা, বাবা!

— কি রে, টুটু!

— হাতি, হাতি!

— কোথায় রে, কোথায় ?

— বনের গর্তে! হুঁহুঁদের লোক খবর এনেছে!

হাঁহাঁ তাড়াতাড়ি গুহার কোণ থেকে কতকগুলো বর্শা তুলে নিয়ে বেগে পা চালিয়ে ভিতর থেকে অদৃশ্য হল।

তা ব্যাপার হচ্ছে এই : সেকালের রোমশ ম্যামথ-হাতি ও রোমশ গণ্ডার প্রভৃতি ছিল বিরাট জীব, একালের হাতি বা গণ্ডারের চেয়ে আকারে অনেক বড়। কিন্তু আদিম মানুষদের অস্ত্রশস্ত্র বলতে বোঝাত কেবল পাথরের বর্শা, কুঠার বা ছুরি-ছোরা এবং লাঠি। এ-সব দিয়ে তো আর হাতি-গণ্ডার বধ করা চলত না, কাজেই মানুষরা হাতি ও গণ্ডারদের চলাচলের পথে মস্ত মস্ত গর্ত খুঁড়ে তাদের মুখগুলো লতা-পাতা-ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখত। হাতি বা গণ্ডার বুঝতে না পেরে লতা-পাতার আচ্ছাদনের উপরে পা দিলেই হুড়্‌মুড়্‌ করে গর্তের ভিতরে পড়ে যেত। তারপর মানুষরা এসে অস্ত্র ও বড় বড় পাথর ছুঁড়ে পাঠিয়ে দিত তাদের আত্মাকে যমালয়ে। এখনও এই উপায়ে জন্তু-শিকারের পদ্ধতি আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে লুপ্ত হয়নি।

শিকারের পশু চিরদিনই দুর্লভ— বিশেষত সেই প্রস্তর-যুগে। কত কষ্ট করে, কত খোঁজাখুজির পর পাঁচ-সাতদিন অন্তর একটা হরিণ কি শূকর কি ভল্লুক কি গরু পাওয়া যায়, একদল লোকের রাক্ষুসে ক্ষুধার মুখে তা উড়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না। তারপর হয়ত দিন-কয়েক পুরো বা আধা উপবাস! কারণ আগেই বলেছি, তখন চাষবাস ছিল না, মানুষ আসল খাবার বলতে বুঝত কেবল মাংসই। কাজেই সেকালের জীবন্ত পাহাড়ের মত একটা মামথ-হাতিকে বধ করতে পারলে মানুষ জীবনের সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করত। অঢেল মাংস, আকণ্ঠ খেলেও দিন-কয়েকের আগে ফুরোয় না। এবং এ-কথাও আগে বলা হয়েছে, আদিম মানুষদের পচা মাংসেও বিরাগ ছিল না। বরং পচা মাংসই তারা বেশি ভালবাসত। কারণ সদ্য-সদ্য বধ করা পশুর মাংস হত অত্যন্ত শক্ত, খেতে কষ্ট হত। এ-যুগের শিকারীরাও হরিণ প্রভৃতি বধ করলে অন্তত একদিন বাসি না করে মাংস খায় না।

অতএব বুঝতেই পারছ, সেকালে ম্যামথের মত প্রকাণ্ড জীবের দেহ অনেক দিন ধরেই তুলে রেখে দেওয়া হত।

কাজেই হাঁহাঁ আলোর কথা ভুলে বেগে বেরিয়ে গেল। বউ যত-খুশি পাওয়া যায়, কিন্তু একটা ম্যামথের দাম দশ-বিশটা বউয়ের চেয়ে বেশি। প্রস্তর-যুগের যুক্তি ছিল এইরকম।

হুয়া খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোকে দেখল। তারপর এগিয়ে গিয়ে আলোর চুলটা একবার টেনে কৌতূহলী স্বরে জিগ্যেস করল, এটা এমন ঢঙের কেন রে?

আলো তাদের ভাষা জানে না, বুঝতে পারল না। একবার মুখ তুলে হুয়াকে দেখেই অস্ফুট আর্তনাদ করে আবার মুখ নামিয়ে ফেলল। হুয়া নারী হলেও তার কোন সান্ত্বনার কারণ নেই। রাক্ষসের বদলে রাক্ষসী, এইমাত্র!

হুয়া আরও অনেক কথাই জিগ্যেস করল, তোর গায়ে লোম নেই কেন?···তুই এত রোগা কেন? ···কাঁদছিস কেন? প্রভৃতি···

কিন্তু আলো কথা কয় না।

তারপর হুয়া অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে কি ভাবল! খুব-সম্ভব, সতীনের সঙ্গে ঘর করতে গেলে ভবিষ্যতে তাদের সংসার কি আকার ধারণ করবে, সেইটেই কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করল। দৃশ্যটা বোধকরি খুব উজ্জ্বল বলে মনে হল না। একবার উঠে বাইরে গেল। সেখানে কেউ নেই, ছোট খোকাটা পর্যন্ত ম্যামথ-বধের ঘটা দেখতে গেছে! পাহাড়ের উপরে পড়ন্ত রোদে গাছের ছায়াগুলো সুদীর্ঘ হয়ে উঠছে। আলো নেভ্‌বার আগেই সকলে আবার গুহায় ফিরে আসবে। সে আবার ভিতরে এল। আলোর কাছে এসে বলল, এই ছুঁড়িটা!

সাড়া নেই।

আলোর হাত ধরে এক টানে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুয়া বলল, আ মর! তুই বোবা নাকি রে?

আলো শুধু কাঁদে।

আবার তার হাত ধরে হিড়্-হিড়্ করে টানতে টানতে হুয়া বাইরে এল। তারপর তাকে একটা ধাক্কা মেরে পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রুক্ষ স্বরে বলল, দূর হ, বোবা আপদটা! বেরো!

আলো তার ইঙ্গিত বুঝতে পারল, কিন্তু নিজের এই কল্পনাতীত সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল, এ হচ্ছে রাক্ষসীর ছলনা! সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর্-থর্ করে কাঁপতে লাগল।

পাহাড়ের উপর থেকে একটা লম্বা গাছের ডাল কুড়িয়ে মাথার উপরে তুলে নাড়তে নাড়তে হুয়া দু'চোখ পাকিয়ে বলল, আমার বরকে ভারি পছন্দ হয়েছে, না? মেরে না তাড়ালে বিদায় হবি না?

যদিও আলো এখান থেকে পালাতে পারলেই হাতে স্বর্গ পায়, তবু পালাবার জন্য নয়, হুয়ার লাঠি এড়াবার জন্যই ভয়ে দৌড়তে আরম্ভ করল সে।

হুয়া চেঁচিয়ে বলল, দূর হ রে সতীন, দূর হ! তোকে আমার বর দেব না রে! সে জানে, হাঁহাঁ যখন আজ হাতি পেয়েছে, খুশিতে মশগুল্ হয়ে আসবে! মেয়েটা পালিয়েছে শুনলেও বেশি গোলমাল করবে না, খাওয়া-দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকবে; পেট আগে, না বউ? বড়-জোর হুয়ার পিঠে পড়বে লাঠির দু'-চারটে ঘা, তা সতীনকে বিদায় করতে লাঠির গুঁতোও সে হজম করবে। লাঠির ব্যথা সারতে লাগে দু'দিন, কিন্তু সতীন ঘাড়ে চেপে থাকে চিরদিন!

আলো যখন তার চোখের আড়ালে গেল, হুয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সেইখানেই বসে পড়ল দুই পা ছড়িয়ে। তার সারা মন আনন্দে পরিপূর্ণ। সে গান জানলে নিশ্চয়ই এখন একটা গান ধরত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হুয়াদের সময়ে গান-বাঁধিয়ে কবিরা ছিল না।

হুয়াকে তোমরা ভাল করে দেখে নাও। তার সঙ্গে এই আমাদের শেষ দেখা।

কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, সেই প্রস্তর-যুগ থেকে এই বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে ঐ হুয়া। আজ সে ব্লাউজ,

রেশ্‌মি শাড়ি, গহনা, 'হাই-হিল্‌' জুতো পরে, রকমারি কায়দায় সুবাসিত চিকণ চুল বাঁধে ও হাতে-গলায় মুখে-ঠোঁটে স্নো পাউডার আর রং মাখে এবং মিহি সুরে মাজা ভাষায় কথা কয় বলে তোমরা আর হাঁহাঁর বউ হুয়াকে চিনতে পার না। হুয়ার প্রস্তর-যুগের লীলাখেলার ইতিহাস সাঙ্গ করলুম বটে, কিন্তু আজও সে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে। খালি হুয়া নয়, হাঁহাঁও। একটু তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেই সবাই তাদের চিনতে পারবে।

১১

ফুসমন্তরের চিৎকার

এইবার আলোর কাছে যাই।

হুয়ার লাঠি এড়াবার জন্য প্রথম সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল, তারপর একেবারে পাহাড়ের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল।

অনেক দূরে গুহা-মুখে হুয়া পা ছড়িয়ে বসে আছে— এত দূরে যে, তাকে দেখাচ্ছে খুব ছোট্টটি। সে তার পিছনে তেড়ে আসে নি দেখে আলো ভারি অবাক হয়ে গেল। তাহলে রাক্ষসীর মনেও দয়া-মায়া আসে।

কী বিষম বিপদ যে সে এড়িয়ে এসেছে এবং হুয়া যে কেন তাকে এত সহজে মুক্তি দিল, তা জানতে পারলে আলো নিশ্চয়ই মত-পরিবর্তন করত।

কিন্তু আলোর তখন রাক্ষসীর দয়া-মায়ার কথাও ভাববার সময় ছিল না। সূর্য পালিয়ে গেছে পশ্চিম আকাশে। এরই মধ্যে অরণ্যের তলায় বিরাট অন্ধকার-সভার আয়োজন হচ্ছে। নিচে সুদূর প্রান্তরে

মোষ ও গরুর দল রাত্রের আশ্রয়ের সন্ধানে দলে দলে ফিরে আসছে। পাখিরা সাঁঝের গান শুরু করল বলে। আদিমযুগের ভয়াবহ রাত্রে মানুষের পক্ষে বাইরে থাকা অসম্ভব।

কিন্তু আলো কোন্‌দিকে যাবে? কোথায় সেই নদীর তীর, যেখানে তার বাবা তাঁবুতে বসে মেয়ের শোকে হাহাকার করছেন?

হ্যাঁ, বাবা যে তার জন্য কাঁদছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই— বাবা তাকে কত ভালবাসেন! কিন্তু আলো কেমন করে তাঁর কাছে গিয়ে বলবে— বাবা, এই তো আমি ফিরে এসেছি, আর কেঁদোনা! সে যে পথ চেনে না। এ-দেশ যে নতুন!

কিন্তু পথ চিনুক আর না-চিনুক আলোকে আগে এই রাক্ষস-পুরীর কাছ থেকে দূরে— অনেক দূরে পালাতে হবে! বাবার কাছে ফিরতে না পারা খুব দুঃখের কথা, কিন্তু অসম্ভব দুঃখের কথা হচ্ছে, আবার রাক্ষসের হাতে পড়া! অতএব আলো তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নামতে লাগল। এ অভিশপ্ত মুল্লুক থেকে যত তফাতে যাওয়া যায়, ততই ভাল।

পাহাড় থেকে নেমে সে দেখল, বাঁ-দিকে খানিক দূরে আর একটা পাহাড় আরম্ভ হয়েছে, ডানদিকে একটা নোড়া-নুড়ি-ছড়ানো শুকনো নদীর গর্ভ, শীতকালে যা পরিণত হয়েছে চলনপথে এবং সামনের দিকে বনজঙ্গল ও ছোট ছোট ঢিবি-ঢাবা ও বাচ্চা পাহাড়। কিন্তু কোন্‌দিকে তাদের আস্তানা? তার পক্ষে যে সব দিকই সমান!

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, ডানদিকের মরা-নদীর সাদা বালির পটে মূর্তিমান অভিশাপের মতন একটা কালো ছায়া! মস্ত-এক নেকড়ে বাঘ ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই পানে!

আলো আর দাঁড়াল না, দ্রুতপদে ছুটল সুমুখের পথ বা বিপথ ধরে। কিন্তু সেখান দিয়ে কি তাড়াতাড়ি চলবার উপায় আছে? পায়ে কাঁটা বেঁধে, চারিদিকে ছড়ানো নুড়ি-নোড়াতে ঠোক্কর খেতে হয়। এখানে ঝোপ, ওখানে নালা, পথের উপরের ঐ ঝুপ্‌সি গাছটা

কেমন সন্দেহজনক, ওর একটা ডাল জড়িয়ে কালোপানা কি-একটা যেন দেখা যাচ্ছে, প্রকাণ্ড অজগর হওয়াই সম্ভব, ওর তলা দিয়ে এগোনো হবে না, আবার ঘুরে যেতে হবে !

হাঁহাঁদের চেয়ে সবদিকেই ঢের বেশি সভ্য হলেও আলোরাও হচ্ছে বনের মানুষ। সেদিনের মানুষ একটু-একটু করে সমাজবদ্ধ জীবে বা জাতিতে পরিণত হচ্ছে বটে, কিন্তু তখনও পৃথিবীতে প্রথম নগরের প্রতিষ্ঠা হয় নি। অনেক তফাতে তফাতে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের জন্ম জনকয় করে মানুষ নদীর ধারে একটুখানি খোলা জায়গা বেছে নিয়ে বাস করত এবং তাদের সেই-সব বসতিকে যদি 'গ্রাম' নাম দেওয়া যায়, তাহলে তাদেরও ডাকতে হয় চলন্ত গ্রাম বলে। কারণ শিকারের পশুর সঙ্গে সঙ্গে সেই-সব গ্রামকে চলা-ফেরা করতে হত ইতস্তত ! অর্থাৎ এক বনে শিকারের অভাব হলেই মানুষদের বাসা তুলে নিয়ে যেতে হত অন্য বনে। যেদিন থেকে মানুষ চাষ-বাস করতে শিখল, সে স্থায়ী বাসা গাড়ল সেই দিন থেকেই ! কারণ ক্ষেতের ফসল ফলে তার নিজের পরিশ্রমে এবং ক্ষেত এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় পালায় না। তাই নগর-পত্তনের মূল হচ্ছে কৃষিকার্যই। কিন্তু সে-দিন আসতে তখনও অনেক দেরি।

আলো জ্ঞান হয়েই দেখেছিল, নিজেদের চারিপাশে গহন-বনের শ্যামল রহস্য— নদীর মত, ঝরণার মত জন্ম তার নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যেই। জলের মাছের ডাঙায় উঠে যে দুর্দশা, কিম্বা আধুনিক কলকাতা শহরের মিস ইভা বসুকে সুন্দরবনে ছেড়ে দিলে তার যে দুরবস্থা হয়, আলোর সে-রকম কোন মুস্কিল হবার কারণ ছিল না।

কিন্তু অরণ্যের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিভীষিকা, তাকে এড়াতে পারে কে? সে বিভীষিকা বনবালা বলে তো আলোকেও ক্ষমা করবে না ! বরং বনবালা বলেই আলো ভাল করেই জানে যে, এই বন্ধুহীন নিবিড় অরণ্যে রাত্রি কী ভয়ঙ্করী ! চামুণ্ডার যদি কোন রূপ থাকে, তবে সে হচ্ছে, আদিম যুগের বনবাসিনী ঘোরা নিশীথিনী !

এখনও রাত আসে নি, বেলাশেষের ম্লান আলোমাখা আকাশের দিকে দিকে ছায়াময়ী সন্ধ্যা সবে তার ধূসর আঁচল ছড়িয়ে দিচ্ছে, এরই মধ্যে দেখা গেল, একটা জঙ্গলের গর্ভ ভেদ করে হেলে দুলে বেরিয়ে এল জ্যান্ত কেল্লার মত সেকালের বিরাটদেহ রোমশ গণ্ডার! আলো তীরের মত একটা বড় গাছতলায় দৌড় দিল, দরকার হলে গাছে উঠে গণ্ডারকে ফাঁকি দেবে বলে। কিন্তু সে আলোকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না, নিজের মনে সেইখানেই বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

গণ্ডারকে পিছনে রেখে আলো অন্য দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তার সর্বশরীর গেল যেন হিম হয়ে! এ যে গণ্ডারেরও চেয়ে সাংঘাতিক!

খানিক দূরে একটা সবুজ গাছপালার প্রাচীর ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একদল রাক্ষস!

হাঁহাঁরা ম্যামথের মাংস নিয়ে ফিরে আসছে! তাদের দলে প্রায় পনেরো-ষোলজন লোক এবং প্রত্যেকেই বহন করে আনছে, ম্যামথের খণ্ডবিখণ্ড দেহের এক একটা অংশ। আলোর চোখে একেই তো তারা মূর্তিমান রাক্ষস ছাড়া আর কিছুই নয়, তার উপরে তাদের সর্বাঙ্গ ম্যামথের রক্তে হয়ে উঠেছে বীভৎস! মুখে মাথায় গায়ে লম্বা লম্বা চেঁড়া লোম, মাংস ও হাড়ের কুচি! দেখলে শিউরে উঠতে হয়!

হাঁহাঁও আলোকে দেখতে পেয়েছিল। এখানে তাকে দেখবার আশা মোটেই সে করে নি, তাই প্রথমে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মহাক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

আলো পালাবে কী, সেই প্রচণ্ড হুঙ্কার শুনেই কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

হাঁহাঁ দাঁত কিড়্‌মিড়্ করে বলল, টুটু, তোর মায়ের আক্কেল দেখেছিস্ রে?

— কেন, মা কি করল, বাপ?

— মেয়েটাকে পালাতে দিয়েছে!

— যে পালাতে চায়, তাকে ধরে রাখে কে রে?

— আচ্ছা ধরে রাখা যায় কিনা বাসায় গিয়ে বুঝিয়ে দেব। এখন শোন তুই।

— বল্ বাপ!

— মেয়েটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চল্! তোর হাতির ঠ্যাংখানা আমার কাঁধে চাপিয়ে দে।

টুটু যে-রকমভাবে হাতির পা বাপের জিম্মায় দিয়ে আলোর দেহের দিকে এগিয়ে চলল তা দেখলে মনে হয়, এই আদপটাকে ঘাড়ে করে বয়ে গুহায় নিয়ে যাবার ইচ্ছে তার মোটে নেই। কিন্তু এ হচ্ছে প্রস্তর-যুগের কথা! অবাধ্য হলে বাপ তখন ডাণ্ডা মেরে পুত্র-বধ করতেও পিছপাও হত না। আবার বুড়ো ও অথর্ব হলে ছেলেও বাপকে দেখত অকেজো উপদ্রবের মতো— ছেলের পরিশ্রমে আনা খোরাকের পুরো ভাগ নেবে, অথচ পরিবর্তে কিছু দেবে না। ছেলে তখন অলস ও সংসারের পক্ষে অনাবশ্যক বুড়ো বাপকে খুন করে পিতৃদায় থেকে নিস্তার পেত সহজেই।

এ-যুগে তোমাদের হয়ত এ-সব কথা শুনলে চমক লাগবে। ভাববে, সেকালে বুঝি বা পিতৃস্নেহ বা পুত্রস্নেহ বা দয়া-মায়া কিছুই ছিল না! ছিল। তখনকার স্নেহ-দয়া-মায়া ছিল সে-যুগেরই উপযোগী! কারণ সকলের উপরে কাজ করত তখন জঙ্গলের পাশবিক আইন-কানুন। জীবতত্ত্ববিদের মতে, মানুষও পশুশ্রেণীভুক্ত; তবে সে অসাধারণ পশু— কারণ উচ্চস্তরের মস্তিষ্কের অধিকারী। বহুযুগব্যাপী মস্তিষ্ক-চর্চার ফলে আজ সে যদি সাধারণ পশুর চেয়ে দশ ধাপ উঁচুতে উঠে থাকে, তবে আদিম যুগে ছিল মাত্র এক ধাপ উঁচুতে। কাজেই প্রায়ই পশুধর্ম-পালন করত। আজও জঙ্গলের আইন একটুও বদলায় নি। হাতি, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বৃদ্ধ ও অক্ষম হলে আজও পশুদের দ্বারা নিহত হয়। এবং আধুনিক যুগেও কোন বন্য মানুষদের সমাজে বৃদ্ধদের হত্যা করবার প্রথাও প্রচলিত আছে।···

বাপের হুকুম টুটু অমান্য করতে সাহস করল না— হাঁহাঁ জোরসে লাঠি হাঁকড়াবার শক্তি আজও হারায় নি এবং তার শক্তির উপরে টুটুর শ্রদ্ধার মাত্রা আজও কমে নি !

এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটল।

খোলা জমির মাঝখানে পড়েছিল আলোর অচেতন দেহ। তার চারিধারেই অরণ্যের প্রাচীর, তারও পরে দূরে ও কাছে এখানে-ওখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় ধূসর বা শ্যামল শৈল— তাদের শিখরে শিখরে মাখানো মরন্ত দিবসের নিভন্ত দীপ্তি।

পশ্চিম দিকে ছিল হাঁহাঁর দল। টুটু সেই-দিক থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, সময়ে পূর্বদিকের অরণ্যের ভিতর থেকে বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে আসতে লাগল লোকের পর লোক। তারা নতুন মানুষ! সবাই যখন আত্মপ্রকাশ করল, তখন দেখা গেল, দলটি বড় মন্দ নয়। কারণ সংখ্যায় তারা ত্রিশ-বত্রিশ জনের কম হবে না। প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

টুটু আর অগ্রসর হল না, সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাঁহাঁও চমকে উঠে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

হুঁহুঁ বলল, সর্দার, পালাই, চল্ রে !

হাঁহাঁর চমক ভাঙল। বলল, পালাব কেন ?

— দেখছিস্ না, দলে ওরা ভারি ?

— কিন্তু ওগুলো তো পোকার মতো! আমাদের চড় খেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

— কিন্তু আমরা চড় মারবার আগেই ওরা যে অস্তর ছুঁড়বে রে !

হঠাৎ নতুন মানুষদের একজন শিঙা বার করে ফুঁয়ের পরে ফুঁ দিয়ে বন-পাহাড়ের চতুর্দিক করে তুলল ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত! পর-মুহূর্তেই সেই মহারণ্যের চারিদিক আরও বহু শিঙার ভোঁ-ভোঁ রবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল!

সূর্য-সর্দারের লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে অরণ্যের নানাদিকে আলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কথা ছিল, যে-দল আলোকে প্রথম খুঁজে

পাবে শিঙার সঙ্কেতে আর সবাইকে সে-খবর জানিয়ে দেবে এবং তাহলেই সকলে একত্রে এসে মিলবে।

শিঙা যে কী চিজ্, হাঁহাঁরা কেউ তা জানে না! হাঁহাঁ চকিত স্বরে বলল, অমন ভয়ানক চেঁচায় কোন্ জানোয়ার রে?

হুঁহুঁ ভয়ে ভয়ে বলল, জানোয়ার নয় রে সর্দার, জানোয়ার নয়— ফুসমন্তর! বনের চারিধারেই ফুসমন্তর চেঁচাচ্ছে! ঐ শোন্, আবার কাদের পায়ের শব্দ!

সত্যই তাই! মাটির উপরে পায়ের শব্দ জাগিয়ে দলে দলে কারা যেন বেগে ছুটে আসছে!

হুঁহুঁ বলল, আমি লম্বা দিলুম রে, সর্দার! ফুসমন্তরের সঙ্গে লড়তে পারব না!

কেবল হুঁহুঁ নয়, ঢুঁঢুঁ, টুটু ও ঘটুর সঙ্গে আর আর সকলেও একই সঙ্গে যখন পৃষ্ঠভঙ্গ দিল, হাঁহাঁরও তখন পালানো ছাড়া আর কোন উপায়ান্তর রইল না।

১২

যুদ্ধের প্রয়োজন

পরদিনের প্রথম সূর্যকরের সোনালি ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠল আদিম প্রভাত, জেগে উঠল বনবিহঙ্গের দল।

আর জেগে উঠল সমস্ত ম্যামথ-হাতি, রোমশ গণ্ডার, বল্গা-হরিণ, দেঁতো-বরাহ, বুনো-ঘোড়া, শৃঙ্গী-মোষ ও গরু প্রভৃতির দল। আলো দেখে ঘুমোতে গেল কেবল খাঁড়া-দেঁতো, গুহা-ভল্লুক, হায়েনা ও নেকড়ে প্রভৃতি, রাতের আঁধার না জমলে যাদের শিকারের সুবিধা হয় না।

মানুষরাও জাগল বটে, কিন্তু তারা জাগল কিনা তা দেখবার জন্য কারুরই আগ্রহ ছিল না। বিপুলা পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ আজ জেগে উঠে এত-বেশি গোলমাল শুরু করে দিল যে, লোকালয়ের অনেক দূরে থেকে অরণ্যও তা শুনতে পায়। সুন্দরবনেও আজ বাঘের চেয়ে মানুষের সংখ্যাই বেশি বোধ হয়।

কিন্তু সেদিনকার অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় মানুষের সংখ্যা ছিল কত কম! তখন যে-দেশে জন্তু থাকত এক লক্ষ, সেখানে একশ'জন মানুষও থাকত কিনা সন্দেহ! কাজেই মানুষরা জেগে উঠলেও অন্যান্য জীবরা এমন চিৎকার করত যে, মানুষের জাগ্রত কণ্ঠস্বর শোনাই যেত না— যেমন ছোট নদীর কলধ্বনি ডুবে যায় সাগর-গর্জনের মধ্যে। কিন্তু কি করে যে ছোট নদী শেষটা অনন্ত সাগরকেও হার মানাল, সে এক বিচিত্র ইতিহাস! জীবজন্তুর সংখ্যাধিক্য দেখেই হয়ত মানুষ প্রথমে দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ হিংস্র জন্তুই ছিল মানুষের চেয়ে বলবান। একা মানুষ তাদের কারুর সামনেই দাঁড়াতে পারত না। হিসাব করে দেখা গেছে, 'নিয়ান্‌-ডের্টাল' অর্থাৎ হাঁহাঁদের জাতের অধিকাংশ মানুষই তখন বিশ বছর বয়স হবার আগেই মারা পড়ত। শতকরা পাঁচ-ছয়জনের বেশি মানুষ পঞ্চাশ বছরে গিয়ে পৌঁছতে পারত না! মানুষ দীর্ঘজীবী হতে পেরেছে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ আধুনিক যুগেই। আদিম কালে মানুষরা কেবল নিজেদের মধ্যেই সর্বদা মারামারি করে মরত না, তাদের অধিকাংশকেই খাদ্যরূপে বা শত্রুরূপে গ্রহণ করত হিংস্র পশুর দল! কাজেই মানুষ তখন আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে ভাব করে দল বাঁধতে লাগল। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জীবদের মগজে আজও এ-বুদ্ধি ঢোকেনি, একা (বা বড়-জোর আরও দু'-একটা জীব মিলে) দলবদ্ধ মানুষদের আক্রমণ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়ে বসে। দল বেঁধে মানুষ তার উচ্চতর মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছে। পরে এই দল থেকেই হল সমাজের সৃষ্টি।

আমরা যে নতুন মানুষদের দেখিয়েছি, তাদের ভিতরে ধীরে ধীরে

সমাজ গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু হাঁহাঁদের জাতের বা 'নিয়ান্-ডের্টাল' শ্রেণীভুক্ত মানুষদের মধ্যে সমাজের অস্তিত্বই ছিল না। সাধারণ স্বার্থ বা আত্মরক্ষার জন্য কিম্বা ভয়ের দায়ে মাঝে মাঝে বড়-জোর তারা দলবদ্ধ হতে পারত। ধর, হাঁহাঁ অগ্নি আবিষ্কার করল দৈব-গতিকে, কিন্তু তার গুপ্তকথা নিজের ছেলেকেও জানাতে রাজি নয়। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব হলে হয়ত সে এমন লুকোচুরি করত না। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থকেই বেশি বড় বলে মনে করত।

নতুন মানুষরা ব্যক্তির উপরে স্থান দিত সমাজকে। একজন নতুন-কিছু আবিষ্কার করলে সেটা সমস্ত সমাজেরই নিজস্ব হত। নতুন কোন সমস্যায় পড়লে সমাজের সকলে মিলে করত তার সমাধান। তাই একতায় ও সমষ্টিগত শক্তিতে তারা ছিল হাঁহাঁদের চেয়ে ঢের-বেশি উন্নত। হাঁহাঁরা ব্যক্তিগত শক্তিতে নতুন মানুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও প্রতি পদেই তাই তাদের কাছে ঠেকে যেতে লাগল।

পরদিনের প্রভাতের কথা বলছিলুম। তোমরা সবাই দেখেছ, প্রভাত হয় কেমন শান্ত ও সুন্দর। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে জাগে পাখিরা, কিন্তু তারা জাগলেও সৌম্য প্রভাতের শান্তি ও সৌন্দর্যকে করে তোলে না কদর্য। প্রভাতকালের মধ্যে তপোবনের একটি যে ভাব আছে, মানুষ জেগে উঠেই তা নষ্ট করে দেয়! প্রস্তর-যুগের সেই প্রভাতকেও আদিম মানুষ আজ বিশ্রী করে তুলেছে।

আকাশের নীলসায়রে সোনার পদ্মের মতন চমৎকার সূর্য জেগে উঠেই দেখল, কতদিনকার বিজন বন ধ্বনিত হয়ে উঠছে মানুষদের বিকট চিৎকারে! মার্জিত, দুর্বল কণ্ঠের অধিকারী আধুনিক শহুরে মানুষ আমরা, ম্যামথ-বিজয়ী আদিম বন্য মানবতার সেই গগনভেদী কোলাহলের বিকটতা বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ নয়।

সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, বনের অলিগলি দিয়ে, মাঠ প্রান্তরের উপর দিয়ে, পাহাড়ের পর পাহাড়ের উপত্যকা ও চড়াই-উৎরাই পার

হয়ে দলে দলে বিরাটবক্ষ, হৃষ্টপুষ্ট, মসীকৃষ্ণ মানুষ চলেছে, পশু-শক্তির উচ্ছ্বাসে লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে চেঁচাতে ! অরণ্যের জীবরা যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল— এ-অঞ্চলে এমন বিষম চিৎকার-পাগল বৃহৎ জনতা আর কখনও দেখেনি তারা ! মানুষদের কোন দিনই তারা বন্ধুর মত দেখেনি, তাই তারা সহজেই ভেবে নিল যে, এরা ছুটে আসছে তাদের জব্দ করতে বা বিপদে ফেলতে !

হাঁহাঁ সর্দার এ-অঞ্চলে তার যত জাত-ভাই আছে সবাইকে জোরে ডাক দিয়েছে। কিছুদিন আগে হলে হাঁহাঁ-সর্দার এমন বেপরোয়া হুকুম জারি করতে সাহস করত না, কারণ সে জানত, কেউ তার হুকুম মানবে না, উল্টে হয়ত তাকেই তেড়ে মারতে আসবে ! কিন্তু আজ সে যে সর্দার— যে-সে শুধু সর্দার নয়, অগ্নিবিজয়ী হাঁহাঁ সর্দার ! হাতে তার দপ্‌দপে থোকা-আগুন, খাঁড়া-দেঁতো আর গুহা-ভল্লুকের দল যার প্রতাপে দেশছাড়া, তার কথা আজ শুনবে না কে ? তাকে আজ ভয় করবে না কে ?

অতএব জনতার পর জনতার স্রোত বয়েছে বনে বনে— যেন সুন্দর শ্যামলতার উপরে কুৎসিত কালির ধারা ! কিন্তু সব স্রোতের গতি এক মুখেই ! সবাই চলেছে হাঁহাঁ সর্দারের গুহার দিকেই। অসভ্যের জনতা, তারা মৌনব্রত কাকে বলে জানে না, তাদের চিৎকারে পৃথিবী তাই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে !

হাঁহাঁ সর্দার বড় চালাক। সে জানে, আজ এই বিপুল জনতার প্রত্যেকের হাতেই দিতে হবে অমোঘ অগ্নি-অস্ত্র এবং তাকে অগ্নি সৃষ্টি করতে হবে গোপনে, সকলের অগোচরেই। তাই আজ সে খুব ভোরে উঠে টুটু আর ঘটুকে নিয়ে নতুন মানুষদের আস্তানার অদূরে কল্‌কল্‌-নদীর তীরবর্তী এক পাহাড়ের উপরে প্রকাণ্ড অগ্নি-কুণ্ড সৃষ্টি করে এসেছে ! এরপর তার সঙ্গীরা শুকনো গাছের ডাল ভেঙে কুণ্ডের আগুনে জ্বালিয়ে অনায়াসেই শত্রু বধ করতে পারবে !

বুঝতেই পারছ, হাঁহাঁ-সর্দারের শত্রু কে ? তারা কেবল আলোকেই

কেড়ে নিয়ে যায়নি, ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর শুনিয়ে সকলের সামনে তার মহিমাকে করে দিয়েছে অত্যন্ত খর্ব! যে ফুসমন্তরের জন্য আজ তার এমন দেশ জোড়া মান-সম্ভ্রম, ওদের ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর তার চেয়ে বড় হয়ে উঠলে তাকে কি এখানে কেউ মানবে? অতএব সে সকলকে দেখাতে চায়, দুনিয়ায় তার নিজস্ব ফুসমন্তরের তুলনা নেই!

সেই সুবৃহৎ জনতা যখন তার পাড়ের তলায় এসে জমল, হাঁহাঁ-সর্দার তখন একটা উঁচু পাথুরে ঢিপির উপরে দাঁড়াল বিচিত্র ভঙ্গীতে।

হ্যাঁ, তাকে আজ খুব জমকালো দেখাচ্ছে বটে! সে কোমরে পরেছে গুহা-ভল্লুকের একখানা ছাল এবং গায়ে জড়িয়েছে খাঁড়া-দেঁতোর ছাল। সর্দার-গৌরব প্রকাশ করবার জন্য তার মাথায় রয়েছে রঙিন পাখির পালকের টুপী! কটিদেশে গোঁজা পাথরের ছোরা, পিঠে বাঁধা দুটো বর্শা এবং তার দুই হাতে আছে দু'খানা দাউ-দাউ করা জ্বলন্ত কাঠ! কেবল গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে কেউ সর্দার বা দলপতির পুরো সম্মান আদায় করতে পারে না। প্রস্তর-যুগের আদিম মানুষ হলেও হাঁহাঁ বুঝে নিয়েছিল, সর্দারির সম্মান অটুট রাখবার জন্য অভিনয়েরও খানিকটা দরকার হয়— নইলে লোকে উচিতমত অভিভূত হয় না। আর অভিনয় করতে গেলে 'মেকআপ'-এর সাহায্য না নিলে চলবে কেন?

মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে হাঁহাঁ-সর্দার গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ওরে, তোদের কেন ডাক পড়েছে, সবাই তা জানিস তো?

জনতা সমস্বরে বলল, জানি রে, সর্দার!

অগ্নিময় কাঠ দু'খানা শূন্যে তুলে বারংবার নাড়তে নাড়তে হাঁহাঁ বলল, আমাদের মুল্লুকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায় কোথাকার একদল পোকার মতন মানুষ! আমরা হচ্ছি আগুন-ঠাকুরের চ্যালা, দুনিয়ায় কারুকে ভয় করা কি আমাদের উচিত?

জনতা একস্বরে বলল, না রে সর্দার, না!

হুঁহুঁর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাঁহাঁ বলল, কিন্তু কী এক বাজে ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর শুনে আমাদের ঐ হামবড়া হোঁদলকুৎকুতে হুঁহুঁটা ভয়ে একেবারে খাবি খাচ্ছে রে!

সবাই কট্‌মট্ করে হুঁহুঁর দিকে তাকাল।

হাঁহাঁ দৃপ্তস্বরে বলল, আমি আজ দেখাতে চাই, আমার খোকা-আগুনের সামনে পৃথিবীর কোন ফুসমন্তরই টেঁকতে পারে না! চল্ রে তোরা, আমার সঙ্গে সেই মানুষ-পোকাগুলোর আড্ডায়! আমরা তাদের ধরব আর মারব।

জনতা বলল, আর পুড়িয়ে খেয়ে ফেলব!

হাঁহাঁ ফিরে বলল, হুঁহুঁ তুই আমাদের সঙ্গে যাবি না!

হুঁহুঁ বুদ্ধিমানের মত বলল, তোকে যখন সর্দার বলে মানি, তোর হুকুমে প্রাণ দিতেও রাজি আছি রে। কিন্তু মনে মনে এই অভিযানে যাবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না।

হাঁহাঁ আবার চেঁচিয়ে সবাইকে সম্বোধন করে বলল, তোদের জন্যে কল্‌কল্ নদীর ধারে পাহাড়ের ওপর আমি আগুন-দেবতাকে জাগিয়ে এসেছি রে! আর দেরি নয়, আয় তোরা!

নরহত্যা ও রক্তনদীতে স্নান করবার এমন মহা সুযোগ পেয়ে সেই বিরাট জনতা ভীষণ আনন্দে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল এবং বারংবার চিৎকার করে বলতে লাগল, জয় জয়, হাঁহাঁ-সর্দারের জয়!

এই সভ্য-যুগেও মানুষ নরহত্যার সেই বিকট আনন্দ ভুলতে রাজি নয়, নব নব কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করে পৃথিবীর সবুজ বুক সাদা করে দেয় লক্ষ লক্ষ নর-কঙ্কালের শয্যা পেতে! হাঁহাঁদের তাণ্ডব-নাচ আর জয়জয়কার আজও জেগে আছে মানুষের কর্মক্ষেত্রে।

কল্‌কল্-নদীর সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা তটরেখার পাশ দিয়ে অগ্রসর হল সেই উন্মত্ত জনস্রোত। সর্বাগ্রে চলেছে হাঁহাঁ-সর্দার। দুই হাতে তার অগ্নির নৃত্য!

যুদ্ধ

কল্‌কল্‌-নদীর তীরে আজ প্রভাতের রবিকর নতুন মানুষদের সভাকেও করে তুলেছে সমুজ্জ্বল।

নদীতটের বালুরেখার উপরেই যে উচ্চভূমিতে খাটানো হয়েছিল তাদের তাঁবু, তারই একটা অংশ ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে। এবং সেইখানে মণ্ডলাকারে আসন গ্রহণ করেছে আদিম পৃথিবীর নবযুগের শিকারী যোদ্ধারা। প্রত্যেকের সাজ-পোশাকে আজ একটু বিশেষ মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

সে ছিল এমন যুগ, তখন সশস্ত্র থাকতে হত প্রত্যেককেই। যোদ্ধা-দের সকলেরই কাছে রয়েছে ধনুক-বাণ, মুগুর, ছোরা, বর্শা কিম্বা কুঠার। অরণ্যে তাদের বাস, কখন কোন্ দিক থেকে মানুষ-শত্রু বা হিংস্র জন্তু আক্রমণ করে বলা যায় না, তাদের অভ্যর্থনার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়। আহারে বিহারে শয়নে সর্বদাই অজ্ঞাত সব বিপদের হঠাৎ আবির্ভাবের সম্ভাবনা! এরও ঢের পরের যুগেও এই প্রথা লুপ্ত হয় নি, তখনও জামাই যেত শ্বশুরবাড়িতে তরোয়াল হাতে নিয়ে। আজও শিখ আর গুর্খারা সব-সময়েই অস্ত্র কাছে রাখে।

যোদ্ধারা সেখানে মণ্ডলাকারে বসে আছে, তার একদিকে রয়েছে একখানা উঁচু পাথর— সর্দারের আসনরূপে যা ব্যবহৃত হবে। সর্দারের জন্য উচ্চাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল প্রাচীন যুগ থেকেই। সেই উচ্চাসনই পরে পরিণত হয় রত্নখচিত স্বর্ণ বা রৌপ্য সিংহাসনে।

প্রত্যেক যোদ্ধার মুখ দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না, আজ তারা এখানে সমবেত হয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহ বা শিকারের জন্য নয়, কোন বিশেষ

উৎসবের জন্য। কারণ প্রত্যেকেরই হাসি-হাসি মুখ— কেউ গল্প করছে, কেউ গান গাইছে, কেউ তালে তালে করতালি দিচ্ছে।

এমন সময় দেখা গেল, ডানহাতে আলোর কোমর জড়িয়ে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন সূর্য-সর্দার— প্রশান্ত মুখে।

সূর্য-সর্দার এসে উঁচু পাথরখানির উপরে বসলেন। আলো বসল বাপের পাশে মাটির উপরে, তাঁর জানুর উপরে মাথা রেখে। একালে রাজ-কুমারী বা সর্দার-কন্যার জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু তখন সর্দারের ছেলে-মেয়েদের জন্য কেউ মাথা ঘামাত না।

সূর্য-সর্দার ধীরে ধীরে বললেন, বন্ধুগণ, তোমরা জানো, রাক্ষসদের কবল থেকে আমার আদরের মেয়ে আলো উদ্ধার পেয়েছে বলে আজ আমি দেবতাদের কাছে জীব বলি দেব। শুভকার্যে দেরি করা উচিত নয়, তোমরা বলির পশু নিয়ে এস।

তখনি একজন লোক উঠে প্রকাণ্ড দামামা বাজিয়ে বলির পশু আনবার জন্য সঙ্কেত করল।

তারপরেই দেখা গেল, কয়েকজন লোক মস্তবড় একটা ভল্লুককে টেনে-হিঁচড়ে সভার দিকে আনছে। ভল্লুকের চার পায়ে চারগাছা চামড়ার দড়ি বাঁধা, চারজন লোক চারদিক থেকে দড়িগুলো টেনে আছে! তার কোমরে ও গলাতেও চামড়ার দড়ি বেঁধে ধরে আছে আরও ছ'জন লোক। ভল্লুক ভীষণ গর্জন করছে, দাঁত খিঁচোচ্ছে, নখ-বার-করা থাবা ছুড়ছে এবং অগ্রসর হতে চাইছে না, কিন্তু তার সমস্ত আপত্তি ও ভয় দেখাবার চেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে। ঘৃণ্য ও তুচ্ছ মানুষের হাতে জাত-ভাইয়ের এই অবস্থা দেখলে তোমাদের পূর্ব-পরিচিত গুহা-ভল্লুক তার কান-কাটা বউয়ের কাছে কি মত প্রকাশ করত, বল দেখি?

তোমরা মোষ, ছাগল বলি দেওয়ার কথা শুনেছ, হয়ত সাঁওতাল-দের মুর্গী বলি দেওয়ারও কথা তোমাদের অজানা নেই এবং এও জান, আগে নরবলিও দেওয়া হত। কিন্তু ভল্লুক-বলির কথা এই বোধকরি

প্রথম শুনলে? কিন্তু আদিম যুগে পৃথিবীর নানা দেশেই যে ভল্লুক বলি দেওয়া হত, এর বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। আজও জাপানের আদিম বাসিন্দা আইনু এবং অন্যান্য জাতিদেরও মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

আদিম মানুষদের প্রধান শত্রু ছিল ঐ গুহা-ভল্লুকরা। তাদের বলবিক্রমের উপরে মানুষদের শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, খুব সম্ভব সেইজন্যই অন্যান্য বাজে বা দুর্বল পশুর বদলে দেবতাদের উদ্দেশে ভল্লুক বলি দিয়ে প্রার্থনা করা হত, যারা বলি দিচ্ছে, তারা যেন ভল্লুকেরই মত মহাবলী হতে পারে।

আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে কারুকে বীর ও যথার্থ পুরুষ বলে গণ্য করা হয় না, যদি একা একটি সিংহ বধ করতে না পারে। রাজপুতদের পুরুষত্বের বিচার হয় বন্য বরাহ শিকারে। আদিম কালে যে গুহা-ভল্লুক বধ করতে পারত তাকে মানা হত মহাবীর বলে। সে-যুগে, ভল্লুকদের কেবল বলিই দেওয়া হত না। বলির পর ভল্লুকদের মাথার হাড় আগে খুব যত্ন করে সাজিয়ে তুলে রেখে দেওয়া হত সারে সারে। খুব সম্ভব সেগুলোকে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস বলে ভাবা হত! অনেক হাজার বছর পরে সেই হাড়গুলোকে ঠিক তেমনি-ভাবে সাজান অবস্থাতেই আবার পাওয়া গিয়েছে।

ভল্লুককে সবাই মিলে সভাস্থলের মাঝখানে এনে হাজির করলে, অমনি সভার সমস্ত লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল—এমন কি সূর্য-সর্দার পর্যন্ত।

সূর্য-সর্দার হচ্ছেন দলের প্রধান ব্যক্তি, অতএব বলির কার্যারম্ভের ভার তাঁরই উপরে! তিনি বাঁ-হাতে ধনুক ও ডান হাতে বাণ নিয়ে ভল্লুকের দিকে লক্ষ্য স্থির করে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, আলোক-স্রষ্টা হে সূর্য-দেবতা! তৃষ্ণার বারিদাতা হে নদী-দেবতা! নিঃশ্বাস-বায়ুদাতা হে পবন-দেবতা! অন্ধকারের চক্ষুদাতা হে অগ্নি-দেবতা! তোমাদের সকলের কাছে এই বলির পশু নিবেদন করছি, তোমরা

আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমাদিগকে এই ভল্লুকের মত শক্তিমান করে তোল!— তাঁর প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো দামামা সমস্বরে বেজে উঠল তালে তালে এবং তার পরেই সূর্য-সর্দার ধনুক থেকে বাণ ত্যাগ করলেন!

বাণ গিয়ে বিঁধ্‌ল ভল্লুকের বুকের কাছে এবং পর-মুহূর্তেই সভাস্থ সমস্ত শিকারী যোদ্ধা একসঙ্গে জয়ধ্বনি তুলে ভল্লুককে লক্ষ্য করে বর্শা বা বাণ ছুঁড়তে লাগল!

সর্দারের বাণ খেয়ে ভল্লুকটা একবার মাত্র গর্জন করবার সময় পেয়েছিল, তারপরেই একসঙ্গে অতগুলো অস্ত্রের আঘাতে তার মৃতদেহ মাটির উপরে ধড়াস করে পড়ে গেল, আর নড়ল না!

তারপর চারিদিকের উত্তেজনা, দামামা-নিনাদ, জয়ধ্বনি ও কোলাহলের মধ্যে সূর্য-সর্দার আবার পাথরের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে দেবতাদের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করতে লাগলেন বারংবার।

ওদিকে জনতার সমস্ত লোক এগিয়ে এসে ভল্লুকের চারিধারে চক্রাকারে দাঁড়াল এবং দামামার তালে তালে বিজয় বা যুদ্ধ-নৃত্য আরম্ভ করল! কলকাতায় আধুনিক ছেলে-মেয়েদের যে তরল ও চুটকি নাচ দেখা যায়, এ-নাচ তেমনধারা নয়! এর প্রতি ছন্দে বীর্যের ব্যঞ্জনা, প্রতি পদক্ষেপে প্রলয়ের তাল, প্রতি ভঙ্গীতে আদিম দরাজ প্রাণের উচ্ছ্বাস! এ-কালের কোন নিজিনিস্কি বা উদয়শঙ্করই সেই বন্য স্বাধীন নৃত্যের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দেখাতে পারবে না।

নর্তকরা যখন শ্রান্ত হয়ে থামল, দামামা যখন মৌন হল, সূর্য-সর্দার বললেন, বন্ধুগণ, দেবতারা নিশ্চয়ই বলি পেয়ে আর তোমাদের নাচ দেখে তুষ্ট হয়েছেন। এইবারে চল, আমরা সকলে মিলে বনের ভেতরে গিয়ে ঢুকি। আজ চাই গোটা কয় বন্য-হরিণ আর বরাহ।

সর্দারের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই আচম্বিতে কোথা থেকে তীব্র স্বরে শিঙা বলল তিনবার 'ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ! ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ! ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ!

সূর্য-সর্দার সচমকে বললেন, এ যে আমাদের প্রহরীর সঙ্কেত! শত্রুরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে!

চারিধারে অমনি রব উঠল শত্রু! শত্রু! অস্ত্র ধর! অস্ত্র ধর! মেয়েরা তাঁবুর ভেতরে যাক!

দেখতে দেখতে ভিড়ের ভিতরে যত মেয়ে ছিল সবাই তাঁবুর দিকে দৌড় দিল এবং যোদ্ধারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করতে লাগল।

শিঙা আবার চেচিয়ে উঠল, ভোঁ! ভোঁ! ভোঁ! ভোঁ!

অগ্নি বলল, বাবা, প্রহরী এবারে শিঙায় চারটে ফুঁ দিল। মানে শত্রুদের সংখ্যা হচ্ছে চারশো!

সূর্য-সর্দার জবাব দিলেন না, শত্রুদের আবিষ্কার করবার জন্য তীক্ষ্ণ নেত্রে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বায়ু উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, না বাবা, আমাদের দলে তিনশোর বেশি লোক হবে না, আমি জানি।

ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সূর্য-সর্দার চোখ না ফিরিয়েই বললেন, বাছা, শত্রুদের সংখ্যা বেশি বলেই হতাশ হবার কারণ নেই। আগে দেখা যাক, শত্রুরা কোন জাতের মানুষ! প্রহরী সঙ্কেতে সে-কথা জানাচ্ছে না কেন?

কয়েক মুহূর্ত পরেই শিঙা টানা সুরে বলল, ভোঁ-ও-ও-ও-ও!

সূর্য-সর্দার তখন সহাস্যে উচ্চস্বরে বললেন, বন্ধুগণ, সঙ্কেতে জানা গেল, রাক্ষসরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! আমরাও তো তাই চাই! ওরা না এলে আমরাই ওদের আক্রমণ করতে যেতুম, কিন্তু ওরা নিজেরাই এসে আমাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিল! দলে ওরা ভারি বলে ভাবনার কারণ নেই। কারণ আমরা সকলেই জানি, রাক্ষসরা তীরধনুক ব্যবহার করতে জানে না! অতএব দাঁড়াও সবাই সারি সারি, বাজাও দামামায় যুদ্ধ-সঙ্গীত!

বেজে উঠল দামামার পর দামামা, শিঙার পর শিঙা! যোদ্ধারা শ্রেণীবদ্ধ হতে লাগল।

তারপরেই দেখা গেল, শত্রুরা দলে দলে বিশৃঙ্খলভাবে লাফাতে লাফাতে, নাচতে নাচতে পাহাড়ের তলদেশের সুদীর্ঘ অরণ্যের দিক থেকে বেরিয়ে এল। অতর্কিতে আক্রমণ করবে বলে এতক্ষণ তারা চেঁচায়নি, এইবারে শুরু করল বিকট চিৎকারের পর চিৎকার!

সূর্য-সর্দার অল্পক্ষণ তাদের ভাবভঙ্গি ও অস্ত্রশস্ত্র লক্ষ্য করে বললেন, ওরা মূর্খ! দেখছি— ওরা ঠাউরেছে যে, জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে! যেন আমরা বন্য জন্তু, কাঠের আগুন দেখলে ভয় পাব!

অগ্নি বলল, বাবা, ওরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আমাদের কর্তব্য কি? আমরা কি আগেই ওদের আক্রমণ করব?

সূর্য-সর্দার বললেন, না। দেখছ না, আমরা উচ্চভূমির উপরে আছি? এখান থেকে নামলে আমাদের সুবিধে কমে যাবে! বিশেষ, আমরা যদি ওদের কাছে গিয়ে পড়ি তাহলে বাণ ছোড়বারও সুবিধে হবে না। হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদেরই হারতে হবে। কারণ একে ওরা সংখ্যায় বেশি, তার উপরে গায়ের জোরেও আমরা ওদের কাছে দাঁড়াতে পারব না।

অগ্নি বলল, তবে কি আমরা এইখানেই দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করব?

— হ্যাঁ! সবাই এক জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে থেকো না। তাঁবু-গুলো পেছনে রেখে অর্ধ-চন্দ্রাকারে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াও। যতক্ষণ না ওরা আমাদের বাণের সীমানার মধ্যে আসে, অপেক্ষা কর।

শিঙা নিয়ে সঙ্কেত-ধ্বনি করে অগ্নি পিতার আদেশ প্রচার করে দিল। তিনশত যোদ্ধা তৎক্ষণাৎ অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করে ফেলল। যোদ্ধাদের পিছনে তাঁবুর ভেতরে রইল মেয়েরা— শত্রুদের নাগালের বাইরে। অর্ধচন্দ্রের মাঝখানে দুই পাশে দুই ছেলেকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সূর্য-সর্দার স্বয়ং।

ওদিক থেকে হৈ-চৈ তুলে, মুখ ভেংচে ও লাফালাফি করে যারা

আক্রমণ করতে আসছে, তাদের মধ্যে ব্যূহ, শ্রেণী, শৃঙ্খলা কোনরকম পদ্ধতিরই বালাই ছিল না। তাদের নির্ভরতা কেবল নিজেদের পশু-শক্তির উপরে। আর আছে তাদের খোকা-আগুন!— খাঁড়া-দেঁতো ও গুহা-ভল্লুক যার সামনে দাঁড়াতে পারে না, তার সামনে মানুষ-পোকাগুলো তো তুচ্ছ! এই হল তাদের যুক্তি।

কেবল হুঁহুঁ কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছে না। সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চোখে নতুন মানুষের সব-কিছু পর্যবেক্ষণ করতে করতে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে।

হাঁহাঁ বিরক্ত স্বরে বলল, হ্যাঁ রে হুঁহুঁ, তুই আবার পিছিয়ে পড়লি যে রে! দেরি করলে খোকা-আগুন তোর হাত থেকে পালিয়ে যাবে, জানিস না!

হুঁহুঁ বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে বলল, গ্যাখ রে সর্দার, গ্যাখ!

— কি?

কোন কোন তাঁবুর ভিতর থেকে ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছিল— বোধহয় উনুনের জ্বালানি কাঠের ধোঁয়া। সেইদিকে অঙুলি নির্দেশ করে হুঁহুঁ বলল, গ্যাখ, ওদেরও কাছে খোকা-আগুন আছে রে!

হাঁহাঁ দেখে প্রথমে দস্তুরমত ভড়কে গেল। কিন্তু তারপরেই সে-ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হেসে বলল, ও বাজে খোকা-আগুন রে! ওদের যদি আগুন-মন্তর জানা থাকত, তাহলে ওরা হাতে কতকগুলো কাটি নিয়ে নাড়ানাড়ি করত না!

— হয়ত ঐগুলোই ওদের নতুন ফুসমন্তর!

— ফুসমন্তর ফুসমন্তর করেই কবে তুই ফুস করে পটল তুলবি রে ···এগিয়ে চল। ওরা আমাদের খোকা-আগুনকে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এগোতে চাইছে না!

টুটু বলল, দাঁড়িয়ে থাকলেই প্রাণ বাঁচবে কিনা! আমরা আর একটু কাছে গেলেই মজাটা টের পাবে!

ঘটু তাচ্ছিল্যভরে বলল, যেমন টের পেয়েছিল ভল্লুক আর খাঁড়া-দেঁতো—

হুঁহুঁর দিকে আড়-চোখে চেয়ে হা-হা করে হেসে হাঁহাঁ বলল, 'আর টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ !

সে-কথা যেন শুনতেই পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে হুঁহুঁ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল।

প্রস্তর-যুগ হলেও বাপের এমন অপমান টুঁটুঁরও ভাল লাগল না। সেও মুখ ফেরাল অন্যদিকে।

হাঁহাঁ দামামা-ধ্বনি শুনতে শুনতে বলল, অমন দুম্-দাম্ শব্দ করে কানের পোকা বার করছে কারা— বল্ দিকি ?

হুঁহুঁ ফুসমন্তর সম্বন্ধে আবার কি মত প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু টুঁটুঁ রাগ-ভরা চোখে বাপের দিকে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল !

টুটু বলল, বোধহয় যে-জানোয়ারগুলোর পিঠে চড়ে ওরা নদীতে বেড়ায়, তারাই ক্ষিধের চোটে চেঁচিয়ে মরছে!

— তাই হবে।

ঘটু বলল, লড়ায়ে জিতে ফেরবার সময় জানোয়ারগুলোকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

হাঁহাঁ মাথা নেড়ে বলল, না, না! বড্ড চ্যাচায়। ঘুমোতে দেবে না তা হলে।

আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি রে !

এমনি-সব আজে-বাজে কথা কইতে কইতে তারা যে অজানা মৃত্যুর সীমানার মধ্যে এসে পড়েছে, সেটা আন্দাজও করতে পারল না। নতুন মানুষরা অকস্মাৎ ধনুকের ছিলা টেনে বাণ ছাড়ল। এবং পরমুহূর্তে যা ঘটল, সেটা সম্পূর্ণরূপেই তাদের ধারণাতীত। ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ উড়ে এসে হাঁহাঁদের দলের ভিতরে গোঁৎ খেয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পনেরো-ষোলজন লোক নিহত বা আহত হয়ে পপাত

ধরণীতলে। পর মুহূর্তে তেড়ে এল আবার অসংখ্য মৃত্যুদূত এবং আবার কয়েকটা মূর্তি করল পৃথিবীকে আলিঙ্গন।

তারপর নতুন মানুষরা বাণ ছোড়া থামিয়ে ধনুক নামিয়ে ফলাফল দেখতে লাগল।

অসভ্যদের লাফালাফি ও জয়ধ্বনি থেমে গেল একেবারে, তার বদলে জেগে উঠল তাদের আকাশভেদী আর্তনাদ!

হাঁহাঁ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না, হতভম্বের মত রক্তাক্ত মূর্তিগুলোর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ! তারপর বিস্মিত স্বরে ঠিক গুহা-ভল্লুকের মতই বলল, অ্যাঃ! কাঠি ছুড়ে কাবু করল!

হুঁহুঁ ত্রস্তভাবে পিছোতে পিছোতে বলল, বাপ্ রে বাপ্—কী ফুসমন্তর!

এমন সময়ে এল আবার এক ঝাঁক বাণ! এবারে প্রথমেই বাণ খেয়ে বাপের পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল ঘটু! বাণ বিঁধেছে তার বুকে!

হাঁহাঁ স্তম্ভিত নেত্রে ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল!

মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে ঘটু ডাকল, বাবা।

হাঁহাঁ মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, ঘটু রে!

দুই হাতে নিজের বুক চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটু বলল, আমাকে যে মেরেছে, তাকে তুই মারিস রে, বাপ! তাকে তুই খুঁজে বার করিস, তাকে তুই ছাড়িস নে, তাকে তুই-ই – আর কিছু বলবার আগেই তার মৃত্যু হল।

ছেলের দেহ কোলের উপর টেনে নিয়ে হাঁহাঁ অশ্রু-অস্পষ্ট চোখে মুখ তুলে দেখল, উচ্চভূমির উপরে নতুন মানুষরা ঠিক পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজনও হত বা আহত হয়নি! হাঁহাঁর অনুচররা তাদের লক্ষ্য করে কতকগুলো জ্বলন্ত কাঠ ছুড়েছে বটে, কিন্তু একগাছা কাঠও তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

কিন্তু হাঁহাঁদের দলে মরেছে বা জখম হয়েছে প্রায় চল্লিশজন লোক। দলের অনেকেরই যুদ্ধ করবার শখ এখন মিটে গেছে, তারা পায়ে পায়ে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে এবং যারা এখনও পালায় নি তারাও পালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, কিম্বা অগ্রসর না হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। তাদের অনেকের হাতেই আর জ্বলন্ত কাঠ নেই, যাদের হাতে আছে, তাদের কাঠে আগুন নেই!

হাঁহাঁ হঠাৎ প্রবল বেগে মাথা-ঝাঁকানি দিল, তার তৈলহীন জটার মতন লম্বা রুক্ষ চুলগুলো ঠিক যেন একদল ক্রুদ্ধ সর্পের মত চতুর্দিকে ঠিকরে পড়ল লট্‌পট্‌ করে! তারপরে ছেলের মৃতদেহ মাটিতে নামিয়ে তড়াক্ করে লাফ মেরে সে দাঁড়িয়ে পিঠে-বাঁধা বর্শা ও কোমরে-ঝোলানো মুগুর এক-এক টানে খুলে নিয়ে দুই হাতে ধরে বজ্র-কঠিন স্বরে হেঁকে বলল, কি রে ভীতুর পাল, তোরা পালাবি নাকি রে? চেয়ে ছাখ মাটির দিকে, তোদের বন্ধুদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে! পোকার মতন দেখতে ঐ বিদেশীগুলো এসে তোদের বধ করল, আর প্রতিশোধ না নিয়ে তোরা পালাবি নাকি রে?

একজন বলল, আমাদের খোকা-আগুন পালিয়েছে, সর্দার! দপ্ দপ্ করে হাঁহাঁর দুই ভীষণ চক্ষু জ্বলে উঠল! বিপুল ক্রোধে তার বিষম-চওড়া বক্ষ ফুলে আরও চওড়া হয়েছে এবং বিকট দন্তগুলো কালো মুখের ভিতর থেকে দেখাচ্ছে যেন দিদ্যুৎদীপ্তির মত চক্‌চকে! সত্যই, এখন তার দানব-মূর্তি! কর্কশ কণ্ঠে সে আবার চিৎকার করে বলল, তোদের মত ভীতুর হাতে খোকা-আগুন থাকবে কেন? এতক্ষণে তোরা একটাও শত্রু মারতে পারলি না, তাই তো আগুন তোদের ত্যাগ করেছে! আগুন গেছে, তোদের কাছে বর্শা নেই, কুঠার নেই, মুগুর নেই। এতদিন তোরা কী নিয়ে লড়াই করে এসেছিস রে?

যুদ্ধ-পাগল আদিম মানুষ, হাঁহাঁর দৃপ্ত উৎসাহ-বাণীতে জেগে উঠল আবার তাদের রণোন্মাদনা!— নেচে উঠল ধমনীর তপ্ত পশুরক্ত! তারা

রুখে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ রে সর্দার! আমরা ভীতু নই— আমরা হয় মারব, নয় মরব! হারে রে রে রে রে!

হাঁহাঁ এক হাতে বর্শা ও আর এক হাতে মুগুর উঁচিয়ে মূর্তিমান বিভীষিকার মত তীরবেগে ছুটতে ছুটতে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! হয় মারব, নয় মরব! কে আসবি আমার সঙ্গে, ছুটে আয় রে মরদ-বাচ্চা, ছুটে আয়!

তার সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে চলল ভয়াবহ হুঙ্কার তুলে প্রায় দুইশত আদিম যোদ্ধা।

হুঁহুঁ গেল না। টুঁটুঁও গেল না।

হুঁহুঁ বলল, ওরা মরণের মুখে ছুটেছে। আমরাও কেন ওদের সঙ্গে মরব রে?

টুঁটুঁ বলল, ঠিক বলেছিস রে, বাপ! চল, ফিরে যাই।

উচ্চভূমি থেকে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ ছুটে আসছে! আবার অনেকে মরল, আবার অনেকে পালাল। কিন্তু জন-পঞ্চাশের গতিরোধ করতে পারল না কেউ!

পদে পদে লোক মরছে, তবু তারা থামল না। হাতে কাঁধে উরুতে বাণ বিঁধছে, তবু তারা থামল না। তিনশ' শত্রু চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলবার জন্য ছুটে আসছে, তবু তারা থামল না। তারা মরিয়া। তারা প্রাণের মায়া রাখে না। তাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে কেবল মৃত্যু।

হাঁহাঁ ভয়ানক স্বরে অট্টহাস্য করে বলল, চলে আয় রে মরদ-বাচ্চা, চলে আয়! ঐ ওদের সর্দার— আমি মারব ওকে, তোরা পারিস মার। হয় মার, নয় মর!

হাঁহাঁরা তখন নতুন মানুষের দলের ভিতরে ঢুকে পড়েছে মত্ত হস্তী-দলের মত। তারা যেদিকে তাকায়, সেই দিকেই দলে দলে শত্রু! এত কাছে ধনুক-বাণ অচল দেখে শত্রুরাও ধরল বর্শা বা কুঠার বা মুগুর। আরম্ভ হল তখন বিষম হাতাহাতি লড়াই। হাঁহাঁর চোখের

সামনে বর্শার আঘাতে টুটু ভূতলশায়ী হল, তবু তার ভ্রূক্ষেপও নেই। তার নিজের বর্শা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল, হাঁহাঁ ফিরেও তাকাল না। বাণের খোঁচায়, বর্শার খোঁচায় ও কুঠার-মুগুরের চোটে তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত, তবু সে-সব হাঁহাঁ খেয়ালেও আনল না। দুই হাতে মুগুর ধরে ডাইন-বামে সমানে আঘাত করতে করতে হাঁহাঁ সূর্য-সর্দারের দিকে অটল-পদে এগিয়ে চলল, সে-শরীরী বজ্রকে ঠেকায় কার সাধ্য! তার সুমুখে দাঁড়ায় কার সাধ্য! অবশেষে হাঁহাঁ তার লক্ষস্থলে এসে হাজির হয়ে হো হো রবে হেসে উঠে উন্মত্তের মতন বলে উঠল, এইবারে তোকে পেয়েছি রে, পালের গোদা! বলেই দুই হাতে মুগুর তুলে প্রাণপণে আঘাত করল সূর্য-সর্দারকে!

সূর্য-সর্দারও নিজের মুগুর তুলে হাঁহাঁর মুগুরকেও ঠেকাতে গেলেন, কিন্তু হাঁহাঁ বুঝেছিল তখন তার অন্তিমকাল উপস্থিত, তাই সে তার মহা-বলিষ্ঠ বিরাট দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে এই চরম আঘাত করেছিল, কাজেই সূর্য-সর্দারের মুগুর হাঁহাঁর মুগুরকে ঠেকিয়েও তাকে থামাতে পারল না, দুই যোদ্ধার দেহ-ই একসঙ্গে জড়াজড়ি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল।

তখনি চারিদিক থেকে অনেক লোক ছুটে এসে হাঁহাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কেউ মারল কুঠারের ঘা— কেউ দিল বর্শার খোঁচা! কিন্তু তার আর দরকার ছিল না, কারণ এই চরম আঘাত করবার জন্যই সে ছিল এতক্ষণ বেঁচে। মুগুরের দ্বারা শত্রুকে শেষ আঘাত করেই সে শক্তি-হারা হয়ে মৃত্যুর মুখে করছে আত্মদান!···

সূর্য-সর্দার কেবল মূর্ছিত হয়েছিলেন। জ্ঞান হবার পর রক্তাক্ত দেহে উঠে বসে দেখলেন, শত্রুদের কেউ আর বেঁচে নেই! কিন্তু মাত্র পঞ্চাশজন শত্রুর শেষ-আক্রমণে তাঁর দলে হত বা আহত হয়েছে একশ' কুড়িজন!

অভিভূত স্বরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাক্ষসরা যথার্থ যোদ্ধা বটে!

কিন্তু এদের সম্বল শুধু পশু-শক্তি। ওর সঙ্গে ওদের মনের শক্তি থাকলে পৃথিবীতে আমরা কেউ বেঁচে থাকতাম না!

সূর্য-সর্দার যাকে মনের শক্তি বললেন, এখানকার পণ্ডিতেরা তাকে বলেন মস্তিষ্কের শক্তি!

কেবল উত্তর-ভারতের নানা-স্থানে নয়, গোটা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সে-যুগের আদিম মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছিল নতুন মানুষদের। কিন্তু শুধু দেহের শক্তির উপরে নির্ভর করেছিল বলে আদিম মানুষরা কোথাও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে নি।

প্রথম মনুষ্য-শক্তির পর দশ লক্ষ বৎসর কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘকালব্যাপী মস্তিষ্ক-চর্চার ফল হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর মানুষ। মস্তিষ্কের মহিমায় মানুষ যে উন্নতির পথে আরও কতখানি অগ্রসর হবে, সে-কথা জানে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ। ॥ গল্প ফুরোলো ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

'মানুষের প্রথম অ্যাড্‌ভেঞ্চার' উপন্যাসের আকারে লেখা হল আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তরঞ্জনের জন্য। কিন্তু কেবল উপন্যাস-রূপে পাঠ করলে এ-রচনাটির আসল উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ। কারণ গল্পের ভিতর দিয়ে আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষ ও তার জীবনযাত্রা-পদ্ধতির যে ছবি ফোটাবার চেষ্টা করেছি, তা কাল্পনিক হলেও কল্পনার মূলে আছে প্রধানত বিশেষজ্ঞদের মতামত।

আদিম মানুষদের নিয়ে পণ্ডিতদের অনুসন্ধান-কার্য এখনও সমাপ্ত হয়নি— অদূর-ভবিষ্যতেও সমাপ্ত হবার সম্ভাবনা নেই। যতটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে, আবিষ্কৃত হতে বাকি তার চেয়ে ঢের বেশি! সমস্তটা কখনও আবিষ্কৃত হবে কিনা, সন্দেহ! মহাকাল অনেক প্রমাণ নিঃশেষে ধ্বংস করেছেন — আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মুখ তাকান নি।

যতটা জানা গিয়েছে, তার দ্বারাও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার উপায় নেই। কারণ বিশেষজ্ঞদেরও মধ্যে মতভেদ দেখা যায় সর্বত্র। স্যর আর্থার কিথ, ডেভিডসন ব্ল্যাক, এইচ. জে. ফ্লিওর, ই. ডিউবয়, প্রোফেসর এইচ. এফ. ওসবর্ণ, আর. আর. ম্যারেট, স্যর জি. ই. স্মিথ, এ. ডারউইন প্রভৃতির মতামত পাঠ করেও নির্দিষ্ট কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিথ সাহেবের মতন বিশেষজ্ঞও স্পষ্ট ভাষায় বলতে বাধ্য হয়েছেন, আমাদের অনুসন্ধান সবে আরম্ভ হয়েছে। এমন অনেক-কিছুই আছে যা আমরা এখনও বুঝতে পারি না।

মানুষ যে গোড়ায় কি ছিল, এখনও সেইটেই জানা যায় নি। ডারউইন ও লামার্ক সাহেব বলেন— মানুষের উৎপত্তি শিম্পাঞ্জীর মত কোন লাঙ্গুলহীন বানর থেকে। কিথ সাহেবেরও ঐ মত।

আবার প্রোফেসর এইচ. এফ. ওসবর্ণ-এর মত হচ্ছে, আমি মানুষের ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস করি, কিন্তু লাঙ্গুলহীন বানর থেকে যে তার উৎপত্তি, এ-কথায় বিশ্বাস করি না। মানুষ তার নিজের পথ

ধরেই বরাবর এগিয়ে এসেছে, কখনও তাকে বানর-অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় নি। আবার প্রোফেসর ওয়েষ্টনহোফের সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলেন। তাঁর মতে, মানুষ থেকেই লাঙুলহীন বানরের উৎপত্তি। এই অদ্ভুত মতানৈক্যের জঙ্গলে আমাদের মতন সাধারণ পাঠককে পথ হারাতে হয় পদে পদে। আমরা কার কথায় বিশ্বাস করব?

কোন্ দেশে মানুষের প্রথম আবির্ভাব, তা নিয়েও তর্কাতর্কির অন্ত নেই। ডারউইন, স্মিথ, ক্রুম প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষের প্রথম জন্মভূমি হচ্ছে আফ্রিকা। তাঁদের মতে, আফ্রিকায় যখন গরিলা ও শিম্পাঞ্জীর লাঙুলহীন বানরের জন্ম হয়েছে তখন ঐখানেই মানুষের প্রথম আবির্ভাবের সম্ভাবনা বেশি।

কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে ঐ মতই যথেষ্ট নয়। ভারতের কাছেই জাভা দ্বীপে মানুষের সব-চেয়ে পুরোনো কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এবং তার পাশাপাশি দ্বীপে— সুমাত্রায় ও বোর্ণিয়োতে— যখন লাঙুলহীন বানরজাতীয় বৃহৎ ওরাং-উটানের বাস, তখন পূর্ব-মত অনুসারে ঐ অঞ্চলেও মানুষের প্রথম জন্ম হতে পারে।

পণ্ডিতদের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ও মস্তিষ্ক চালনার ফলে জানাও গিয়েছে অনেক-কিছু। প্রাগৈতিহাসের রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অংশ-বিশেষ তুলে তাঁরা নানা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। যে-সব বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় নিঃসন্দেহ, বর্তমান ক্ষেত্রে সেইগুলি হয়েছে আমার প্রধান অবলম্বন।

আমরা এই গল্পে যে 'নিয়ান্‌ডের্টাল' মানুষদের কথা বলেছি, তারা ছিল কতকটা বানরধর্মী মানুষের শেষ বংশধর। তারা অগ্নি, বস্ত্র ও অস্ত্র ব্যবহার করত এবং কথা কইত বলে ধরা যায়, যথার্থ মানুষী চিন্তাশক্তি তাদের ছিল। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বোধহয় তাদের অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কারণ মৃতদেহকে তারা সযত্নে গোর দিত। ১৮৫৭ শতকে জার্মানির ডুসেল্‌ডর্ফ্ নামক স্থানে নিয়ান্‌ডের্টাল গুহায় সর্বপ্রথমে তাদের কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয়, তাই ঐ

নাম। মাথায় তারা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির বেশি উঁচু হত না, কারুর মতে আফ্রিকার আধুনিক অসভ্য মানুষ হটেন্‌টটদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়। কেবল য়ুরোপের নানা স্থানে নয়, আফ্রিকায় এবং এশিয়াতেও (ককেসসে ও প্যালেষ্টাইনেও) তাদের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। ভারতে এখনও তাদের কঙ্কাল পাওয়া যায় নি বটে, কিন্তু আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি, আদিমকালে এখানেও তারা কিম্বা তাদের কোন নিকট-আত্মীয় বা প্রায় ঐ জাতীয় মানুষ বিচরণ করত। কিন্তু তর্কের খাতিরে কেউ যদি জোর করে বলেন যে, 'নিয়ানডের্টাল'দের কঙ্কাল যখন ভারতে পাওয়া যায় নি, তখন এ-দেশে তাদের আবির্ভাব দেখানো ভুল, তাহলে প্রতিবাদ করব না। তবে এ-ক্ষেত্রে আর-একটি কথাও স্মরণ রাখতে হবে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জাভাদ্বীপেও 'নিয়ান্‌ডের্টাল' লক্ষণ-বিশিষ্ট মানুষের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তার নাম রাখা হয়েছে 'সোলো'-মানুষ।

বহু পণ্ডিতের মতে, 'ক্রো-ম্যাগ্নন্' জাতের মানুষও এশিয়া থেকে য়ুরোপে প্রবেশ করে। সুতরাং ভারতেও তারা কিম্বা প্রায় ঐ জাতের মানুষদের আবির্ভাব স্বাভাবিক। 'নিয়ান্‌ডের্টাল'রা সিধে হয়ে হাঁটতে পারত না, এরা পারত। এবং এদের মধ্যে বানরকে মনে পড়ে, এমন কোন লক্ষণই ছিল না। কিন্তু য়ুরোপ থেকে এদের জাতও আজ অদৃশ্য হয়ে গেছে, (ক্লিওর-এর মতে) আধুনিক বহু মানুষের উপরে নিজেদের অল্পবিস্তর ছাপ রেখে।

'নিয়ান্‌ডের্টাল' মানুষদের শেষ-জীবন থেকেই আমাদের গল্প আরম্ভ করেছি। তাদের প্রথম আবির্ভাবের সময়ে 'ক্রো'-ম্যাগ্নন্ মানুষরা পৃথিবীতে বর্তমান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

যদি কোন বিশেষজ্ঞ এই কাহিনীর মধ্যে ভুলভ্রান্তি পান, তাহলে তা গল্প-লেখকের অজ্ঞতা বুঝে মার্জনা করবেন।